চলার পথে

চলার পথে

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

এ্যানুয়েল রেজিষ্টার অফিস
৭৯।২৫ডি, লোয়ার সার্কুলার রোড
কলিকাতা।

মূল্য ২৲ টাকা

প্রকাশক :—শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ মিত্র

এ্যান্মুয়েল রেজিষ্টার অফিস

৭৭।২৫।ডি লোয়ার সার্কুলার রোড,

কলিকাতা।

৯।৩, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, ক্লাসিক প্রেস হইতে

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র সরকার দ্বারা মুদ্রিত।

গোটা দুই কথা

গল্পটা পড়্বার আগে গোটা দুই কথা শুনে রাখা ভাল। হয়ত' গল্প বলার ধরণটা, ভঙ্গীটা অনেকের কাছে কতকটা আলাদা ব'লে মনে হবে। জানিনে, তাতে গল্পটাকে সরস ক'রে তুলেছে, কি নীরস, খণ্ডিতরস, বিরস ক'রে তুলেছে। যিনি আস্বাদ ক'রবেন, তাঁর নিজের অনুভূতিই প্রমাণ। তার ওপর কথা নেই। তবে, একটা বিষয়ে আমার একটা কৈফিয়ৎ দিয়ে রাখা আবশ্যক মনে ক'র্ছি। গল্প ব'লেছি; আর, যাঁরা গল্প শুন্তে চান, শুন্তে ভালবাসেন, তাঁদিকেই শুনোবার মতন ক'রেই ব'ল্তে চেয়েছি। কিন্তু—শুধু তাঁরাই যে গল্পের আসরে আমার হাজির ছিলেন, এমন নয়। আর, গল্পের আসরে শুধু আমিই যে মুখ খুলিছি, এমনও নয়। আর এক ব্যক্তি সময় সময় উপস্থিত ছিলেন—আমার এক চির-পরিচিত আত্মীয়, বন্ধু। বন্ধুটির কিঞ্চিৎ বয়েস হ'য়েছে, আর, বয়েস হ'লে প্রায়ই যা হয়—বন্ধুবর একটু বেশী কথা বল্তে ভালবাসেন। গল্পের আসরে, গল্পের মাঝখানেও, আমার মুখ চেপে ধ'রে সময় সময় তিনি ব'কে গেছেন। আমি নিজে শ্রদ্ধালু হ'য়েই তাঁর কথা বরাবর শুনে আস্ছি। যাঁরা গল্প শুন্তে ব'সেছেন, তাঁরা সব সময় শ্রদ্ধালু হ'য়ে, এমন কি, সহিষ্ণুতা রক্ষা ক'রে, শুন্তে পেরেছেন কি? বন্ধুটির দার্শনিক হবার, আর—বোধ হয়—একটুখানি কবি হবার সাধ কোন কালে ছিল। যদ্দূর জানি, সে সাধ প্রায় অপূর্ণই র'য়ে গেছে। তাই, বোধ হয়, যখন তখন—যে সে আসরেই—নিজের রুদ্ধ ভাবটাবগুলোকে একটুখানি খুলে দিতে পার্লে বাঁচেন! তিনিত' বাঁচেন, কিন্তু কোন কোন আসরে হয়ত' তাতে রস-

ভঙ্গই হ'য়ে থাকে। এক্ষেত্রে হ'য়েছে কি না, জানিনে। আমার নিজের ত' ব'লেছি—ভালই লাগে তাঁর কথাগুলো। তাই—জিজ্ঞেস ক'রছি যাঁরা গল্প শুন্‌ছেন, তাঁদিকে। উপন্যাসে যায়গায় যায়গায় লম্বা লম্বা বক্তৃতা, বর্ণনা—এসবতাতে তাঁদের "অতিষ্ঠ" ক'রে তুল্‌ছে না ত'? যাঁরা বইখানা হাতে ক'রেছেন, তাঁদের কাছে একটা আবদার কিন্তু না ক'রে পারছি না—চেকে চেকে প'ড়ে যাবেন—শেষ পর্য্যন্ত।

আখ্যানবস্তু, আখ্যানভঙ্গী, মূলভাবধারা—এসব সম্বন্ধে নিজে গোড়ায় কিছু বল্‌তে চাইনে। বইখানার যে দিক্ দিয়ে যা "আপীল" আছে না আছে, তা, অবশ্যি, ছাপা থাক্‌বে না, যাঁরা পড়বেন, তাঁদের কাছে। চলার পথটি সকলের শিব হোক, সুন্দর হোক, সত্য হোক!

মুদ্রাযন্ত্র থেকে অবিকলাঙ্গদেহে এটাকে বের ক'র্‌তে পারিনি। প্রুফের ভুল থেকে গেছে। তবে, আশা করছি, সে ভুলে বোঝার ভুল হবে না। অন্য অঙ্গবৈকল্যের মধ্যে, বর্ণমালার মৌলিমেখলাবতংস চন্দ্রবিন্দু বড়ই নাকালে প'ড়েছেন দেখছি। আর, বর্ণমালার অঙ্ঘ্রিমূলাবলুণ্ঠিত হ্রস্ব উ দীর্ঘ ঊ, ইত্যাদি। "ল্যাজামুড়োয়" কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি স্থানে স্থানে হ'য়ে থাক্‌লেও, আশা করি, তার জন্যে, যাঁরা পড়বেন, তাঁদের কোন মারাত্মক অসুবিধে হবে না। কল্যাণীয়বর শ্রীযুক্তনৃপেন্দ্র নাথ মিত্র, ব্যবসা বাণিজ্যের এই দুঃসময়েও, শুধু সাহস ক'রে নয়, বেশ একটা আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গেই, এই বইখানা প্রকাশ করবার ভার নেবেছেন। তাঁর আশা পূর্ণ হ'লে সুখের হবে। ইতি—

১৩ই ফাল্গুন, ১৩৩৮
কলিকাতা

শ্রীপ্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়

—চলার পথে—



প্রথম

জি, আই, পি, লাইনে কাটনি একটা বড় ষ্টেশন। প্ল্যাটফর্মে কলিকাতাগামী বোম্বে মেল আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। গাড়ী ঘণ্টা দেড়েক লেট্। ছ'টা বাজিয়া গেছে, কিন্তু সন্ধ্যা হবার এখনও একটুখানি দেরী। এক খানা সেকেণ্ড ক্লাশ কামরার ধারে দাঁড়াইয়া সুব্রত তার বন্ধুর করমর্দ্দন করিয়া বিদায় নেবার উদ্যোগ করিতেছে। আজ একমাস হইল সে তার বন্ধুর কাছে আসিয়াছে। আজ সে কলিকাতা যাবে। বন্ধু গাড়ীতে তুলিয়া দিতে আসিয়াছে।

বন্ধুর নাম বিনয়। কর্ম্মসূত্রে কাটনিতে অনেক দিন আছে। বেশ দু'পয়সা রোজগার করে। একটা ছোট পাহাড়ের গায় ছবির মত সুন্দর ছোট খাটো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তার বাংলোখানি। পাহাড়ের গায় বন ঘন নয়। নগ্ন, রুক্ষ ভাবও নেই। মানুষ হাত দেয় নাই, কিন্তু কি করিয়া হইল জানিনা—সব যেন বাগানের মত তৈরী আর সাজানো।

কে যেন সযত্ন প্রসাধনে পাহাড়ের গা ঘসিয়া মাজিয়া মসৃণ করিয়া রাখিয়াছে। বন্ধুরতা কোথাও একটুখানি উদ্ধত হইয়া নেই। অবয়ববিন্যাসে বিষমতা কোথাও একটুখানি উচ্ছৃঙ্খল হইতে পায় নেই।

সত্যই—এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর শুয়ে থাকার ভঙ্গী দেখিলে মনে হয় যেন তারা সেই আদিযুগের দ্রবকলেবরা পৃথিবীর বুকে কতকগুলো সুঠামভাবে সাজানো ঢেউ; হঠাৎ একদিন থম্‌কে পাষাণ হইয়া গিয়াছে। অন্য যায়গার পাহাড় দেখিলে মনে হয়—তারা যেন পৃথিবীর বুকে আপতিত, আগন্তুক, উদ্ভট, উদ্ধত এক একটা কিছু। যেন সত্য। সত্যই কোন কালে তারা তাদের বিরাট পক্ষ মেলিয়া কতকগুলো মহাশ্যেনের মত শূন্যে ঝটাপটি করিত। তারপর, কে যেন তাদের পাখা কাটিয়া দিয়াছে। তারা নিজেদের বিরাট ভারে পীড়িত, নিজেদের বিকট পঙ্গুতায় অসামাল হইয়া পৃথিবীর বুকে পড়িয়া গিয়াছে। পৃথিবী তা'দের বরণ করিয়া লয় নাই; কিন্তু তাদের অস্বীকার করিতেও পারে নাই। কিন্তু এ অঞ্চলের পাহাড়গুলো যেন মাটিরই ঢেউ খেলিয়ে—যাওয়া! পৃথিবীর আপন অঙ্গই তারা; তা'দের দায়ে পড়িয়া অঙ্গীকার করিতে হয় নাই। আর, তাদের যেন কোন রূপদক্ষ শিল্পীর হাতে যত্নে তৈরী বিচিত্র-বর্ণ-সম্পদে সমৃদ্ধ অঙ্গাচ্ছাদন ও অঙ্গভূষা দেখিলে পাষাণী প্রিয়ার অঙ্গ নিপুণ প্রসাধনে সুন্দর করিয়া রাখায় চিরপ্রয়াসী মেঘবিমানচারী সেই—সহস্রাক্ষ অমর প্রণয়ীর কথাই মনে হয় বটে!

বিনয়ের বাংলোর কাছে কোন্ অজানা তাপসের পূজা-বেদীটির মতন সাজানো একখানা পাথরের উপর বসিয়া, সুদূর অথচ স্বচ্ছোজ্জ্বল দিক্-চক্রবালের পানে চাহিয়া থাকিয়া, সুব্রতর তাই মনে হইত! সে দৃষ্টি বুঝিবা বাহ্যদৃষ্টি আর মর্ম্ম-দৃষ্টির মাঝামাঝি একটা কিছু! তার বসিবার শিলাপীঠতলে পাষাণীর

মূর্চ্ছা যেন অজ্ঞাতসারেই তার সকল নাড়ী বহিয়া আসিয়া নয়নের পাতায় ভর করিত! মনে হইত—বিশ্বের বিরাট্ পাষাণপুরীতে যে অরূপ, সে বিপুল নিজেকে বহুরূপী বন্দী করিয়া পুরীর অগণিত বদ্ধার্গল প্রকোষ্ঠে সাধ-শৃঙ্খলিত সাজে ফেলিয়া রাখিয়াছে; আপন কল্পিত কারাকক্ষে মুক্তি-ব্যাকুলতায় উঠিতে যাইয়া আপনারই লীলা-শৃঙ্খলের শিঞ্জিত বিদ্রূপে আবার লুটাইয়া পড়িতেছে;—সেও সেই মহান্ বিপুল অথচ দীন অসহায় অভিনয়ের একটা অচ্ছেদ্য ভূমিকা; অভিনয়ের ছদ্মতা, অবাস্তবতার ভিতরে অধীর হইয়া সে তার স্বরূপটিকে, তার বস্তুটিকে খুঁজিতে চাহিতেছে; কৃত্রিম দৃশ্যপটগুলোর অন্তরালে সাজঘরে ফিরিয়া আসিয়া ছদ্মবেশের বদলে আপন সত্যকার পরিচ্ছদটি, হাতড়াইয়া বেড়াইতেছে! রঙ্গালয়ের বাইরে বিশ্বের মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, মুক্ত আলোর জন্য দ্বার খুঁজিয়া হয়রাণ হইতেছে! কতদিনে খোঁজার শেষ হইবে কে জানে?

সুব্রতর চিন্তার গাঢ়তা, তন্ময়তা দেখিয়া মনে হইত—সে ধ্যানে বসিয়াছে। বিনয়ের পত্নী সুষমা সকালে জলখাবার দিতে আসিয়া পাশে দাঁড়াইয়া থাকিলেও, অনেক সময় সুব্রত বুঝিতে পারিত না। কিছুক্ষণ প্রশান্ত, সস্মিত অথচ কুতূহল দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সুষমা কোন দিন হয়ত' বলিত—"শিবের ধ্যান কি ভঙ্গ হ'ল?"

সুব্রতর স্বভাব-সুন্দর, সৌম্য মুখচ্ছবিতে সত্যই যেন কোন ধ্যান-নিরত শিবসুন্দরের প্রসাদ ও গাম্ভীর্য্যের একটা আভা লাগিয়া রহিত—যেন হিমালয়ের নিভৃত কুক্ষিদেশে কাম-উপত্যকায় অরুণার স্বচ্ছধারে নির্ম্মিত কোন এক সুস্থির হ্রদবক্ষে প্রভাতারুণরাগে রঞ্জিত গৌরীশঙ্করের চিরশুভ্র, নিত্য-অকুণ্ঠিত গৌরবের ছায়াটি ঘুমাইয়া রহিয়াছে! সুষমার তাই স্নেহের সঙ্গে একটা সম্ভ্রম, আদরের সঙ্গে একটা মর্য্যাদা মাখানো

থাকিত। বিনয় স্নুব্রতর চাইতে এক আধ বছরের বড়—কাজেই সে স্নুব্রতর বৌদি।

বিনয় ও স্নুব্রতদের বাড়ী অবশ্য বাংলা মুলুকে, কিন্তু এক জেলায় নয়। কিন্তু কলেজে তারা একসঙ্গে পড়িত। সেই সূত্রেই তাদের ভাব। এক মেসে থাকা, আর একসঙ্গে মোহনবাগানের খেলা, আর থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখিতে যাওয়ার সাহচর্য্যের ভিতর দিয়া তাদের ভালবাসার জন্ম, এবং তার ভিতর দিয়াই সে ভালবাসাটার পুষ্টি, হয় নাই। বরং এসব ব্যাপারে তারা কতকটা আলাদা রাস্তাতেই হাঁটিত। বিনয়ের রাস্তা হয়ত' তাকে বেশীর ভাগ বাইরের দিকে লইয়া যাইত; স্নুব্রতর রাস্তা অনেক সময় ভিতরের দিকেই। কিন্তু তবু উভয়ের অঙ্গীকৃত, উভয়ের প্রার্থিত ও বরিত একটা মিলনক্ষেত্র ছিল বৈ কি—অন্তর হইতেও অন্তরে যার স্থান; সেইখানটা থেকেই তাদের সকল পথ হাঁটা স্নুরু হইত; আর চলিতে চলিতে তাদের যতই ছাড়াছাড়ি হোক্, তারা আবার সেইখানটাতেই ফিরিয়া আসিত। সমবেদনা বলিলে তাদের সেই মিলনক্ষেত্রটার ঠিক পরিচয় দেওয়া হইবে কি? তাদের প্রকৃতি, রুচি, মেজাজ যে এক ছাঁচে ঢালাই হয় নাই, সেটা নিশ্চয়। কবির অথবা তত্ত্বান্বেষীর যে ভাবুকতা ও বাহ্য-নির্লিপ্ততা, সেটা স্নুব্রতর ভেতরেই স্পষ্ট দেখা যাইত। অর্দ্ধ-নিমীলিত-নেত্রে ঘণ্টাখানেক ঠায় এক যায়গায় বসিয়া থাকা শুধু সম্ভবপর নয়, তার পক্ষে সহজ ও কাম্য ছিল; সেটি তার ধাতে আসিত। কিন্তু ওভাবে এক দণ্ডও বসিয়া থাকিতে হইলে বিনয় একেবারে হাঁপাইয়া উঠিত। অথচ স্নুব্রতর স্তিমিত, প্রশান্ত-স্নুন্দর মূর্ত্তিটির পানে চাহিয়া সে কোনদিনও এটা অনুভব করে নাই যে, তার অন্তর একটা অলস নিষ্কর্ম্মতা এবং নিষ্ফল জড়তার অনুযোগ করার জন্য প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে। তাত' নয়ই—বরং, স্নুব্রতর তন্ময় ভাবুকতাকে

সে সকল অন্তর দিয়া শ্রদ্ধা করিত ; সেই স্তিমিততার মাঝখানে যে কোন এক মহান্ জাগ্রতের মৌন-মঙ্গলারতি হইতেছে, আর সে দেবতার প্রসাদ যে ব্যর্থতা ও রিক্ততা নয়, কিন্তু বিশ্বজনীন শ্রেয়ঃ ও ঋদ্ধি, তাও সে সকল অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিত।

সুব্রতর ভাবুকতার সবটা, এমন কি আসলটা, সে যে বুঝিত, এমন নয়। বুঝিতে হইলে যে সামরস্য—এক রসের রসিক, এক ভাবের ভাবুক হওয়া—আবশ্যক, সেটা তার ভেতরে ছিল না। এরকম করিয়া—বেদনায় ও অনুভূতিতে—না বুঝিলেও, অন্য রকমে সেটা বুঝিত, এবং তার সমাদর করিত। নিজের ভেতরে জীবন্তভাবে ধরার ও পাওয়ার এক রকম বোঝা আছে। আবার, নিজের ভেতরে ধরিতে না পাইলেও, এমন কি, ঠিক নিজের ভেতরে পাইতে না চাহিলেও, নিজেকে যে আবেষ্টনীর মধ্যে দেখিতে চাই, যে সমগ্রের সঙ্গে নিজেকে অন্বিত করিয়া পাইতে চাই, সেই আবেষ্টনী, সেই সমগ্র, সেই সম্পূর্ণের ভেতরে কোন কিছুকে না পাইলে আমরা হয়ত' নিজেকে একটা অ-পাওয়ার মধ্যেই পড়িয়া আছি, মনে করি। এই রকমে, ঠিক নিজের ভেতরে যেটা নেই, এমন কি, ঠিক নিজের ভেতরে যেটাকে পাবার জন্য তেমন স্পষ্ট আকুতিও নেই, সেটাকে আমার পত্নীর ভেতরে, বন্ধুর ভেতরে, সন্তানের ভেতরে, পরিচিতের ভেতরে অবশ্যই পাইতে চাই। সেটা না পাইলে বুঝি আমার স্বরূপের ও স্বভাবের ঠিক পূরণটি হয় না, সাধনার ও বিকাশের ঠিক সমগ্রতা ও সর্ব্বাঙ্গীনতাটি হয় না। বজ্রাদপি কঠোর তাই বুঝি কুসুমাদপি সুকুমারকে খোঁজে ; প্রাবৃটের বর্ষণ-কাতর রাত্রি তাই বুঝি প্রতীক্ষায় রহে, কবে সে এক স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ, উজ্জ্বল শরতের প্রভাত হইয়া পোহাইয়া শিশির-সিক্ত শষ্পাস্তরণ 'পরে আপন ময়ূখকরে সদ্য-শিথিল শেফালিকার সুরভি অর্ঘ্যাঞ্জলিটি ভরিয়া লইবে!

বিনয় নিজের ভেতরে যেটা পাইত না, কিন্তু স্থব্রতর ভেতরে পাইত, সেটাকে সে নিজের পক্ষে অনাবশ্যক বাড়্তি একটা কিছু ভাবিতে পারিত না। বিনয়ের জীবনে স্থব্রত তাই কেবল প্রিয় অতিথিরূপেই দেখা দেয় নাই, যার স্থান বাইরের আদর-অভ্যর্থনার বৈঠকখানায়; কিন্তু আপন হইতে আপনার হইয়া আসিয়াছিল, যার জন্য তার অন্দরের কোন গৃহেই পরদা ফেলিয়া রাখার দরকার হইত না। বিশেষ, তার গৃহাঙ্গনে আজ বছর দুই আগে যে গৃহলক্ষ্মীটীর পুণ্য আবাহনের জন্য অন্তরের প্রীতি ও স্নেহ দিয়া সে এলুন আলপনা আঁকিয়া রাখিয়াছিল, তার সঙ্গে স্থব্রতর এই প্রথম দেখাশুনা হইলেও, সে তার, স্নেহ-সোহাগ ঢালিয়া দেবার প্রতীক্ষায় উন্মুখ হৃদয়ের দুয়ারটির অভিমুখে দিন দিন নিকট, নিকটতর হইয়া আসিতেছিল। মাসখানেক আগে বাতায়নদ্বারে দাঁড়াইয়া লাল কাঁকরের রাস্তার বাঁকে যখন স্থষমা একখানা মোটর আসিতে দেখিয়াছিল, তখন তার যাত্রীটিকে বরণ করিয়া নেবার জন্য শুধু তার গৃহের সদরদ্বার নয়, অন্তঃপুরের সকল দ্বারই, অবারিত করিয়া রাখিয়াছিল সে।

এই মাসখানেকের মধ্যেই স্থব্রত দেখিতে পাইয়াছিল—তার ভাবুকতা এতটা বেশী পরিমাণে তার বৌদির সমবেদনার মাঝে নিজেকে প্রসারিত, উদাহৃত, সমাদৃত করিয়াছে, যতটা সে কখনই প্রত্যাশা করিতে পারে নাই। বিনয় গাম্ভীর্য্যের সমাদর করিত, তার সঙ্গ কামনা করিত; কিন্তু নিজে বড় একটা গম্ভীর হইতে পারিত না। স্থষমাকে গম্ভীরপ্রকৃতির বলিলে, ঠিক বলা হইবে না; কিন্তু সে গম্ভীর হইতে জানিত। প্রথম আষাঢ়ে পর্ব্বত-সানুদেশে সংলগ্ন মেঘমালার মত তার প্রকৃতিতে কখনও গাম্ভীর্য্য স্থস্থিরভাবে লাগিয়া রহিয়া একটা স্নিগ্ধ-গম্ভীর সমাহিত সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করিত; কিন্তু

একটু পরেই সে মেঘমালা সানুদেশ হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া সরিয়া যাইত—তখন বিচিত্র বর্ণে ও রূপে, আলোকে ও ছায়ায়, পর্ব্বত-গাত্র একটা লীলায়িত সুষমার স্বপ্নলোক হইয়া উঠিত! মেঘের পটান্তরালে যেন কোন রূপদক্ষ এতক্ষণ ধরিয়া এই স্বপ্নলোকেরই ছবি তার তুলিতে ফুটাইয়া তুলিতেছিল! সানুতলদেশে বিনয়ের মুগ্ধদৃষ্টি সেই সুন্দরকে, তার সেই আপন সুষমাকে, গম্ভীর-সুন্দর ও লীলায়িত-সুন্দর, এই দুই রূপে উপভোগ করিয়াও বুঝি বা অতৃপ্ত রহিত! যখন মেঘ উঠিয়া সরিয়া যাইত, পর্ব্বতের গায় শষ্পশ্যাম উত্তরীয়খানা হাওয়ায় চঞ্চল হইয়া উঠিত, অঙ্গে বিচিত্রবর্ণের পুষ্পসাজ দুলিয়া যাইত, কর্ণকুণ্ডল আর বক্ষের মুক্তামালা হইতে আলোক ঠিকরাইয়া পড়িত, ছায়ার কুহকস্পর্শ দু'একটা বিক্ষিপ্ত অলকদামেরই মত কপোল চুম্বন করিয়া যাইত—তখন বিনয় আর দূর হইতেই কেবল সম্ভ্রমমাখানো মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকার তাগিদ বুঝিতে পারিত না। সেও নিজেকে মুক্ত করিয়া, রিক্ত করিয়া সেই লীলায়িত, বিচিত্রিত মাধুরীতে ঢালিয়া দিত, লুটাইয়া দিত, বিলাইয়া দিত।

যেন কোন গুণী কলাবতের কেদারা বা কানাড়ার আলাপ। সে আলাপনে যোগ দেবার সাধ্য আমার নেই, কিন্তু তাই বলিয়া, সে আলাপচারী শোনায় অভিনিবেশ ও আনন্দ আমার ত' কম প্রগাঢ় নয়। আমার মৌন-উপভোগের দ্বারাই তার সত্যকার সম্বর্দ্ধনা। আমার অসাধ্য সুর তার সঙ্গে মিলাইতে আসিলে, তাকে স্পর্দ্ধাদ্বারা ক্ষুণ্ন, অবমাননা দ্বারা লাঞ্ছিত করা হয়। কিন্তু ঐক্যতানের ক্ষুধিত ঝঙ্কারটা যখন জাগিয়া ওঠে, তখন তার মিলন-আহ্বানে আমার নিজের সুরটাকে আর ধরিয়া বাঁধিয়া রাখার দরকার হয় নাত'! তখন তাতে যোগ দেওয়াতেই আমার তৃপ্তি, আর তাতেই সে ঐক্যতানেরও সম্পূর্ণতা।

বিনয়ের আসরটায় কলাবতের আলাপচারী আর ঐক্যতান সঙ্গীত —এ দুয়েরই আয়োজন হইয়াছিল কি? এ দু'রকমের আয়োজন না থাকিলে সে তার আসরটাকে অসম্পূর্ণ, এমন কি, অসহনীয়ভাবে রিক্ত, মনে করিত। চুপ করিয়া বসিয়া সাধাগলায় গানটি সে শুনিবে; আর, যখন অপরের গলায় গলা মিশাইয়া গাবার সময় তার আসিবে, তখন সে নিজেও গাহিবে;—এইটাই ছিল তার রসজ্ঞতার ও রস-সম্ভোগের স্বীকৃত, সমাদৃত ব্যবস্থা। সুব্রতর সঙ্গে বন্ধুত্বের ভেতরে এই ব্যবস্থাটাকেই সে প্রতিষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছিল।

বন্ধুর কবি ও দার্শনিকের মেজাজ তার কাছে কলাবতের কেদারা কানাড়া আলাপের মত ছিল।

বৌদি ও ঠাকুরপোয় কিন্তু এই এক মাসেই বেশ মিল হইয়াছে। গুণী কণ্ঠী কেদারায় তান তুলিলে, যন্ত্রী যেন বীণাটি তুলিয়া লইয়া তার তারে সেই রাগিণীরই মূর্চ্ছনা জাগাইয়া তুলিত! সুব্রতর কণ্ঠে আলাপ জাগিলে সুষমার অঙ্গুলী বীণার তন্ত্রীর ঘুমটি ভাঙ্গাইত; কিন্তু বিনয় তখন মূক আস্বাদনেই তৃপ্তি পাইত। যৌবনের প্রথমে নিজের সাবলীল-গতি কর্ম্ম-কল্লোল-মুখর নদীটিকে যে ধীর গম্ভীর উদার প্রবাহের সাথে সে মিশিতে দিয়াছিল, আজ বিবাহিত জীবনেও, তার নদীটি সে প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় নাই। আর এক তটিনী লীলা-চঞ্চল গতিতে আসিয়া পড়িয়া তার নদীটিকে অন্য কোন পথে লইয়া যায় নাই। বরং, কোন এক গভীর নির্ম্মল স্বাদু উৎসের ধারা বহিয়া আনিয়া, সেই নূতন নদী তার আপন নদীটির বন্যা, সেই কৈশোর-বন্ধুরই জীবন-প্রবাহের দিকে আরও সরল ও সহজ ভাবে অভিমুখীন করিয়া দিয়াছিল।

তার ছিল কর্ম্মের জীবন। রূপোর চামচ মুখে করিয়া সে ভূমিষ্ঠ হয় নাই। নিজের সাধনাতেই তার সিদ্ধিলাভ হইয়াছে

—সাতাশ আটাশ বছর বয়সে সে সিদ্ধি সামান্য নয়। মা-সরস্বতীর পানে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া করিয়া সে যে মা-লক্ষ্মীর মুখাবলোকন করিয়াছে, এমন নয়। বিদ্যাও সে যথেষ্ট অর্জ্জন করিয়াছে, আর, সে বিদ্যা আপনার দানে তার নামটিকেও অন্বর্থ করিয়াছিল। গরব করার মতন বিদ্যা, অথবা গরম হবার মতন টাকা, তার অবশ্য ছিল না। কিন্তু সেটুকু বা যতখানি তার ছিল, তাতে গণ্ডূষ-জল-বিহারী শফরী কেন, অনেক অগাধ-জল-সঞ্চারী রোহিতকেও ফর্ ফর্ করিতে দেখা গিয়াছে। কাট্নিতে তার লাইমের কারখানা। তার বাংলোখানা, আফিস, মোটর—এসব দেখিলে মনে হয় না যে, বাণিজ্যে তার অলক্ষ্মী বাস করিতেছেন। কর্ম্মে তার তৎপরতা প্রশংসনীয়, শৃঙ্খলা অনবদ্য। কর্ম্মক্ষেত্রে শক্তি তার পরাভবহীন, সিদ্ধি তার আশাতীত। কিন্তু ঐ কর্ম্মব্যাপৃত বাহু দু'টির ব্যবধানে, ঐ হিসেবী মগজের নীচে, যে প্রশস্ত হৃদয়খানা স্পন্দিত হইত, সেটা ছিল সার্ব্বজনীন সদ্ভাবের, অকুণ্ঠিত, অকৃপণ সদিচ্ছার ও উপচিকীর্ষার একটা সজীব উৎস। কর্ম্মকঠোরতার মাঝখানে, স্বাভাবিক রসোল্লাসে চারিধারে ক্ষরিত, তার এই প্রাণধারা যাকেই স্পর্শ করিত, তাকেই বিস্মিত ও মুগ্ধ করিত। কাজ আদায় করিতে সে জানিত, কিন্তু তার কারখানার একটা সামান্য মজুরও মনিবের হৃদয়ের মাধ্বীধারার পরিচয়ে বঞ্চিত ছিল না। সুষমা আসিয়া সুধু যে তার বাংলোটাকেই শ্রীসৌষ্ঠবমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিল, এমন নয়; তার সকল আকাঙ্ক্ষায় ও চিন্তায়, কর্ম্মে, ও প্রচেষ্টায়, একটা ভব্যতার ভঙ্গীমাত্র নয়, কিন্তু সত্যকার, সহজ যেটা মাধুর্য্য ও ঔদার্য্য, সেটাকে আরও বিকশিত ও বিচিত্রিত করিয়া দিয়াছিল।

সংসারে অনেক কৃতী লক্ষ্মীমন্তের অন্তরটা যেমনধারা উষর ভূমির মত নীরস অথবা বদ্ধজলের মত অচল হইয়া গিয়া থাকে, ভিতরে একটা

স্বাভাবিক, অনাবিল রসোচ্ছ্বাস থাকার দরুণ, বিনয়ের অন্তরটা তেমন-ধারা হইতে পারে নাই। খট্‌খ'টে শক্ত জমিনের ওপর ইঁট শুরকির পাহাড় গড়িয়া উঠিতে পারে; আবদ্ধজল পুকুরের ঘাট বাঁধাইয়া তার চারধারে রম্য উপবন রচিয়া তোলা যাইতে পারে। কিন্তু তার গতি নাই বলিয়া, সেটা অভিনব একটা কিছু, বৃহত্তর, মহত্তর, পূর্ণতর একটা কিছুর কাছে আমাদের আনিয়া পৌছাইয়া দেয় না। সাধারণ একজন ভাগ্যবান্ পুরুষ হয়ত' সুষমার মত পত্নীকে তার বাঁধাঘাটে স্ফটিক-তোরণ-স্তম্ভগাত্রে মধুমালতী লতাটির মত জড়াইয়া রাখিয়া, এবং জড়াইতে দিয়াই, সন্তুষ্ট হইত। কিন্তু জীবন যেখানে একটী নদীরই মত বৃহত্তর একটা কিছুর দিকে চলিয়াছে, সেখানে নদীর তটে স্থানে স্থানে বাঁধা-ঘাট থাকিতে অবশ্য বাধা নেই; আর সে সব বাঁধাঘাটের শোভা-সম্পা-দনে মধুমালতী অথবা অপর কোন ললিতমঞ্জরী সুরভি বল্লরীকে নিযুক্ত করিতেও বাধা নেই; কিন্তু নদীর বুকে যে ব্যক্তি তরীটি বাহিয়া চলিয়াছে, তার অবসর-বিনোদন ঐ রকম ধারা একটা বাঁধাঘাটে বসিয়া হইলে হইতে পারে, তার যাত্রার সফলতা বা সার্থকতা তাতে হয় নাত'। সুষমার হাতে হা'ল তুলিয়া দিয়া তাই বিনয় তরীর বৈঠাটি নিজের হাতে লইয়াছিল। তার বাহু দিয়া, মস্তিষ্ক দিয়া সে খাটিত, আর সুষমা তার হৃদয় দিয়া তাকে চালাইত। পদ্মার ধারে যে ব্যক্তি তার বাগানবাড়ী পাকা পোক্ত করিয়া গড়িয়াছে, ভরাভাদরে পদ্মার ডাক শুনিয়া তার ভয় হবারই কথা—বুঝি কীর্ত্তিনাশার ভাঙ্গন লাগিয়াছে! কিন্তু যে নদী পদ্মার সাথে মিলিবার জন্যই চলিয়াছে, তার সে ডাকে ভয় নেই, আশ্বাস আছে, আনন্দ আছে—মিলন যে তার আসন্ন, সন্নিকট! সুব্রতর লেখায়,গানে, কবিতায়, জীবনের নানান্ কাজের ভিতর দিয়া একটা গুরু-গম্ভীর, মুক্ত উদার প্লাবনের ডাক বিনয় শুনিতে পাইত; কিন্তু তা'তে

তার ভয় হইত না। নিজের ভেতর প্রাচীর তুলিয়া সে এমন একটা কিছু কৃপণের গুপ্ত ধনাগার গড়িয়া তোলে নাই, যেটা প্রাবনের মুখে অসামাল হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাবার ভয় সে করিত।

সুব্রতর কবিতা, গান, প্রবন্ধ—এ সব তারও শুনিতে ভাল লাগিত। কিন্তু সে মন্দিরের মঙ্গলারতির সামবাণী সে যেন একজন শ্রদ্ধালু, নীরব পূজার্থীর মতই বসিয়া শুনিত। তার অনলস, সরস, বিচিত্র কর্ম্মজীবনের সারা উপবন চয়ন করিয়া নানা উপচারে তার নীরব পূজার ডালি সে ভরিয়া আনিত। কিন্তু সুষমা সে মঙ্গলারতিতে শুধু যে পূজার্থিনী হইয়া আসিত এমন নয়, তাকে পূজারিণীও হইতে হইত। সুব্রতর কবিতা, গান এসব যে সে শুধু শুনিয়া যাইত এমন নয়; একটা সহজ এবং স্বচ্ছ সমবেদনা ও সহানুভূতির মর্ম্ম-দৃষ্টি লইয়া সে সুব্রতর সঙ্গে সে সবের আলোচনাও করিত। সে আলোচনার ফলে সুব্রত যে কেবল কতকটা লাভের অঙ্কই দেখিত এমন নয়; তার মধ্য হইতে এমনধারা একটা নূতন আলোক সে পাইত, এমনধারা একটা জীবন্ত আবেগ সে সঞ্চয় করিত, যেটাকে কখনও সে তার জমাখরচের খাতায় উঠাইতে ভরসা পাইত না। আর সে আলোক, সে উৎসাহ শুধু আলোচনা-প্রসঙ্গে সুষমা মুখে যা বলিত, তার ভিতর হইতেই বাহির হইয়া আসিত, এমন নয়; বেশীর ভাগ ফুটিয়া উঠিত—সুব্রতর কবিতা, গান শুনিয়া তার দৃষ্টি ও মুখমণ্ডলের যে অনির্ব্বচনীয়-ভাবমণ্ডিত ছবি, তারই, কখনো মৃদু কখনো স্পষ্ট, কখনো মলিন কখনো উজ্জ্বল, কখনো স্মিত কখনো কাতর, যত সব রেখাঙ্কনের নীরব, ভাবগর্ভ ভাষায়।

আজ এই এক মাসের ভেতরেই সুব্রত অনেক কিছু তার নতুন বৌদিটিকে শোনাইয়াছে—লেখায় যা কিছু তার বাণী পাইয়াছে; চিন্তায়, আশায়, কল্পনায় যা কিছু তার রূপ পাইয়াছে বা পাইতেছে,

কিন্তু যেটা লেখায় বা গানে এখনও বাণী পায় নাই। অনেক কিছু বৌদির সস্মিত আদরের স্পর্শেই বাণী পাবার জন্য ব্যাকুল হইত। "ঠাকুরপো, এটা তোমার কবিতায়, গানে ধরা দেবে না? সত্যি, লিখে ফেল। চমৎকার হবে।"—এইটে তার সুর ও ছন্দের ঘুম ভাঙ্গানর পক্ষে একটা কম বড় তাগিদ হয় নাই।

সুব্রতর প্রকৃতিতে অনেকটা, আর তার বৌদির প্রকৃতিতে কতকটা, ভাবুকতা থাকিলেও, তারা কেউই দুঃসহ, দুর্দ্ধর্ষ ভাবে গুরুগম্ভীর ছিল না। উভয়ের প্রকৃতিতেই প্রচুর সরসতা ছিল; উভয়ের অন্তরেই একটা অনাবিল, স্বচ্ছন্দ-গতি, অকুণ্ঠিত প্রসন্নতার ধারা বহিয়া যাইত। বাহিরের হাস্য পরিহাসে ফুটিয়া উঠিতেও সেটা কসুর করিত না। তাই সকাল বেলা বাসার কাছে একখানা পাথরে বসিয়া সুব্রত যখন তার ধ্যান হইতে জাগিবার উপক্রম করিত, তখন খাবারের ডিশ হাতে করিয়া সুষমা পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিত—

"কি—শিবের ধ্যান ভঙ্গ হ'ল?"

সুব্রত সহাস্য মুখে উত্তর দিত—

"শিবের ধ্যানভঙ্গের আয়োজনের ঘটাটা কি তোমার মনে আছে, বৌদি? শিবের ধ্যানভঙ্গ কি সহজে হয়?"

"তা হয় না ব'লেই ত' নিত্যিই বলছি তোমার দাদাকে—কোথায় আমার গৌরী বোন্‌টী তার কনকদেহলতাটিকে তপঃক্লিষ্ট কর্‌ছে, তারই সন্ধান নিতে।"

"ভুলে গেলে বৌদি! শিবের কিন্তু তাঁর বধুটীর জন্যে সন্ধান ক'রে বেড়াতে হয়নি।"

"শিবের হয়নি, কিন্তু দেবতাদের অনেক সল্লাপরামর্শ ক'রে যোগাযোগ ক'রে দিতে হ'য়েছিল—নয়?"

"কিন্তু যে বেচারীকে পঞ্চশর হাতে দিয়ে আড়ালে লুকিয়ে রেখে সব যোগাযোগ হ'য়েছিল, সে বেচারীর দুর্দ্দশার কথাটা মনে আছে ত' ?"

"তাকে আবার বাঁচিয়ে চাঙ্গা ক'রে নাকে খৎ দিতে হ'য়েছিল—এমন কর্ম্ম আর করব না ব'লে। সেটাও মনে রেখো। আর শুধু কি নাকে খৎ ?—দাসখৎও বটে।"

এই রকম ধারা পরিহাস সময় সময় না হইত এমন নয়। বিদায়ের দিন যখন বৌদির চোখ দুটি জলে ভরিয়া উঠিয়াছিল, তখন তাকেও পশ্চিম গগন-সীমান্তে একটা পাহাড়ের ধূসর রেখার দিকে কিছুক্ষণ তাকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল বৈ কি ! যেখানে, যে অবস্থায়, যে ভাবেই সে থাকুক্ না কেন, বৌদির মমতা ও সমবেদনা মাখানো শুচি-শুভ্র ঐ স্নেহাঞ্চলের মায়া তাকে চিরদিনই কাছে টানিয়া আনিবে—এটা সে ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিল।

দ্বিতীয়

বোম্বে মেল কাটনি ষ্টেশন হইতে ছাড়িয়াছে। যতক্ষণ প্ল্যাটফর্ম্মে বন্ধুকে দেখিতে পাওয়া গেল, ততক্ষণ সুব্রত তার কামরার দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া সেদিকে তাকাইয়া রহিল।

যেখানে মিলনভূমিতে কোথাও একটুখানি ফাট ধরে নাই, হয়ত' ফাট ধরার সম্ভাবনাও নাই, সেখানেও দেশকালের, এমন কি কল্পিত, সম্ভাবিত ব্যবধানও, একটা গভীর ব্যথার কম্পন সৃষ্টি না করিয়া যায় না। সে আভ্যন্তরীণ ভূকম্পনের ফলে, যে রহিল আর যে দূরে সরিয়া গেল, তারা হয়ত' অন্তরে আরও কাছাকাছি হইল; তাদের মিলনভূমি আরও দৃঢ়, আরও জমাট হইল। তাদের অন্তর যেখানে যেখানে হয়ত' কতকটা শিথিলসংস্পর্শে পরস্পরের সঙ্গে লাগিয়াছিল; তাদের মিলনের মাঝে যেখানে যেখানে একটু আধটু অনাবশ্যক ফাঁক রহিয়া গিয়াছিল; —সেখানে সেখানে সংযোগ আরও নিবিড়, আরও গাঢ় হইয়া থাকে ঐ রকম ধারা বাইরের ছাড়াছাড়ির ফলে। একটা বোতলে যেন কতক-গুলো জিনিষ এলোমেলো ভাবে মিশিয়া রহিয়াছে; ঝাঁকানর ফলে তারা আরও জমাট ও গাঢ়ভাবে মিশিয়া গেল। বিরহ, ছাড়াছাড়ির একটা আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া এইভাবে অন্তরের মিলনটাকে আরও জমাট করিয়া দেয়। যেখানে যেখানে ফাঁক ছিল, খোঁচ-খাঁচ ছিল,— হয়ত' অজ্ঞাতসারেই ছিল,—সে সব সারিয়া ঠিক করিয়া লয়। মেলামেশায় ভাবের সৃষ্টি, ছাড়াছাড়িতে সে ভাবের পুষ্টি। অবশ্য, যে ভাব মরিয়াই জন্মায়, মেলা-মেশায় তার ঠাট্টা কোন মতে বজায় থাকে; ছাড়া-ছাড়িতে তার মৃত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোই পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া আলাদা

হইয়া যায়। যে সজীব, সে চলাফেরা করিয়া আরও জীবন্ত হয়; আর যেটা মৃত কাঠামো মাত্র, সেটাকে নিয়ে বেশী নাড়াচাড়া কারলে, তারত' ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যাবারই কথা।

ষ্টেশনে গাড়ী হুইসিল দিয়া মৃদুমন্থর গতিতে চলিতে আরম্ভ করিলে, এক প্রবীণ ভদ্রলোক সুব্রতর কামরায় উঠিলেন। সুব্রত দরজায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাড়াতাড়ি পাশে সরিয়া তাঁকে গাড়ীতে ঢোকার পথ দিয়াছিল মাত্র। তখন সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য সে করিতে পারে নাই। বিনয় গাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া আসিতেছিল—তার সঙ্গে সুব্রত শেষ কথাবার্ত্তাটা কহিয়া লইতেছিল। তারপর, গাড়ী প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম ছাড়িয়া মাঠে আসিয়া পড়িলেও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সে দরজায় দাঁড়াইয়া বাইরের দিকেই তাকাইয়াছিল। কামরায় সে যে একাকী যাত্রী নয়, তা সে জানিত। কিন্তু কে বা কারা যে তার সেদিনকার পথযাত্রার সঙ্গী, তা' সে এখনও লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া লয় নাই। বিনয়ের ভৃত্য কামরায় উঠিয়া প্ল্যাটুফর্ম্মের দিকের বার্থটায় তার বিছানা পাতিয়া দিয়াছিল; কুলিরা যথাস্থানে তার মালপত্র তুলিয়া দিয়াছিল। সেদিকে মনোযোগ দেবার দরকার তার হয় নাই।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়। পশ্চিম গগনসীমান্তে একটা অনুচ্চ পাহাড়ের মসীরেখার অন্তরালে যেন একটা মহাদাবানলের রক্তরাগ মেঘমুক্ত আকাশের আসমানী ওড়নাটা খুনখারাপি রঙ্গে রাঙ্গিয়ে দিয়েছিল। দূরে ঐ পাহাড়ের রেখা সত্য সত্যই যেন একটা কালো রেখা টানিয়া, অজানা বিপুলকে, দেখা-শোনার পরপারের মহারহস্যটিকে, সাধারণ প্রতীত পরিচয়ের বাইরে আটক করিয়া রাখিয়াছিল। দৃষ্টি যেখানে চলে না, মনের কৌতূহল সেখানে উদ্‌গ্রীব হইয়া শুধায়—কি আছে ওখানে, ঐ সুদূর পাহাড়টার ওপিঠে? এই রকমেরই মাঠ ঘাট, বন জঙ্গল, ঠাঁই ঠাঁই

লোকের বসতি? কল্পনা মাথা নাড়িয়া বলে—"না গো, তা হ'তে যাবে কেন? গগন কিনারে ঐ যে কালো পাঁচীল, ওর ওপিঠে একটা কল্পলোক, যেটা তোমার এই দেখাশোনার একঘেয়ে বাস্তবের কোনই তোয়াক্কা রাখে না; এর মামুলী ব্যবস্থা বন্দোবস্তর কোনই ধার ধারে না; সেখানে কোন বিষাদম্লান সন্ধ্যায় যদি একটা দৈত্য এসে কল্প-কান্তারের মাঝে আগুন লাগিয়ে দিয়ে বৈশ্বানরের রক্তরঞ্জিত বিশ্বরূপ দেখারই সাধ ক'রে থাকে, অথবা তার ভেল্কি দিয়ে একটা রক্ত প্রস্রবণের ঘুম ভাঙ্গিয়ে সহস্র ধারায় বিপুল আবেগে আকাশে তারি ছড়িয়ে পড়ার বাজি দেখ্‌ব ভেবে থাকে, তাতে, এপারের বাসিন্দা, এপারেরই খবরদার, সমজদার তোমাদের অবিশ্বাস করার কি এক্তার আছে, বাপু? দূরের ঐ পাহাড়ের সারটাকে একটা কালো পাঁচীল ভাব্‌তে বাধে ত', ভাব না —ওটা একটা কালো পরদা—এই স্পষ্ট ঝক্‌ঝকে আলোর দেশটাকে একটা অস্পষ্ট আবছায়া হেঁয়ালির দেশ থেকে তফাৎ ক'রে রেখেছে। একটা অসীম নীল চাঁদোয়ার তলে এক বিরাট্‌ রঙ্গালয় বিচিত্র রূপ রঙ্গের সাজে কে যেন সাজিয়ে রেখেছে। কখনও মাথার ওপরে ঝাড়ের আলো জলে ওঠে এমন শুভ্র, তীব্র ছটায়, যে তাব পানে নয়ন তুলে চায় কার সাধ্য! কখনও পূবের স্ফটিক দেওয়ালে কে যেন প্রবালের দেউটী জেলে দিয়ে যায়, আর সোণালি কিরণে বিচিত্র রঙ্গালয়ের প্রতি আসনপীঠে হীরা মাণিক চুণী পান্নার ঝলক শতধা বিচ্ছুরিত হয়ে যায়; কখনও বা পশ্চিমের সীমা-প্রান্তে কোন্ অজানা বেদীতলে হোমের আগুন তার লেলিহান রক্তজিহ্বা মেলে নীল চাঁদোয়ার গায়ে সাদা মেঘের জরির কাজগুলোতেই আগুন লাগিয়ে দেয়!

"কিন্তু সামনের—রঙ্গমঞ্চের ঐ কালো পরদাখানা কখন উঠবে, তা কে জানে? পরদার এ পিঠে সব্বাই প্রতীক্ষায় উদ্‌গ্রীব, অসহিষ্ণু হ'য়ে

ব'সে আছে ; ও-পিঠে যারা সাজঘরে সাজ্‌ছে, তাদের সাজ শেষ হবে কখন ? পরদাখানার ও-পিঠে যে আসর পাতা হচ্ছে, যে বাসর সাজানো হচ্ছে, সেটা নিশ্চয়ই এ পিঠের সবাইকার পরিচয়ে আশ্চর্য্য, অদ্ভুত, অভূতপূর্ব্ব, অচিন্তিতপূর্ব্ব একটা কিছু।"

কথাটা না মানিলে আমার কল্পনার রাণীটি যে অভিমান করিয়া গোসাঘরে খিল দেবেন ! কাজেই বলিতে হইতেছে—ঐ দূরের পাহাড়টা কোন অজানা কল্প আসরেরই যবনিকাপটই বটে !

সুব্রত দরজার ধারে দাঁড়াইয়া সেই সাঁঝের বেলা কল্পনা কুহকিনীর মান ভাঙ্গিতে চেষ্টা করিতেছিল কিনা, জানি না। বোম্বে মেল ঘনায়মান ছায়ার শিথিল বাধা হেলায় ঠেলিয়া উড়িয়া চলিতেছে। যেন—সম্মুখে মিশকালো দীর্ঘ রাত্রি ; সাঁঝের আলোর শেষ দীপ্তিটুকু চোখে লাগিয়া থাকিতে থাকিতেই সিন্ধুপারের যাত্রী বিহগটি তার নীড়ের উদ্দেশ্যে প্রাণ-পণে উড়িয়া চলিয়াছে ! সিন্ধুর বিস্তার, ঝড়ের বাধা, সম্মুখে স্তরে স্তরে ঘনীভূত ছায়ার পাহাড়-মরীচিকা—কিছুতেই আজ তার আকুল অভিযান পরাজিত হইবে না। কত মাঠ, কত বন, কত বসতি পিছনে রাখিয়া গাড়ী ছুটিয়া চলিয়াছে। দু'একটা ষ্টেশনও যেন ভীত চকিতের মতন পিছনের দিকে পলাইয়া প্রাণগতিকে বাঁচিয়া গেল ! সম্মুখে শুক্লপক্ষের রাত্রিত' নয়—বিরল ছায়ারাশি ক্রমে গাঢ় হইয়া আসিবে যে ! দূরের পাহাড়ের সা'র এখন আর দূরে নাই—কাছে, মনে হয় যেন ডাকে সাড়া দেয় এতটা কাছে—সরিয়া আসিয়াছে।

আঁধার হবার তখনও একটুখানি দেরী ছিল। আসন্ন যবনিকার অন্তরালে কল্পনটীদের চরণপুটে অলস মঞ্জীর-শিঞ্জন হয়ত ঝিল্লীস্বরে সবে মুখরিত হইয়া উঠিতেছিল তখন। তাদের চরণের প্রথম ব্রীড়াবিজড়িত স্পন্দনে। গাড়ীর গর্জ্জানিতে ভাল শোনা যাইতেছিল না।

রেল লাইনের খানিক দূর দিয়ে একটা পাহাড়ের সা'র গাড়ীর সঙ্গে যেন দৌড়ের পাল্লা দিয়া চলিয়াছে। সুব্রত তখন লক্ষ্য করে নাই—তার পিছন দিকে, গাড়ীর ওধারেও, অমনি আর সা'র পাহাড়। লাইনের ধারে মাঠে ঝোঁপে ঝোঁপে ঝিল্লীরা ঝিঝিটের ঝাজালো সুর ভাঁজিতে সুরু করিয়া দিয়াছিল। পাহাড়ও গাড়ীর সঙ্গ ছাড়িবে না, ঝিঝির ঝিঁঝিও না। সুব্রত এখনও কামরার দরজায় ছিল। কল্পনা-রাণী, বোধ করি, তার চোখ দু'টিতে ভেল্কির অঞ্জন লাগাইতে পারে নাই। কিন্তু চোখ দিয়া সেত দেখিতেছিল না, তার অন্তর দিয়া সে দেখিতেছিল —সেই পাহাড়ের গায় সুন্দর বাংলোটি—সাম্‌নে তার ছোট্ট একখানা গোলাপের ক্ষেত—সাঝের বেলায় সেখানে কোন্ শুচি-শুভ্রবসনা নারী আপন হাতে ঝরণা লইয়া গোলাপ গাছের মূলে স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ স্নেহধারা ঢালিয়া দিতেছে! সে স্নেহধারার আস্বাদ সেও তার ক্ষুধিত প্রাণের পরতে পরতে যে পাইয়া আসিয়াছে! আর, পশ্চিম দিকের পাহাড়ের ঠিক শিয়রে একটা তারা—তার দোসর তখন কেউ ছিল না—প্রসন্ন দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়াছিল—কত উদার, কত প্রশান্ত, কত স্থির সে দৃষ্টি! সে দৃষ্টি বুঝিবা তার বন্ধুরই চির-বিশ্বস্ত, চির-আশ্বাস-ভরা দৃষ্টির মতন!

"বাবা, ম্যাগাজিনখানা কৈ—দেখ্‌তে পাচ্ছিনে ত?"

"তবে ভুলে এসেছ বুঝি?"

"দেখি, তোমার পোর্টফোলিওটার ভেতর দিয়ে ফেলেছি কি না।"

পাহাড়ের পাদদেশে কোন্ কদম নাগকেশরের বনে সদ্যফোটা ফুলের রেণু মাখিয়া পাহাড়ী বাতাস তখন গাড়ীর ভেতর একটা অতিমৃদু অস্পষ্ট সুরভি-হিল্লোল আনিয়া দিতেছিল। বনে বনে ঝিল্লীর সুরে কি জানি কি একটা করুণ মিনতিতে ভরা কোমল পরদা গুঞ্জরিয়া যাইতেছিল। কোথায় কোন্ কদমচূড়ায় বসিয়া একটা পাপিয়া বুঝি—সাঁঝের শেষ

রশ্মিরেখাটির পানে চাহিয়া বিরহ-বিধুর আহ্বানে ডাকিতেছিল তার দূরের বধূটিরে, আজিকার বাসরে তার পক্ষপুটের উষ্ম-স্পর্শের নিভৃত-সঙ্গিনী হবার জন্য! গাড়ীর গর্জ্জানিতে তার সেই আকুল আহ্বানটি পরাস্ত হয় নাই।

কল্প-আসরের যবনিকা এতক্ষণে বোধ হয় উঠিয়াছিল—কল্পনটীদের নূপুর-নিক্কণের অনুরণনের মাঝে একটা দূরাগত বীণার ঝঙ্কার, মঞ্জু-কোমল কিন্তু ধীর-গম্ভীর, জাগিয়া উঠিতেছিল কি? সুব্রত এতক্ষণ কোন কল্প-আসরের স্বপ্ন দেখিতেছিল না। তার মন, তার চিন্তা ছিল অন্যত্র। কিন্তু সেই দূরাগত বীণাটির ঝঙ্কারের রেশটি তার কাণে বাজিল। সারা মরমের ভিতর দিয়া একটা শিহরণের তড়িৎ-হিল্লোল খেলিয়া গেল। জন্ম জন্ম ধরিয়া তার গোপনতম, অন্তরতম সত্তা যেন এরই জন্য প্রতীক্ষা করিয়া আসিতেছে! প্রাণের গভীরতম স্তরে কোন্ গোপন নির্ঝরের মুখ এত দিন কে যেন হিরণ্ময় পাত্রে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল। আজ গাড়ীর ভেতর, সাঁঝের বেলায়, কোন্ চির-প্রতীক্ষিত চির-অবোঝা প্রিয় সম্ভাষের শুধু পরশ-লেশটুকু তার সেই গোপন ঝরণার মুখে সোণার ঢাক্না এমন করিয়া খুলিয়া দিল! সে নিজে ব্যাপারটা বুঝিল কি?

ভারি মিষ্টি একটা গলার আওয়াজ শুনিয়া সুব্রতর চমক ভাঙ্গিল। সে ফিরিয়া চাহিল গাড়ীর ভিতর পানে। আধঘণ্টা ধরিয়া সেদিকে সে খেয়ালই করে নাই। তার সহযাত্রীদের পানে সে তাকায় নাই। এইবার চাহিয়া দেখিল—কি দেখিল—কারে?

তরুণী সে—বোধ হয় মেঘলোকে কোন্ প্রবালের দ্বীপে বসিয়া আকাশগঙ্গায় তার সাঁঝের স্নানটি সারিয়া আসিয়াছে। পরণে তার দুকূল—যার বুনন, যার বর্ণফলানো সম্ভবে কেবল সান্ধ্য গগনেরই মেঘমালার কনকপুরীতে যে গোপন শিল্পী তার নিপুণকরে কিন্নরীদের

অঙ্গে ওড়না বুনে দেয়, সেই শিল্পীরই সযত্ন শ্রমে। স্নান সমাপনে আর্দ্র চিকুর-রাশি সে এখনও বাঁধে নাই; এলাইয়া রহিয়াছে। সত্যই—এ মরলোকের চপল ও মলিন কোন কিছু, অশোভন ও অসুন্দর কোন কিছু, যেন সেই তরুণীর অঙ্গ স্পর্শ করে নাই। তার বৌদি বলিয়াছিল বর-কামনায় তপস্যা-নিরতা তন্বী গৌরীর কথা। এ তরুণীর যৌবন-লাবণ্য ফেনিল মদিরধারায় ক্ষরিয়া যাইতেছিল না। তার অনবদ্য সুন্দর অঙ্গে রাঙা সিল্কের শাটির ভাঁজে ভাঁজে লাগিয়াছিল কোন এক তাপসীর শুচিতা ও সংযম; বসন-অঞ্চলের লীলায়িত চাঞ্চল্যে ফুটিয়া উঠিয়াছিল কোন এক আরতিদীপকরা ব্রতচারিণীর গেরুয়া বসনের পুণ্য আভা। সন্ধ্যায় রক্তরাগের শেষস্পর্শ তার কপালে রক্তচন্দনের একটা মৃদু ছোপ দিয়াছিল।

বয়স তার সতেরো আঠারো বোধহয় হবে। মাথায় ঘোম্‌টা দেওয়া ছিল না; কবরীতে ঘোম্‌টার একটা মিষ্ট দুষ্ট ছলনাটিকেও সোনার সেফ্‌টিপিন দিয়া আটক করার চেষ্টাটুকু হয় নাই। কুঞ্চিত ঘন কুন্তলরাশি অসামাল ও লীলায়িত, কিন্তু নিঃসঙ্কোচেই, পিঠে এলাইয়া ছিল। গাড়ীর মধ্যে উদাস হাওয়া সে কদম-নাগকেশরের গন্ধের আভাসটুকুমাত্র বহিয়া আনিতেছিল, তার চাইতে তরুণীর কুন্তল-বাস উগ্র নয়। অনুভূতির স্নায়ুগুলি সে গন্ধে তৃপ্ত হয়, চঞ্চল হয় না, উস্‌খুস্‌ করে না। কাণে তার প্রবালের দুল—হয়ত' মুক্তোরই হবে—সাঁঝের রাঙা রঙের হোলী খেলায় রাঙা হইয়া গেছে। হাতে সোণার ষ্ট্রাপে বাঁধা রিষ্ট-ওয়াচ—গায়ের রংএর প্রতি তার রংটি স্পর্দ্ধা দেখাইতে সাহস করে নাইত'। গলায় কোন সরু হার ছিল কিনা, বলিতে পারি না। বাইরে অপ্রকাশ সে। পায়ে সাণ্ডেল অবশ্যই ছিল। সর্ব্বত্র একটা সৌষ্ঠব, একটা সুরুচি। সাজ ভূষা যথাসম্ভব নব্য ধরণেই বটে।

সে দাঁড়াইয়াছিল ওধারের বার্থটার কাছে। হাতে রুমালে চাবির রিং। পোর্টফোলিও খুলিয়া দেখিবে। মাঝখানের বার্থে ছিলেন সেই প্রবীণ ভদ্রলোক—গাড়ি ছাড়িলে যে ভদ্রলোকটিকে গাড়ীতে উঠিতে সুব্রত দেখিয়াছিল কটাক্ষে। কাট্‌নিতে তাঁরা ওঠেন নাই—নিশ্চয়। হয়ত' বা জব্বলপুর বা আরও দূর থেকে আস্‌ছেন। ভদ্রলোকটি কোন কাজে হয়ত' কাট্‌নি ষ্টেশনে একবার নেমেছিলেন। ভদ্রলোকটির বেশ সৌম্য গম্ভীর মূর্ত্তি—অথচ খোলা সদানন্দ ভাবের তাতে অভাব আছে মনে হয় না। বয়স পঞ্চাশের উপর। সাহেবি পোষাক নয়—তবে খাসা সভ্য ভব্য সৌখীন। সুব্রত খদ্দর পরিত। সাদা ধব্‌ধবে খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী ছাড়া আর কিছুই তার অঙ্গে ছিল না। অঙ্গে উঠিতেও সে দিত না। তার পায়েও সাণ্ডেল। তার সুন্দর, সুঠাম বলিষ্ঠ দেহ খদ্দরের পোষাকে অবশ্যই বেমানান হইত না, হয় নাই। যাঁরা আজ তার সঙ্গে গাড়ীতে সহযাত্রী, তাঁদের বেশভূষা আসবাব—সব তাতেই সুরুচিসঙ্গত সৌখীনতার একটা জলুস লাগিয়াছিল। জানিনা তাঁদের রুচিতে সুব্রতর বেশভূষা কেমন ঠেকিতেছিল। বলা বাহুল্য, কামরায় তারা তিন প্রাণী বই আর কেউ ছিল না।

সুব্রত ওদিকে ফেরা মাত্রই তার সঙ্গে তার "চার চোখে" মিলন হইয়াছিল কি না, তা জানি না। প্রথমদৃষ্টিতেই প্রেমে পড়ার অবশ্য অভাব নেই। সুব্রত তাই পড়িয়াছিল কি না, তা সুব্রতকে পরে জিজ্ঞাসা করিলেই চলিবে। গল্পলেখকের বাজে লোকের বালাই নেই; তার কোন জিজ্ঞাসাকেই কোনখানেই নিরুত্তর হইয়া শুক্‌নো মুখে ফিরিতে হয় না। আর তরুণীর মরমের গা ঘেঁসিয়া বসিতে, তার মনের কোণে কাণাকাণি করিতে, প্রবীণ গল্পলেখকেরও গোড়ায় বোধ হয় একটুখানি সরম হয়, বাধ বাধ ঠেকে। তাই—

না হয় থাক্ সে কথা এখন। তবে, সুব্রত এটা অবশ্য লক্ষ্য করিয়াছিল যে, তাকে খদ্দরে মণ্ডিত দেখিয়া—যদিও তার মাথায় গান্ধী ক্যাপ ট্যাপ ছিল না—পিতাপুত্রীর মুখে কোন অস্বস্তি বা বিরক্তির ছায়া পড়ে নাই। বরং, তাঁদের দৃষ্টি ছিল—সশ্রদ্ধ, জিজ্ঞাসু। পিতা-পুত্রীর এই সাধারণ বিবৃতিতেই আপাততঃ আমাদের সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

খোলা পোর্টফোলিও হইতে একটা ম্যাগাজিন বাহির হইল—সম্ভবতঃ টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়ার ইলাস্ট্রেটেড্ উইক্লি। এঁরা নব্যতন্ত্রেরই বটে। মডার্ণ রিভিউ ইত্যাদি এঁদের টেবিলে আদৌ পড়িয়া থাকে, কি না, তা অবশ্য সুব্রত বলিতে পারিল না। তবে, এটা সে বুঝিল যে অন্ততঃ অবসরবিনোদনের দিক্ দিয়ে, সাহেবী কাগজে এঁদের বিরাগ নেই। অনুরাগ আছে কি না, তা ট্রেণ জার্ণি করার সময় কারুর হাতে ঐ শ্রেণীর একখানা কাগজ দেখিয়াই স্থির করিয়া ফেলা, অন্যায়। যাঁরা শুধু অবসরবিনোদনের জন্য নয়, প্রয়োজনের গরজে বা অজুহাতে, ষ্টেটস্‌ম্যান, টাইমস্ অফ্ ইণ্ডিয়া ইত্যাদি সাহেবী কাগজে সাহেবী "খোস মেজাজের" আঘ্রাণ নেন, সুব্রত নিজেকে তাঁদেরি একজন মনে করিতে কুণ্ঠিত হইত; কিন্তু তাই বলিয়া, তাদের সকলকেই নির্ব্বিচারে লরি বোঝাই করিয়া জাহান্নমে দাখিল করিয়া দিতেও তার উৎসাহ ছিল না। সাহেবীয়ানা সংস্পর্শমাত্রই অস্পৃশ্য করিয়া তোলে, এতটা স্বাদেশিকতার শুচিবায়ুগ্রস্ত সে কোন দিন হয় নাই।

"আপনি ক'দ্দূর যাচ্ছেন?" ভদ্রলোকটি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আজ্ঞে, কল্‌কাতা। আপনারা?"

"আমরাও কলকাতা যাচ্ছি। ভালই হ্যালো আপনাকে সঙ্গী পেয়ে।"

"আমার ত' ভয় হচ্ছিল—আমি এ কামরায় এসে আপনাদের হয়ত' অসুবিধেয় ফেলেছি।"

"মোটেই না। লম্বা জার্ণিতে, বিশেষ রাত্রিকালে, আমার মত বুড়ো-মানুষের পক্ষে মেয়ে নিয়ে ট্রাভল্ করায় রিস্ক একটুখানি আছে মনে হ'য়েছিল। চাকরদের কারুকেও সঙ্গে নেবার সুবিধে হয় নি, যে আমরা ঘুমিয়ে পড়লে মধ্যে মধ্যে তত্ত্বতল্লাস নিয়ে যাবে। সচরাচর লম্বা জার্ণি করতে হলে আমার ছেলে—সুপ্রিয়—আমাদের নিয়ে যায়। এবারে সেও আসতে পারে নি।"

ভদ্রলোকটি মেয়ের নাম যখন করিলেন, তখন সুব্রতর দৃষ্টি ফিরিয়াছিল সে দিকে—যেখানটায় বসিয়া সে তার ম্যাগাজিনের রঙ্গীন পাতাগুলো উল্টাইতেছিল। বাবার শেষ কথাগুলো কাণে যেতে তার ভুরু একটুখানি কুঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল কি? বোধ হয় উঠিয়াছিল—কিন্তু মৃদু একটা রেখায়, ক্ষণেকের জন্য। একটা মৃদু প্রতিবাদে কি? প্রতিবাদ ঠিক হয়ত' নয়—কিন্তু সুব্রতর মনে হইয়াছিল, কি যেন একটা অনুযোগ তাতে ছিল—যেন বাবা তার প্রতি একটুখানি অবিচার করিয়া ফেলিয়াছেন। ভদ্রলোকটিও মনে মনে তা বুঝিলেন—তাদের ট্রেণ জার্ণির অসহায়তার কথা বলিতে যাইয়া, সেটার যেটা প্রচ্ছন্ন অপযশ, তার ভাগী করিয়া ফেলিয়াছিলেন তাকে, যে তার ভাগ ন্যায়সঙ্গতভাবে অস্বীকার করিলে অবশ্যই করিতে পারে। প্রধানতঃ নিজেরই যে অপযশ, তার বখরাদার করিয়া ফেলিয়াছেন তাঁর মেয়েকে। তাই আবার বলিলেন—

"ওটা কি জানেন?—আমারই নার্ভস্নেস্। রাত-বিরিতে গাড়ীতে চলাফেরা করার সময় কারুর কারুর সেটা আসে। ঠিক কি কারণে তাও বলা যায় না। হয়ত নিজের জন্য ততটা নয়, যতটা যাদের সঙ্গে যাচ্ছি তাদের জন্য। এ দুর্ব্বলতার অপযশ আমার মেয়ে সুচরিতার (মেয়ের দিকে ঈষৎ মাথা নাড়িয়া) নেই। কলকাতায় বেথুনে ও আজ দুবছর

পড়্ছে। দু'একবার একলাটিও জব্বলপুর থেকে আসা যাওয়া ক'রেছে। আমরা হয়ত' কত ভেবে মরেছি। আমাদের দেশে বিয়ের ক'নে চেলির পুঁটুলিরূপে দেখা দেন। তারপর ক'নে বেশ গিন্নী বান্নী হ'লেও, তাঁকে নিয়ে পথে চলাফেরা করার দরকার হ'লে, হয় সেই 'পথি নারী বিবর্জ্জিতা' নীতি মেনে চল্তে হয়, নয় তাঁকে একটা অসামাল লাগেজের সামিল ভেবে নিতে হয়। আজকালকার মেয়েরা কিন্তু সেই মামুলী ব্যবস্থার বিদ্রোহী হ'য়ে উঠ্ছেন। চেলির পুঁটুলি আর বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। আর 'পথি পুরুষ-বিবর্জ্জিতা' হ'য়ে মেয়েরা চলাফেরা কর্তেও শিখেছেন। দরকার হ'লে দু'চারটা জ্যান্ত লাগেজও বেঁধে এঁরা সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন। অবিশ্যি ভালই হচ্ছে। আমরা—বুড়রা—এই সব পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নিজেদের বাইরের চাল-চলনগুলো যতটা খাপ খাইয়ে নিতে পার্চ্ছি, ভেতরটা ততটা বোধ হয় পার্চ্ছিনে। তাই, যেখানে ভাব্বার, ব্যস্ত হবার কিছু নেই, সেখানেও মিছে ভেবে মরি। আমাদের ভেতরটায় এখনও সেই চেলির পুঁটুলি, আর 'পথি নারী-বিবর্জ্জিতা'র দিনই যেন জোর ক'রেই চল্ছে।"

ভদ্রলোকের কথাগুলো শুনিয়া সুব্রত একটুখানি না হাসিয়া থাকিতে পারিল না। তার চোখ দুটি আবার সেইদিকে গেল—যেখানে তার—সুচরিতার—মুখখানায় সেই ক্ষীণ অনুযোগের রেখাটুকু মিলিয়া যাইতেছিল একটা স্মিত, সগৌরব সম্মতির প্রসাধনে।

কথাবার্ত্তা আরও কিছুক্ষণ চলিল। তখন আঁধার ঘনাইয়া আসিতে-ছিল। আঁধারের বুক চিরিয়া মেল ছুটিতেছিল। দুচারিটা ষ্টেশন দেখিতে দেখিতে পিছাইয়া গেল। কামরায় বিজলি বাতি জ্বলিতেছিল। বাইরের হাওয়া কামরার খোলা জানালাগুলোর ভেতর দিয়া খাসা খেলিয়া বেড়াইতেছিল—মাথার ওপরে পাখা খুলিয়া রাখার দরকার হয়

নাই। পাখার সেই—একঘেয়ে, অবসাদকর “বাস” আওয়াজটা তাদের অসহিষ্ণুতায় অতিষ্ঠ করিয়া তোলে নাই। বেশ সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়ে তাঁদের পরিচয় সুব্রত পাইল। ভদ্রলোক—মৃত্যুঞ্জয় মুখোপাধ্যায়—আগে নাগপুরে এড্‌ভোকেট ছিলেন। পরে আইনের ব্যবসা ছাড়িয়া সঞ্চিত অর্থে তিনি কাট্‌নি মাইহার প্রভৃতি অঞ্চলে সিমেণ্ট ও লাইমের কারবার আরম্ভ করেন। কাট্‌নির কারবার এখন নাই। সচরাচর তিনি জব্বলপুরেই থাকেন। এক ছেলে, এক মেয়ে। ছেলেটি সুপ্রিয়—মেয়ের চেয়ে বছর দুই-এর বড়। কলিকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ে। জব্বলপুরে রবার্ট্‌সন্‌ কলেজে পড়ায় সে মত করেনি। সামার্‌ ভেকেসনের অবসানে মৃত্যুঞ্জয় বাবু মেয়েকে কলিকাতায় লইয়া যাইতেছেন। তাঁর নিজের শরীরটা ইদানীং তত ভাল যাইতেছিল না—ইন্‌সোম্‌নিয়া। কলিকাতায় ডাক্তারদের পরামর্শ নেবার দরকার ছিল। নৈলে—সুচরিতা একলাও দু-একবার যাওয়াআসা করিয়াছে।

সুব্রতকেও অবশ্য নিজের পরিচয় দিতে হইল। বাবা ইহলোক ছাড়িয়া গেছেন—বাড়ীতে মা আছেন। ঐ এক সন্তান। দেশে কিছু তালুক মুলুক আছে। তাতেই চলে। কাট্‌নিতে তার বন্ধুর কাছে আসিয়াছিল। কিন্তু এ কথাটা তার অবশ্য জানাবার দরকার হইল না যে, সে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্‌টরেট্‌ পাইয়া, কালাপানি পার হইয়া বছর দু'তিন বিদেশ ঘুরিয়া সম্প্রতি ফিরিয়া আসিয়াছে। দু'একখানা বইও সে লিখিয়াছিল—পদ্য এবং গদ্য। সে কথাটা বলাও আবশ্যক হইল না।

খানিকক্ষণ কথাবার্ত্তার পর সুচরিতা ফ্লাস্ক হইতে ঢালিয়া এক পেয়ালা চা বাবাকে দিল। একখানা ডিসে করিয়া খাবারও। দেবার সময়

সুব্রতর পানে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া বাবার মুখের দিকে চাহিল। সে চাহনির ইণ্টারপ্রেটার হইতে হইল অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে।

"আপনাকেও এক পেয়ালা চা দেবে?" সুব্রত মাথা নাড়িল।

"—ও, চা খান না বুঝি? কিন্তু খাবার চল্‌বে ত'?"

"তা চলে। কিন্তু বন্ধু সঙ্গে কিছু দিয়ে দিয়েছেন। তারি সদ্ব্যবহার একলা ক'রে উঠতে পার্‌ব না।"

"সে জন্য চিন্তা কি? ভাগাভাগি ক'রে সদ্ব্যবহার করা যাবে'খন। পথি নারী বিবর্জ্জিতা হ'লেও তত ক্ষেতি নেই, কিন্তু পথি লুচি-মোণ্ডা বিবর্জ্জিতা হ'লেই মুস্কিল।" একটু হাসিয়া আবার বলিলেন—"খাদির সঙ্গে চার বিবাদ আছে ব'লে ত' আমার জানা ছিল না, সুব্রতবাবু!"

"আজ্ঞে, তাত' নেই-ই—বরং একটু বেশী মাখামাখি ভাব আছে ব'লেই মনে হয়। যাঁদের দেশসেবা ক'রে বেড়াতে হয়, তাঁদের আত্ম-সেবার ফুরসুৎ তেমন ঘ'টে ওঠে না। পেটের ক্ষিদে অনেক সময় এক পেয়ালা চায়েই পুষিয়ে নিতে হয়।"

"শুধু তাই নয়—খাটুনির পর যে একটা অবসাদ আসে, তাতে একটা সস্তা এক্‌সাইট্‌মেণ্ট চায়ের পেয়ালায় যত সহজে পাওয়া যায়, অন্য কিছুতে বোধ হয় যায় না।"

"তাই হবে। আমি কিন্তু চায়ের পেয়ালার কাছে একেবারে অপরিচিত নই। আগে খুবই খেতুম। আজকাল আর খাইনে। আমি খদ্দর পরি, কিন্তু দেশের কাজ ক'রে বেড়ানর সৌভাগ্য ও আত্ম-প্রসাদ এখনও আমার হয়নি। কাজেই তার দরুণ অবসাদও আমার ভাগ্যে হয়নি। আগে যে খেতুম—তা অনেকটা অভ্যেসেরই তাগিদে। এখন না খেয়েও কোন অসুবিধে ঠেকে না।"

"প্রথম প্রথম নিশ্চয়ই ঠেক্‌ত।—নয় কি? আমি কালেজে পড়ার

সময় চা খেতুম না। নাগপুরে প্র্যাক্‌টিস্‌ করার সময় বার-লাইব্রেরীতে প্রথম খেতে আরম্ভ করি। কাজের তাড়ার ভেতর খেয়ে একটু আরামও পাওয়া যেত বৈকি! তারপর, অভ্যেসের গুণেই বলুন, আর সত্যি-কার একটা আরামের লোভেই বলুন, চা-টা এখন না-হ'লে-নয় একটা কিছু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তা হ'লেও, এটা ভাববেন না যে, চার পেয়ালার এই উষ্ণ বাষ্পের ফ্লেবরটা এমন একটা জিনিষ, যার জন্যে ওকালতি করার ব্রিফ্‌ নিতে আমি প্রস্তুত আছি। এই এখন ফ্ল্যাস্ক উঠেছে, যাতে ক'রে গরম তৈরী চা নিয়ে যাওয়া চলে। পেয়ালায় ঢেলে খেলেই হ'ল। নৈলে—গাড়ী বড় কোন একটা ষ্টেশনে থাম্‌লে 'এই চা—এই চা' ক'রে চায়ের চেষ্টায় তখন বিব্রত হ'তে হ'ত।"

সুব্রত দেখিল—সে জানলার দিকে ফিরিয়া চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিতেছে। জানি না, তাঁদের এই প্রথম আলাপের ভেতর আগন্তুক চা-চর্চ্চায় যে শেষ মন্তব্য বাহির হইল, তাতে সে কাণ দিয়াছিল কি না। সুব্রতর কাছে যে টিফিন্‌ক্যারিয়ার ছিল, আর তাদের যেটা ছিল, সে দুটো আর আলাদা রহিল না। ভাগাভাগির ব্যবস্থা হইল। অনাবশ্যক সঙ্কোচ কোনই বাধা দিল না। মৃত্যুঞ্জয়বাবু সামান্য কিছু খাইয়াই সে রাত্তিরের খাওয়া শেষ করিলেন।

গাড়ী সাট্‌না ষ্টেশনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয়বাবু প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে নামিয়া পড়িলেন এবং এদিক্‌ ওদিক্‌ পায়চারী করিতে করিতে লাগিলেন। সুব্রতর তখন খাওয়া শেষ হইয়াছে। এক গ্লাস জলের তার দরকার। সঙ্গে জলের কুঁজো ছিল না। সুচরিতাদের অবশ্য জলের কুঁজো ছিল। কিন্তু তখন তারা "একলা" দুজনে। মুখ ফুটিয়া এক গ্লাস জল চাইতে তার কেমনধারা লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল। একবার এও মনে হইল, গাড়ী হইতে নামিয়া জলের চেষ্টা দেখিবে কিনা। জানলা

দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল, কোনখানে জলের কল-টল আছে কিনা। দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া দেখে—সুচরিতা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার এক কাচের গ্লাসে জল লইয়া তার দিকে অগ্রসর হইতেছে। কবিরা মরাল-গমনার কথা বলিয়াছেন। আমরা উপমাকে লজ্জা দেব না। আর, মরালটরাল সর্ব্বজীবৈকমাত্র-গতি রেস্তরাকার ছাড়া আর কোথাও ওঠ্‌বার টিকিট পাবে? যাক্—উজ্জ্বল মধুর স্নিগ্ধ দৃষ্টি তার ঈষৎ আনত। সঙ্কোচে? অনিন্দ্যসুন্দর সৌম্য মুখখানি তার ঈষৎ রাঙা। লজ্জায়? এই ভদ্রতাটুকুর ভেতর দিয়াই যে তারা পরস্পরের পানে প্রথম অভিমুখীন হইতেছে! এযাত্রায় প্রথম পদক্ষেপটি কত মৃদু, কত সামান্য, কত না সঙ্কোচ-ভরা, কত ব্রীড়া-বিজড়িত; অথচ তার মৃদু চিহ্নটি কত বড় রহস্যগর্ভ, বেদনাগর্ভ আসন্ন ভবিতব্যতার একটা অগ্রগামী ইঙ্গিত!

সুব্রত অবশ্য দাঁড়াইয়া জলের গ্লাস হাতে লইয়াছিল। তারও দৃষ্টির পূর্ণ উন্মেষ তখন সম্ভব হয় নাই। হাতখানা, হয়ত' তার অজ্ঞাতসারেই, একটুখানি কাঁপিয়াছিল কি? তার চাইতে আর বেশী ভেতরকার তথ্য লইতে চেষ্টা আমরা করিব না।

"আপনি কষ্ট ক'রে"—ভাষা নিজের পঙ্গুতায় নিজেই আশ্চর্য্য হ'য়ে থম্‌কে দাঁড়াল।

"না—এ আর কষ্ট কি?"—সেই দূরাগত বীণার তার এবার তার কাণের—বোধ হয় প্রাণেরও—খুব নিকটে একটা মধুর ঝঙ্কারের রেশটুকু পৌছাইয়া দিয়া গেল।

"আর এক গ্লাস জল দেব?"

"না, কুঁজোয় জল থাক্‌ল ত'? কুঁজোটা আমায় দিন্, আমি দেখি যদি ভাল জল পাই ওয়েটিংরুমে।"

"কুঁজোয় এখনও যা জল আছে, তাতেই চল্‌বে।"—এই বলিয়া সুচরিতা দরজার ধারে গিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিতে লাগিল তার বাবা প্ল্যাট্‌ফর্ম্মের কোন্ ধারে, কত দূরে।

"কাট্‌নিতেও দেখিছি উনি গাড়ী ছাড়বার সময় এসে উঠ্‌লেন। এখানেও দেখ্‌ছি নেমে প্ল্যাট্‌ফর্ম্মে বেড়াতে গেলেন।"

"হাঁ, ওটা বাবার একটা অভ্যেস। গাড়ী থাম্‌লে গাড়ীতে চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌তে পারেন না। ইন্‌সম্‌নিয়ার দরুণ বেশীক্ষণ ধ'রে ঘরে বা গাড়ীতে ব'সে থাক্‌তে উনি কেমন ধারা অস্বস্তি বোধ করেন।"

গার্ড সবুজ বাতি দেখাইল। গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে তখন মৃত্যুঞ্জয়কে এসে কামরায় উঠ্‌লেন।

"বাবা, অমন ধারা শেষ মুহূর্ত্তে, একেবারে শিরে সংক্রান্তি ক'রে, আর তুমি গাড়ীতে উঠো না। আমার কেমন ভয় ভয় করে—পাছে পা স্লিপ্ করে তোমার।"

মৃত্যুঞ্জয়বাবু বিশেষ কিছু বলিলেন না। কিন্তু ভাগ্যদেবতার মুখের কোণে নিষ্ঠুর একটা হাসি বোধ হয় ফুটিয়া উঠিয়াছিল।



তৃতীয়

মানিকপুর ষ্টেশন। রাত্রি তখন ন'টা হবে। বোম্বেমেল দশমিনিট দাঁড়ায়। কিন্তু ছাড়িতে তার আরও দশ মিনিট বিলম্ব হইল। দশ মিনিট লেট করিয়া গাড়ী যখন আস্তে আস্তে প্ল্যাট্‌ফরম ছাড়িয়া চলিয়া গেল, তখন তার একখানা সেকেণ্ড ক্ল্যাশ কম্‌পার্টমেণ্ট খালি হইয়া গিয়াছে। কলিশনও হয় নাই, অথবা গাড়ী ডিরেলও হয় নাই। কিন্তু তার একটা কামরায় একটা আকস্মিক ধাক্কায় কি যেন বিধ্বস্তপ্রায় হইয়া গিয়াছিল; আর, গন্তব্যপথে কাদের অগ্রগতি একটা অতি নিষ্ঠুর বাধায় প্রতিরুদ্ধ হইয়াছিল।

সুব্রতরা যে কামরায় ছিল, সে কামরা অবশ্য ডিরেল হয় নাই, অথবা তার চাকাতে আগুনও লাগে নাই যে সেটাকে কাটিয়া সাইডিংএ রাখিয়া যাবার দরকার হইয়াছিল। তা নয়, কিন্তু সে কামরায় যাত্রী তিনজন তাদের পথযাত্রায় "ডিরেল" হইয়া মানিকপুরের "সাইডিং"এ পড়িয়া থাকিল।

দুর্ঘটনা বড় কম ঘটে নাই। মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁর অভ্যাস মত মানিক-পুরের প্ল্যাট্‌ফর্ম্মেও পায়চারি করিতে নামিয়াছিলেন। সুচরিতার সেই সাবধান-বাণী তিনি অবশ্য কাণে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে মনে রাখেন নাই। গার্ড যখন গাড়ী ছাড়ার সিগ্‌নল দেখাইয়াছিল, তখন তিনি কতকটা আন্‌মনাই ছিলেন। কামরার তত কাছেও ছিলেন না। গাড়ী যখন একটুখানি বেগ দিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন তিনি আসিয়া পাদানে পা দিলেন। কিন্তু পা স্লিপ্‌ করিল। সুচরিতা অবশ্য সেবারেও গাড়ী দরজায় দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু তার

পক্ষে এখন কিছু করা সম্ভব হইল না, যাতে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পতন রোধ হইতে পারে। সুব্রতও তখন, কতকটা বিষণ্ণভাবেই, ম্যাগাজিনের পাতা উল্টাইতেছিল। হঠাৎ একটা অনুচ্চ কিন্তু তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে তার চমক ভাঙ্গিল।

"বাবা প'ড়ে গেছেন"—ঝঞ্ঝাতাড়িত লতাটির মত সে কাঁপিতেছিল। সেই মুহূর্ত্তেই যে তার আশ্রয়তরুটি ভূমে গড়াইয়া পড়িয়াছে!

সুব্রত তাড়াতাড়ি চেন ধরিয়া টানিয়া গাড়ী থামাইল। গাড়ী তখন লম্বা প্ল্যাট্ফর্ম্মের প্রায় মুড়োয় গিয়া পড়িয়াছে। গাড়ী থামিতেই তারা ছুটিয়া গেল—যেখানে মৃত্যুঞ্জয় বাবু প্ল্যাট্ফর্ম্মে পড়িয়াছিলেন। গাড়ীর ফাঁকে পড়িয়া নিষ্পেষিত হইয়া যান নাই, এটা বড় ভাগ্য। পাথরে মোড়া প্ল্যাট্ফর্ম্মের ওপর পড়িয়া যাওয়াতে তাঁর আঘাত কিন্তু কম গুরুতর হয় নাই। মাথা থেকে রক্ত পড়িতেছিল—সম্ভবতঃ ফাটিয়া গিয়াছে। সংজ্ঞাহীন। সুচরিতা বাবার রক্তাক্ত মাথাটা কোলে তুলিয়া লইয়া নির্ব্বাক্, নিঃস্পন্দ একটা খোদিত শিলাপ্রতিমার মত বসিয়া রহিল। তার রাঙা সাড়ীর আঁচল ভাঁজ করিয়া সে উষ্ণ রক্তের ধারা চাপিয়া রাখিল।

গার্ড, ষ্টেশন মাষ্টার, পুলিশ কর্ম্মচারী, আরও অনেকে সেখানে আসিয়া জমিল। মানিকপুর জংশন ষ্টেশন, সেখানে রেলওয়ে ডাক্তার আছে। খবর পাইয়া ডাক্তারটিও আসিয়া পড়িলেন। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন মাথার স্কাল্ ফ্রাক্চার হইয়াছে, তবে তত বেশী নয়। একটা পাথরের কুচি মাথায় একটা গভীর ক্ষত করিয়াছে। অবস্থা সম্ভবতঃ মারাত্মক না হইলেও নিশ্চয়ই গুরুতর। বিশেষ, রক্তস্রাব বড় বেশী হইয়াছে। আহত ব্যক্তি প্রবীণ, তেমন সুস্থ সবলও নন। সেই ট্রেণেই কলিকাতা পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ায় বিশেষ আশঙ্কা আছে, ডাক্তার

বলিলেন। প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা মানিকপুরেই হইতে পারে। নিকটে ডাকবাংলোয় তাঁরা থাকিতে পারেন। তেমন কোন অসুবিধা হবে না।

অগত্যা সেই ব্যবস্থাই হইল। এই ঘটনায় মেল্ লেটের ওপর আরও দশ মিনিট লেট করিয়া ছাড়িল। ষ্টেশনমাষ্টার, পুলিশ-কর্ম্মচারী, ডাক্তার এঁরা তিনজনেই হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক। আর, সত্যই—ভদ্রলোক বটে। সকলেই সাধ্যমত সাহায্য করিলেন। কুলিরা ঠেলাগাড়ীতে চাপাইয়া জিনিষপত্র ডাকবাংলোয় লইয়া গেল। একটা ক্যাম্প খাটে শোয়াইয়া বাবার সংজ্ঞাহীন রক্তাক্ত দেহ যখন নিরালা, নিঝুম মাঠের ভিতর দিয়া ডাক বাংলোয় লইয়া যাওয়া লইতে-ছিল, তখন সুচরিতার ইচ্ছা হইতেছিল সেই পুণ্য প্রগাঢ় স্নেহরাশির সংজ্ঞাহীন ভার সে নিজেই একলা বহন করিয়া লইয়া যায়। নারী হৃদ-য়ের তলে তলে মাতৃত্বের একটা যে চিরন্তন ফল্গুধারা বহমান, সেই গোপনধারা আজ এই আহত, অসহায় "শিশু"টির উদ্দেশে সম্মিলিত বেদনা, করুণা ও সোহাগের শতধারায় যেন ফাটিয়া বাহির হইতেছিল। সে যেন বুঝি তার বাবাকে আজ আপনার কোলে করিয়াই লইয়া যাইতে চায়—তা হ'ক না দূরে—বহুদূরে তাদের সেই অজানা দেশের আশ্রয় কুটীরটি, হ'ক না দীর্ঘ, হ'ক না বন্ধুর তাদের নিরালা অচেনা চলার পথটি।

সুব্রত অবশ্য ক্যাম্পখাটের এক মুড়ো ধরিয়াই চলিয়াছিল। যতটা ধীরে, যতটা সাবধানতার সঙ্গে আহতকে লইয়া যাওয়া দরকার, কুলিদের হাতে ছাড়িয়া দিলে ততটা হয়ত সম্ভব হইত না। ষ্টেশন থেকে ফাঁকা মাঠে আসিয়া পড়িলে, যখন একটা যূথভ্রষ্ট ঝাউগাছের সাড়া, অশরীরী প্রেতের উদাস দীর্ঘশ্বাসের মতন, নিঝুম পথের স্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া দিতেছিল,

তখন সুব্রতর মনে হইয়াছিল—ঝাউ গাছটা বুঝি-বা এক অজানা পুরীর প্রহরীরূপে তাদের পথিপ্রান্তে দাঁড়াইয়া আছে—একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের সাড়া দিয়া সে আগন্তুককে তার ছাড়পত্র দেখাইতে বলিতেছে ; আর, বোধ হয়, আগন্তুককেও একটা গভীর দীর্ঘশ্বাসের ছাড়পত্র দেখাইয়াই সে পুরীতে প্রবেশ করিতে হইবে। হঠাৎ এ চিন্তা তার আসিল কেন, তা' সে জানে না। জীবনের যেটা ভবিতব্যতা, সেটা অতর্কিত পদ-ক্ষেপে আমাদের পিঠের কাছে আসিয়া পড়িলে, তার নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিকট সাড়া পাইয়া কি আমরা এই রকমধারা চম্‌কাইয়া উঠি! কে জানে ?

ঝাউগাছটার শন্‌ শন্‌ শব্দে তাদের দু'টি হৃদয়েরই ব্যথা ও আশঙ্কা বোধ হয় নিজের অনুরণন শুনিতে পাইতেছিল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় সুব্রতর অন্তরটাও কম ব্যথাকাতর হয় নাই। তার সমগ্র অন্তরাত্মা ছাপাইয়া একটা প্রগাঢ় মমতা ও দরদ যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছিল। আহত, সংজ্ঞাহীন পিতার ষ্ট্রেচারের পাশে পাশে, সেই নিরালা অচিন পথে, অজানা আশ্রয়-উদ্দেশে, অপরিচিত বা অল্পপরিচিত সঙ্গীদের সাথে, সেই লক্ষ্মীমন্তের ঘরের শিক্ষিতা অসহায়া তরুণীর, মৌনব্যথার ভারে দুঃসহপীড়িত পথযাত্রা, সত্যই তার অন্তরের সব চাইতে দরদী, সব চাইতে করুণ তারগুলোতে আঘাত করিতেছিল!

চলিতে চলিতে একটিবার—মাত্র একটিবার—তার মুখের দিকে সে চোখ তুলিয়া চাহিয়াছিল। অন্তর যেখানে তার দরদের পলকহীন চোখ মেলিয়া চাহিয়া রহিয়াছে, সেখানে বাইরের চোখ তুলিয়া না দেখিলেও বুঝি চলে। ঝাউগাছটার শন্‌ শন্‌ শব্দ যখন খুব স্পষ্ট হইয়া প্রথম কাণে আসিয়াছিল, সেই ফাঁকেই বোধ হয় সুচরিতার বুক থেকেও একটা স্ফুট দীর্ঘশ্বাস, ব্যথার যত গাঢ়তা, দুশ্চিন্তার যত জমাট, সব

ঠেলিয়া একটুখানি বাহির হইয়া পড়িয়াছিল ; সুব্রতর কাণে সেটা এড়ায় নাই ; সে তখন একটি বার তার মুখের দিকে চাহিয়াছিল। কিন্তু চাহিয়াই বুঝিয়াছিল—সেখানে এত বড় একটা ব্যথা তার গৌরবের কণ্টক-মুকুট পরিয়া আসীন যে, মুখের কৃপণ পঙ্গু সান্ত্বনা-বাণী তার উদ্দেশে সরিতেই সাহস পায় না—আপন কুণ্ঠায়, আপন তুচ্ছতায় ও দীনতায় সে মুখেই মিলাইয়া যাইতে চায়।

ডাক বাংলোটি বেশ। ষ্টেশন থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে মাঠের মধ্যে এক নিরিবিলি যায়গায়। ঝাউগাছ সেই একটাই। তার দোসর ছিল না। পঙ্গু সে, খুঁজে-পেতে জুটি মেলাবে কেমন ক'রে? তাই বুঝি তার নিঃসঙ্গতার সদাই আপশোষ শাঁ শাঁ করিয়া ফুকরিয়া যাইত! অন্ধকারে ঠিক বোঝা যাইতেছিল না—বোধ হয় গোটাকতক শাল বা সেগুনের গাছও ঠাঁই ঠাঁই দাঁড়াইয়াছিল। অলস হাওয়া একটা নরম মিষ্টি গন্ধ, আর, কোন্ দূর পল্লীবাট হইতে ছট্‌কে আসা একটা বাঁশীর আওয়াজ—এই দু'টোর হাল্‌কা বোঝা বহিয়াই শ্লথচরণ মন্থরগতি হইয়াছিল। আকাশে সেদিন মেঘ ছিল না। তারার আলোতেই দেখা যাইতেছিল—ক'টা বড় বড় কালো পাথর ময়দানে এদিক্ ওদিক্ পড়িয়া আছে। কোন্ দূর অতীত যুগে কোন্ তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে তুষার নদীর বুকে ভাসিয়া আসিয়াছিল শিলা, কি প্রেরণায় আকুল হইয়া, কি আশায় উদ্‌গ্রীব হইয়া, তা' কে বলিবে? তারপর, হঠাৎ একদিন সে নদী শুকাইয়া গেল ; তারা এক নীরস ঊষর তেপান্তরের মাঠে বান্‌চাল হইয়া হতভম্ব, অসহায় পড়িয়া আছে যুগ যুগ ধরিয়া! পূবে এক সা'র পাহাড় যেন বিজয়-অভিযানে বেরিয়েছিল। হঠাৎ মাঠের মধ্যে থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেছে! সম্মুখে একটা ব্যূহরচনাও ক'রেছে দেখ্‌ছি। পশ্চিম থেকে কেউ তাদেয় আক্রমণ করবে নাকি! কৈ—

ওদিকে কেউ ত' নেই। শুধু একটা অমুচ্চ পাহাড়—মনে হচ্ছে যেন কোন্ অসহায়া পর্ব্বতকুমারী ঘাড়টি তার নীচু ক'রে বুক দিয়ে চেপে রেখেছে তার বুকের গোপন মাণিকটিকে দস্যুদের লুব্ধ দৃষ্টির আড়ালে! তাই দেখে কি পূবের পাহাড়ের অত বড় অক্ষৌহিণীটি থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল!

ডাকবাংলোটার কম্পাউণ্ডে একটা ফুলবাগিচা করিয়া রাখার অসম্পূর্ণ, শৃঙ্খলা-সৌষ্ঠবহীন চেষ্টা বোধ হয় হইয়া থাকিবে। শৃঙ্খলা-সৌষ্ঠব না থাকুক্, অযত্নরক্ষিত দু'চারিটা ফুলের গাছ কিন্তু সেই রাতে তাদের মিষ্টি গন্ধটুকু বিলাইতে কসুর করিতেছিল না। কম্পাউণ্ডের একপ্রান্তে একটা আউট্ হাউসে এক মালী-দম্পতি দস্তুরমত তাদের খট্টমলাকুলিত খাটিয়া, ঝক্‌ঝ'কে রগ্‌র'গে চৌকা বর্ত্তন, ঘড়ি ঘড়ি সধূম, সাগ্নিক, শব্দায়মান হুঁকা কলিকা, বর্ষ-সঞ্চিত-ক্লেদ-মলিন বাস, খৈনিনিষ্ঠীবনে পিচ্ছিল গৃহাঙ্গন, বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয় দাম্পত্য কলহ, আর ঢোলকের একঘে'য়ে খচমিচির সঙ্গে যখন তখন কৃত্রিম-বাহ্য-প্রয়োগ-বিশেষ-অভিনন্দিত সিদ্ধকণ্ঠের "রামা হো"—গিটকিরি—এই সব অনুষ্ঠান লইয়া বাস করিত। তাতে অঙ্গহানি ছিল না। ভাঙের নেশাটা যেদিন বেশী হইত, অথবা ছোট কলিকায় বড় তামাক যেদিন মুহুর্মুহুঃ অধিষ্ঠান হইতেন, সেদিন মালিনীর অঙ্গহানি না হইলেও অঙ্গবৈকল্য হয়ত হইত; কিন্তু সেটাও ছিল এ অনুষ্ঠানেরই একটা আবশ্যক অঙ্গ। মালী-মিথুন বাগিচার তদারক কতদূর কি করিত, তার সমাচার রাখিয়া কাজ নাই। তবে মধ্যে মধ্যে সাহেব সুবার আবির্ভাব হইত বলিয়া, খোদ ডাকবাংলোটি, তার সাম্‌নের লাল সুর্‌কির পথটা, আর বারান্দার সম্মুখে গোটাকতক ফুলের ও পাতাবাহারের গাছ, অন্ততঃ এগুলো তেমন উপেক্ষিত হইতে পারিত না। উপেক্ষিত হইলে তলবের তঙ্খা কর্ত্তনের

ভয় ছিল। সে ভোজপুরীর দেশে প্লীহা অবশ্য তত সহজে ফাটে না।

আমরা সুচরিতাদের এই দুঃসময়েও এই সরেস টাট্‌কা "সন্দেশ" কয়টা সংগ্রহ করিয়া লইলাম। বেয়াদবি হইল নাত'?

পুলিশ কর্ম্মচারীটি আগে আসিয়া মালীকে ডাকিয়া ডাকবাংলোর হলঘরটা খোলাইলেন। বড় বড় জানালাগুলো খুলিয়া দেওয়া হইল। বেশ বড়, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটি। বড় একখানা খাট ছিল। অন্য আস্‌বাবের মধ্যে দু'একখানা বেতের ইজিচেয়ারও ছিল। খাটের ওপর বিছানা পাতিয়া অতি সন্তর্পণে মৃত্যুঞ্জয় বাবুকে শোয়ান হইল। পুলিশ কর্ম্মচারীটি মালীদের বলিয়া গেলেন—"রাঙ্গালোগদের" সকল হুকুম তামিল করিতে। পুলিশপ্রভুর এই প্রচারিত আজ্ঞা মালীদম্পতির প্রচ্ছন্ন বক্‌শিশ্‌-প্রত্যাশাবহ্নিতে অবশ্য জল ঢালিয়া দেয় নাই। ডাক্তার তাঁর কম্পাউণ্ডার আর ঔষধপত্র সঙ্গে যতক্ষণ না ফিরিলেন, ততক্ষণ পুলিশ কর্ম্মচারীটি—সম্ভবতঃ জমাদার হবেন—সেইখানেই অপেক্ষা করিলেন।

তারপর, ডাক্তার আসিয়া দেখিয়া শুনিয়া যখন বলিলেন, "কোন ভয় নাই"—তখন জনাবদের আনত একটা সেলাম জানাইয়া, এবং আবশ্যক হইলেই তিনি "হুজুরে হাজির" হইবেন, এই আশ্বাস দিয়া, জমাদার সাহেব চলিয়া গেলেন। সুব্রত, সুচরিতা ও তার হইয়া, তাঁকে অন্তরের ধন্যবাদ জানাইতে ভুলে নাই।

কম্পাউণ্ডারের সাহায্যে ডাক্তার ভাল করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন। একটা ইন্‌জেক্‌শনও হইল। বুক ও নাড়ী পরীক্ষা করিয়া তিনি যে মত প্রকাশ করিলেন, তাতে সুব্রত ও সুচরিতা, সম্পূর্ণ না হ'ক অনেকটা, আশ্বস্ত হইল। সুচরিতা শয্যাপার্শ্বে বসিয়া দেখিল—

পিতা সংজ্ঞাহারা হইলেও বেশ স্বাভাবিক ভাবেই নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলি-তেছেন; গায়ের উত্তাপও স্বাভাবিক; মুখে দুর্ব্বলতার চিহ্ন স্পষ্ট বটে, কিন্তু যন্ত্রণার রেখামাত্র নেই; প্রগাঢ় অবসাদের ভয়াল ছায়াটাও তাতে ছিল না। যেন ঘুমাইতেছেন, একটু পরেই ঘুম ভাঙ্গিবে। দু'একটা বলকারক ঔষধ রাখিয়া ডাক্তার তাঁর কম্পাউণ্ডারটিকে লইয়া বিদায় নেবার উপক্রম করিলেন। "আশঙ্কার কোন কারণ নেই—তবে রাত্তিরে একজন জেগে নজর রাখার দরকার হবে। যখন জ্ঞান হবে, তখন—তার আগে নয়—রোগীকে একটা দাওয়াই দিতে হবে। কিছু পথ্যও। আর লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে জ্বর টর হয় কিনা। দরকার হলে মালীকে দিয়ে খবর দেওয়া মাত্র তিনি চ'লে আস্‌বেন। কোনও ভয় নেই।"—এই বলিয়া ডাক্তার বাহির হইলেন। কলিকাতায় সেই রাত্রিতেই টেলিগ্রাম করার কোনই "জরুরৎ" নেই, বলিলেন। সকালে করিলেই চলিবে। সুব্রত সঙ্গে সঙ্গে বাইরে আসিয়া তাঁর পারিশ্রমিক দিতে উদ্যত হইলে, ডাক্তার করযোড়ে বলিলেন—"বাবুজী, মাপ কর্‌বেন। আমি রেলওয়ে ডাক্তার। রেলওয়ে প্যাসেন্‌জারদের দরকার হ'লে দেখা, এটাত আমার কর্ত্তব্য। এ ভিজিট আমি নেব না।" বিদেশ, বিভূঁয়ে, ভিন্নজাতীয়, ভিন্নভাষী লোকের ভেতরে এইরকম-ধারা শুধু শুষ্ক কর্ত্তব্যপরায়ণতার নয়, আন্তরিক দরদের সাড়া, সুব্রতর এবং বোধ হয় সুচরিতারও, সম্মুখে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল সেই চিরদরদী চিরন্তন মানবীয় সত্তাটি, যেটা দেশের, জাতির, ধর্ম্মের, অবস্থার, ব্যবস্থার সকল গণ্ডী স্বীকার করিয়া লইয়াও, তাদের মধ্যে একটা অখণ্ড, উদার, অকৃপণ আত্মীয়তার সংযোগ নিত্য বাহাল করিয়া রাখিয়াছে!

টেবিলের ওপর একটা টেবিলল্যাম্প জ্বলিতেছিল। খোলা জান্‌লা দিয়া ফুর্‌ফুরে বাতাস ঘরে আসিতেছিল। পথ-ভোলা, উদাসী আজ

বুঝি সে! কখনও দখিণে, কখনও পশ্চিমে, কখনও পূবে সে উৎসুক মন্থরপদে পথ খুঁজিতেছে। আকাশের তারা আলোকিত কক্ষ বাতায়নে উঁকি ঝুঁকি মারিতেও যেন লজ্জা পাইতেছিল। নিরালা রাতে মন্দির-বাতায়ন-দ্বারে মৃদু অভিসারে আসিয়া দাঁড়াইতেই সে যে অভ্যস্ত! সেই সঙ্গহীন ঝাউগাছটার চোখে ঘুম ছিল না; থেকে থেকে শাঁ শাঁ করিয়া সে ফুকরিয়া উঠিতেছিল! দূরের সেই পল্লীবাটে তখন নিশুতি রাত—মহুয়ার তলায় বসিয়া সাঁওতালী রাখাল বাঁশীতে তার কিশোর-যৌবনের ঘুম আর ভাঙ্গিতেছিল না! রাত তখন এগারটা হবে।

"আপনি রাত্তিরে আর কিছু খেলেন না?"—সুচরিতা জিজ্ঞাসা করিল।

"না, সেই গাড়ীতে যা খাওয়া হ'য়েছিল, তাই যথেষ্ট। আপনার কিন্তু খাওয়া হয়নি যে।"

"হ'য়েছিল"। সে রাত্রিতে তারা আর কিছু খাইল না। "অই ছোট খাট্‌টায় আপনার বিছানা ক'রে দি'? আপনি শুয়ে পড়ুন।"

"আর আপনি বুঝি এক্‌লাটি সারারাত ওঁর ধারে ব'সে থাক্‌বেন? তাই কি হয়?"

"না, তাতে আমার কষ্ট হবে না। আমার ঘুম কিছুতেই আস্‌বে না। আপনি বরং শুয়ে একটুখানি ঘুমোবার চেষ্টা দেখুন।"

কার্য্যতঃ, দুজনার কারুরই সে রাত্রিতে শুয়ে পড়া হইল না। সুচরিতা বাবার বিছানায় গিয়া বসিল। সুব্রত থার্ম্মোমিটার, দরকারী ওষুদপত্র সব যথাস্থানে রাখিয়া একটা ইজিচেয়ারে এলাইয়া পড়িল। একটা খোলা জান্‌লার ধারে ইজিচেয়ারখানা পাতা ছিল। টেবিল ল্যাম্প মৃদু করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। আর ল্যাম্পটা ছিল সুব্রতর

ইজিচেয়ারের পিছন দিকে। বাইরের নিরালা রাত বাতায়ন দ্বারে ঘেঁসিয়া আসিতে এবার ভরসা পাইয়াছিল—বোধ হয়, সে যেখানটায় বসিয়াছিল, সেখান পর্য্যন্তও ঢুকিয়া পড়িয়াছিল। আকাশের তারারও অভিসারিকা হবার পথে তখন কাঁটা দেওয়া ছিল না। সুব্রত কিন্তু সেই মলিনা রাত্রির স্তব্ধতার মাঝে জাগিয়া ভাবিতেছিল আর এক কথা—এক অপরিচিত স্থানে, এক বিজন নিশীথ কক্ষে, আহত সংজ্ঞা-হারা পিতার শয্যাপার্শ্বে ঐ তরুণী, এক আকস্মিক বিপদের মধ্য দিয়া তার জীবনের কতখানি কাছে আগাইয়া আসিয়াছে! রেল গাড়ীতে আচম্বিতে যাদেব সঙ্গে দেখা, একটা নির্ম্মম, নিষ্ঠুর ঘটনার নিগড়ে কত না দৃঢ়, কত না অচ্ছেদ্য বন্ধনে সে তাদের সঙ্গে বাঁধা পড়িয়া গেল! আর, সে নিগড় তার পক্ষে শুধুই কি নির্ম্মম,নিষ্ঠুর? তার অন্তরাত্মা মাথা নাড়িয়া বলিতে-ছিল—"ও গো না! এই নিগড়টার যে আকস্মিক নিবিড় বন্ধন, সেইটেই যে আমার চির-আকাঙ্ক্ষিত নিবিড়তম, মধুরতম, প্রিয়তম মিলনের স্বপ্ন।"

সে রাত্তিরে আর তাদের কথাবার্ত্তা হয় নাই। একটিবারমাত্র সুব্রত ফিরিয়া দেখিয়াছিল—আহতের শর্য্যাপার্শ্বে সেই কনকপ্রতিমা-পানে। কতখানি স্নেহাপ্লুত দৃষ্টি মেলিয়া সে চাহিয়া আছে পিতার মুখের দিকে! ব্যথা ও আশঙ্কার গাঢ়তা তার মুখখানায়—তখন অনেকটা পাত্‌লা হইয়া গিয়াছিল—তাতে ফুটিয়াছিল একটা সুস্থির, নিয়ত-সজাগ মমতার মৌন-সমাধি।

সে সমাধি-ঘোরের মধ্যেও সুচরিতা না ভাবিয়া থাকিতে পারিয়া-ছিল কি—এই দুর্দ্দিনে, একান্ত অসহায়তার ভেতরে, তাদের অই ধীর, দক্ষ, সুন্দর, তরুণ, সমব্যথী, অচেনা সঙ্গীটির কথা! সুচরিতার অবশ্য সহায়-সম্পদের অভাব ছিল না। কিন্তু আকস্মিক বিপদ্ সে সহায়-সম্প-

দের নাগালের কত বাহিরে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের আশ্রয়হস্তের কত ফারাকে, তাকে এই রাত্রিতে, অজানা দেশে, অচেনা আবাসে, এক অপরিচিতের নিভৃত সঙ্গের আবেষ্টনে আনিয়া ফেলিয়াছে! কিন্তু সে অপরিচিতের সঙ্গ আজ এই নিরালা দুর্দ্দিনে তার যে একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র ভরসা! তার অন্তরটাও ধীর লীলায়িত পদক্ষেপে, আহত পিতার শুশ্রূষামন্দিরে আজ তার একমাত্র সাথী, ঐ তরুণ পথ-সঙ্গীটির পানে আগাইয়া আসিতেছিল কি? আসিতেছিল। কিন্তু ঠিক কি ভাবে? শুধু কৃতজ্ঞতায় কি?

ভোরের আলো মুক্ত জানালা দিয়া চোখে পড়িতেই যেন মৃত্যুঞ্জয় বাবুর সংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। যেন ঘুমাইয়াই ছিলেন। রাত্রিতে নূতন কোন উপসর্গ দেখা দেয় নি। পা টিপিয়া কাছে আসিয়া সুব্রত দু'একবার টেম্পারেচার লইয়াছিল; নাড়ীটা টিপিয়া দেখিয়াছিল। নির্ব্বাক্ দৃষ্টিতেই সুচরিতাকে বুঝিতে দিয়াছিল অবস্থা ভাল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু চোখ মেলিয়া চাহিতেই কন্যার চোখদু'টির সজাগ, উৎসুক চাহনিটাই প্রথম দেখিলেন। তাতে তন্দ্রালসতার লেশটুকুও ছিল না। সারারাত্রি ধরিয়া যে স্নিগ্ধ কল্যাণধারা সে চাহনির মধ্য দিয়া তাঁর আহত অঙ্গে একটা অমৃতের প্রলেপ লেপিয়া দিয়াছিল, সেটাকে তিনি প্রথমদৃষ্টিতেই বুঝিলেন। তাঁর বুক ফুলিয়া উঠিল। মৃদু আর্দ্র-স্বরে ডাকিলেন—

"মা আমার!"

"কেন বাবা?"—উচ্ছলিতস্বরে এইমাত্র বলিয়া সুচরিতা তার বাবার বুকের ওপর আস্তে আস্তে মাথাটি রাখিল। সারারাত্রি যে বাঁধ সে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, এইবার সে বাঁধ বুঝি ভাঙ্গিল। কেমন যেন ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে চাহিল সে। কিন্তু চোখের কোণে দু'-

এক ফোঁটা জল গড়াইতে না গড়াইতে সে উঠিয়া সোজা হইয়া বসিল। সুব্রতবাবু ঘরে রহিয়াছেন—ছিঃ তাঁর সাম্‌নে কি অমন করিয়া কাঁদা যায়! একটুখানি সলজ্জ আড় দৃষ্টিতে সুব্রত যে দিক্‌টায় বসিয়াছিল, সে দিকে তাকাইয়া আঁচলের প্রান্তে চোখ দু'টো মুছিয়া ফেলিল সে। এ তার ভারি অন্যায়! বাবার বুকের ওপর পড়িয়া সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদ্‌তে যাচ্ছিল! তাতে বাবার মনে নিশ্চয়ই একটা আঘাত লাগ্‌ত। তিনি হয়ত সান্ত্বনা করার জন্যে ব্যস্ত-সমস্ত হ'য়ে পড়তেন। তাতে নিশ্চয়ই তাঁর অসুখ বেড়ে যেত!

আঁচলে মুছিয়া ফেলার আগেই পূব গগনে কোন্ অমর পূজারীর অরুণ-আরতি তার আঁখিকোণে সেই দু'ফোঁটা জলে রক্ত আভা ফেলিয়া তাকে অভিনন্দিত, রক্তচন্দনচর্চ্চিত করিয়া দিয়াছিল। নিত্য শত শত শিশিরের কণায় তার পূজার অর্ঘ্যপাত্র ভরিয়া ওঠে। আজ এও এক নূতন অর্ঘ্য! আজিকার এ অর্ঘ্য সত্য সত্যই বুঝিবা তার দেবতার প্রাণের দুয়ারে সরাসরি গিয়া পৌঁছিবে!

মৃত্যুঞ্জয় বাবু সুচরিতার এ ভাবটাও বুঝিলেন। "আমিত' ভাল আছি মা, তুই আর কাঁদিস নে।"—তিনি বিছানার ওপর উঠিয়া বসিতে যেন উদ্যোগ করিলেন। সুব্রত এবার তাড়াতাড়ি কাছে আসিয়া বলিল —"এখন উঠ্‌তে চেষ্টা কর্‌বেন না, মৃত্যুঞ্জয়বাবু! শুয়েই থাকুন।" মৃত্যুঞ্জয়বাবু তখন সুব্রতর মুখের দিকে তাকাইলেন—তাঁর দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে প্রচুর স্নেহও মাখানো ছিল না কি?

"আপনাকে অসময়ের বন্ধুরূপে আমরা পেয়েছি। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি—তিনি আপনার মঙ্গল করুন।"—

সেই প্রভাতী মঙ্গলারতির মুহূর্ত্তে সুচরিতার অন্তরাত্মার প্রার্থনাটিও বোধ হয় পিতার এই প্রার্থনার সাথে নীরবে মিলিত

হইয়াছিল। ডাক্তারের ব্যবস্থা মত ঔষধ দেওয়া হইল। একটু পরে পথ্যও দেওয়া হইল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বেশ ভালই বোধ করিলেন। একবার সুব্রতকে বলিতে চেষ্টা করিলেন—"সুব্রতবাবু, বিভ্রাটে প'ড়ে আপনিও আট্‌কে পড়্‌লেন। আপনার কত অসুবিধে হ'চ্ছে। রাত্তিরে বোধ হয় ঘুমটুকুও হয় নি। নয় মা ?"—কন্যার দিকে চাহিতে, সে শুধু মাথাটি নাড়িয়া জানাইয়া দিল যে, সুব্রতবাবু সারারাত জেগেই ব'সেছিলেন। সুব্রত কিন্তু তার এই সব অসুবিধা কষ্টের কথায় অসহিষ্ণু হইয়া পড়িল। এ প্রসঙ্গ—অন্ততঃ তার সাম্‌নে—আর সে চালাইতে দিল না।

"না, সত্যিই বল্‌ছি, মৃত্যুঞ্জয়বাবু, আমার কোন দিক্ দিয়ে কোন রকম অসুবিধে হয় নি।"—তার স্বরে আন্তরিকতা, ভঙ্গীতে সহৃদয়তা ছিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বা তাঁর কন্যা এটাকে সৌজন্যের শিষ্টালাপ মাত্র ভাবিতে পারিলেন না। কথাক'টা বলিয়া সে যখন একবার বারান্দায় বাহির হইয়া গেল, তখন সুচরিতা লক্ষ্য করিয়াছিল কি—কথা ক'টা বল্‌তে তার গলা ঈষৎ কেঁপেছিল ! মৃত্যুঞ্জয়বাবু অবশ্য সেটা লক্ষ্য করেন নাই। কিন্তু নারীর দৃষ্টিতে অনেক কিছুই পাশাইয়া যায় না যে।

ডাক্তার একটু পরে আসিয়া দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আর কোনই চিন্তা নেই। তিন চার দিনের মধ্যেই নিরাপদে কলিকাতা লইয়া যাওয়া যাবে। বিশ্রাম, বলকারক ঔষধ ও পথ্য—এ ছাড়া বিশেষ কিছু দরকার নেই। সুব্রত প্রাতঃকৃত্য সারিয়া আসিল। এর ভেতরেই ষ্টোভ জ্বালিয়া সুচরিতা খাবার তৈরি করিয়া ফেলিয়াছে। কাজের ফাঁকে বাবাকে রাত্রির ব্যাপারটা সব শোনাইয়াছে। তাদের পিতাপুত্রীর এই নিভৃত আলাপে সুব্রতর প্রশংসার ভাগটা বোধ হয় ঠিক ন্যায্যের চাইতে কিছু বেশীই হইয়াছিল।

"কল্‌কাতায় সুপ্রিয়র বাসায় এক টেলিগ্রাম ক'রে দাও। সে তার মাকে নিয়ে যেন চ'লে আসে। যেন বেশী ব্যস্ত হয় না তারা। যে ক'দিন এখানে থাক্‌তে হবে, তুমি এক্‌লাটি সব পেরে উঠ্‌বে কেন? নৈলে—টেলিগ্রাম না কর্‌লেও হানি ছিল না। ভাল কথা—সমরকেও একখানা টেলিগ্রাম ক'রে দাও। সেও যেন ওদের সঙ্গে চলে আসে। সে'ত এখন ছুটিতে আছে কল্‌কাতাতেই।"

সুচরিতা পিতার কথামত দু'খানা টেলিগ্রাম লিখিয়া রাখিল।

সুব্রত প্রাতঃকৃত্য সারিয়া জলযোগ করিল। সুচরিতার সংস্পর্শ সে অনুষ্ঠানটাকে অবশ্য একটু বেশী মাত্রায় হৃদ্য করিয়া দিয়াছিল। তার পর সে, টেলিগ্রাম দু'খানা লইয়া, ষ্টেশনের দিকে গেল। সেই ঝাউতলা দিয়া পথ। ঝাউ গাছটার তখন সাড়া শব্দ নেই, ফটকের ধারে ঠায় চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এক অজানা হাসিকান্নার সাতমহল পুরীতে তাদের প্রবেশ করিতে দিয়া, সে যেন এখন দিব্য নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ডাক্তার রান্নাবান্নার জন্য এক ভোজপুরী ঠাকুর পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু সুচরিতা ঘাড় নাড়িল। সে নিজেই রান্না করিবে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু উননের ধোঁয়ায় কিছুতেই ঘেঁষিতে দেবেন না—কাজেই ষ্টোভে। মালিনী ইন্দারা থেকে জল তুলিয়া দিল—আবশ্যক দু'একখানা বর্ত্তন আনিয়া দিল—"ভাজি" কুটিয়া দিল—মসলা পিষিয়া দিল। সে এক মন্দ কাণ্ডকারখানা নয়। বেথুনে সে আই, এস্‌-সি পড়িত। তার কেমিষ্ট্রির বিদ্যেটা কোন কাজেই সে লাগাইতে পারিল না। রন্ধনশালায় শুধু হাতেখড়ি কেন, হাতে খুন্তি বেড়ীও তার যে হয় নাই, এমন নয়। তার মা ও-বিদ্যেটাকে অনাদর করিতেন না। ও-বিদ্যেটাকে তিনি তাঁর বাড়ীর নীচের তলার "ভাড়াটে" করিয়া রাখেন নাই। তবে পাকশলায় সুচরিতাকে হাতে

কলমে এক্সপেরিমেণ্ট করিতে হইয়াছে ক্বচিৎ কদাচিৎ। ও-রকমধারা পোষাকী এক্সপেরিমেণ্ট অনেক সম্পন্ন গৃহস্থের ঘরে "ফেলিওরই" হইয়া থাকে। সুচরিতার একেবারে ততটা হয় নাই এই কারণে যে, তার মার ব্যবস্থা ছিল, সে যেদিন যা রাঁধিবে, তা শুধু সে বাড়ীর আর সকলে খাইবেন এমন নয়; তাকে নিজেও তা খাইতে হইবে। নিজেদের লড়াই করিতে হইলে রাজনীতিক-দাবা-খেলোয়াড়রা দেশে দেশে লড়াই কিছুতেই বাধাইতেন না। আর, নিজের রান্না নিজেই খাইতে হইবে, এমন নিয়ম বলবৎ থাকিলে, রান্নাকে আর কদ্দিন "অখাদ্য" করিয়া রাখা যায়? বাপ মা হয়ত' মেয়ের হাতের রান্না, তেমন সুখাদ্য না হইলেও, তার ভূয়সী ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু নিজের ভাবের ঘরে কেন, রসনার ঘরেও, বেশী দিন চুরি, চালবাজি চলে না। নিজের কর্ণকে নিজের কণ্ঠ সঙ্গীতের যতটা অধ্যবসায়শীল অহেতুক অনুরাগী থাকিতে দেখা গিয়াছে, নিজের রসনাকে নিজের হাতের রান্নায় ততটা অবিচলিত নিষ্কাম অনুরাগিণী থাকিতে দেখা যায় নাই। থাকিলে স্বপাক খাওয়া মানে "হাত পুড়িয়ে খাওয়া" তত সহজে হইয়া উঠিত না। তবে, বলা বাহুল্য, রান্নার অভ্যাস সুচরিতার বড় একটা ছিল না।

ষ্টোভের ওপর প্যানে করিয়া ডা'ল রাঁধিবার কালে কাঁচা তেলে লঙ্কা ফোড়ন দিয়া সুচরিতার যে নাকালটা হইল, তাতে সুব্রতরও গাম্ভীর্য্য রক্ষা করা দুঃসাধ্য হইয়াছিল বৈকি!

"কা'ল রাত্তিরে উপোস ক'রেছেন। আজকেও আপনার ভাগ্যে উপোস আছে কিন্তু"—সুচরিতা কাশিটা কোন মতে সামলাইয়া লইয়া হাসিতে হাসিতে বলিল।

"দেখা যাবে কার্য্যকালে ভাগ্য-পরীক্ষায় কি ফল হয়! আমিই সব খেয়ে ফেলে শেষ কালে আপনাকেই না উপোস করিয়ে রাখি!"

কার্য্যকালে দেখা গিয়াছিল, সুব্রতর সেদিনকার আহারের পরিমাণ ও তাতে তৃপ্তির মাত্রা একটুখানি অসামান্যই হইয়াছিল। আর, বলা বাহুল্য, সুচরিতাকেও উপোস করিতে হয় নাই। মৃত্যুঞ্জয় বাবুর পথ্য ছিল—দুধ আর ফলের রস।

আহার হইয়া গেলে, মৃত্যুঞ্জয় বাবু বিশেষ করিয়া বলিলেন তাদের দু'জনকে খানিক ঘুমিয়ে নিতে। অগত্যা তার বাপের খাটের এক পাশেই সুচরিতা শুইয়া পড়িল। আর, সুব্রতকেও ছোট খাট খানায় একবার গা গড়াইতে হইল! ঘুম তার পাচ্ছিল না। তবু একটুখানি তন্দ্রার ঘোরের মতন তার হইল। বেশীক্ষণ নয়। চোখ মেলিয়া দেখে—পিতা ও কন্যা বেশ শান্তভাবেই ঘুমাইতেছেন। তার আর শুইয়া পড়িয়া থাকিতে ইচ্ছা হইল না। উঠিয়া বাইরে গেল। তখন আকাশ মেঘ্‌লা হইয়া আছে। তবে বাদলের মাদলটা অবশ্য বাজিতে ছিল না। রোদ্দুরটা নাই এই পর্য্যন্ত। ভারি মিঠে একটা হাওয়া সেই ফাঁকা মাঠের দখিণ দিক্ থেকে উঠিয়াছিল। খানিকদূরে একটা বড় কালো পাথর পড়িয়াছিল, তার ওপর সে গিয়া বসিল। একটা কি গাছ তার মাথার ওপর ডালপালা মেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। কি গাছ সেটা? অর্জ্জুন নাকি? বাতাসে বৃন্তচ্যুত ফুলের বা ফলের কোঁড়া তার গায়ে আসিয়া পড়িতেছিল। ফটকের পাশে সেই ঝাউটা আবার হা-হা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। দূরে একটা উঁচু যায়গায় একটা ময়ূর বুঝি কেকারব করিয়া সেই রেবা ভূমির যত বিরহিণী পল্লীমালবিকাদের কাজল আঁখি সজল করিয়া দিতেছিল!

সুব্রত তার বুকের ভেতর কি যেন একটা অভিনব স্পন্দনের সুর শুনিতে পাইতেছিল বুঝি। দেশে বিদেশে অনেক কিছু সুন্দর, অনেক কিছু রমণীয় সে দেখিয়াছে—মানুষে, শিল্পে, প্রকৃতিতে—; কিন্তু ঠিক

এমনধারা স্পন্দন—অনির্ব্বচনীয় একটা ব্যথায় ও পুলকে লীলায়িত, তরঙ্গায়িত—তার অন্তরতম প্রদেশে সে আগে কখনও অনুভব করে নাইত'। তার জীবনের বীণায় সকল তারই সব পর্দাতেই এতদিন বাজিয়াছে। কিন্তু একটা সোণার তার বুঝিবা এতদিন গোপন ছিল। আজকে সেই তারটার বুঝি ঘুম ভাঙ্গিতেছে! কোন্ স্বপ্নপুরীর রাজকন্যার চম্পক অঙ্গুলির যাদু স্পর্শে?

বড় বড় ভাব—সাহিত্যে, সাধনায়, দেশ-প্রীতি, স্বজন-বান্ধব-প্রীতিতে—তার অপরিচিত ছিল না। বড় বড় ভাবগুলো লইয়াই সে বেশী মাতিয়া থাকিত। তার ঘরে লক্ষ্মী ছিল। বিদ্যা-অর্জ্জন এবং দেশ বিদেশের অভিজ্ঞতা-সঞ্চয় তার এই পঁচিশ ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে যা হইয়াছিল, তাতে যে কোন ভাগ্যবান্, সুকৃতী, মেধাবী পুরুষের গৌরব বোধ হইলে হইতে পারে। জীবনের নক্সাটাকে একটা অসাধারণ, মহান্ আদর্শের অনুপ্রাণনায় সে ছকিয়া যাইতেছিল। নক্সাটাকে সে যে তার আদর্শের অনেকটা কাছাকাছি লইয়া যাইতে পারিবে, সে পক্ষেও তার আশাকে কোনদিন কুণ্ঠিত, সাহসকে কোনদিন কৃপণ হইতে দেয় নাই। বিনয় আর সুষমা তার ভিতরে যে মহান্ জাগ্রত দেবতার আবাহনের মঙ্গলভৈরব শঙ্খধ্বনি শুনিতে পাইয়াছিল, সে দেবতার জ্যোতির্মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী ক্রম-পরিস্ফুট স্বরূপ মূর্ত্তিটি, তার নিজেরও ধ্যানদৃষ্টির গোচরে স্ফুট হইতে স্ফুটতর হইয়া আসিতেছিল। তার মতন আর দশ জনের যেমন, তেমনি, একটা একঘে'য়ে, নিতান্ত সাধারণ আটপৌরে জীবন যাপনের জন্য সে নিজেকে প্রস্তুত করিতেছিল না।

তার আদর্শের জন্য সন্ন্যাসীই তাকে হইতে হইবে, এমন ধারণা সে করিয়া রাখে নাই। মনের মতন জীবনসঙ্গিনীর কথাও যে মনে

তার না আসিত এমন নয়। কিন্তু এতদিন ভাবলোকে কোন্ সাত মহল মানসী পুরীর মাঝখানেই রত্নপালঙ্কে তার রাজকন্যা শুইয়াছিল! তার এতদিনকার নিত্য-ব্যবহারের জগতের অসমঞ্জস, অপ্রতিভ, অদরদী স্পর্শ যেন লোহার কাঠি ছোয়াইয়া তার মানসী রাণীরে মরার মতন করিয়া রাখিয়াছিল। তাকে জাগাইবার যে সোণার কাঠিটি, তার সন্ধান এতদিন সে পায় নাই। দেশ-বিদেশে কত তরুণী তার চোখে পড়িয়াছে। কতজনা তার কল্পপুরীর দুয়ারের গা ঘেঁসিয়া আসিয়াছে—ভিতরে ঢুকিয়া সেই গোপনে সোণার কাঠিটার তল্লাস করিবে ব'লে। কিন্তু কে যেন একটা বাউল, আজ্‌কের ঐ ঝাউ-গাছটারই মতন, তার পুরীর ফটকের দ্বারে হা-হা করিয়া তাদের সব ঠেকাইয়াছে,—কোন্ এক সুদূর নীহারিকা-লোকের শীলমোহরকরা ছাড়পত্র তাদের দেখাইতে বলিয়াছে। এই ধূলো ময়লার যে মরলোক, তার দেওয়া ছাড়পত্রেত' কুলাইবে না! সব্বাইকেই এতদিন দুয়ারের কাছ হইতেই ফিরিতে হইয়াছে। গোপন সোণারকাঠির তল্লাস করার মনের মানুষটি মেলে নাই।

কিন্তু আজ?—তার অন্তরতম দেশেরই একটা ব্যথা পুলকে ভরা রহস্য-স্পন্দন আজ তাকে বুঝিতে দিতেছে না কি যে, তার সাতমহল পুরীর অন্দরে যেই মানসী প্রতিমার ঘুম ভাঙ্গার সাড়া পড়িয়া গেল! কোন্ এক আন্‌মনা পথচলার মাঝে গোপনে, অলক্ষিতে সে তার সঙ্গ নিয়াছিল! কোন্ এক আকস্মিক ঘটনার ঝাপ্‌টা তাকে তার ঠিক পাশেই আনিয়া দিয়াছিল! কা'ল সেই নিঝুম, নিরালা রাতে তারা দু'টিতে যখন এক অজানা পুরীর দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তখন সেই চিরন্তন বাউল দ্বাররক্ষী, অপরিচিতার হাতের বিজয়পত্রখানা সসম্ভ্রমে স্বীকার করিয়া লইয়া রহস্য

পুরীর সকল মহলেরই দ্বার অনর্গল করিয়া দিয়াছিল! সেই অপরিচিতা পথের সঙ্গিনীটি কি সেই গোপন সোণার কাঠি খুঁজিয়া পাইল—তারই সম্মোহন স্পর্শে কি তার মানসী রাণীর ঘুম আজ ভাঙ্গিল?

"আপনি এখানে এসে ব'সে আছেন? আমরা ঘুম থেকে উঠে আপনাকে দেখ্‌তে পেলুম না। খুজছি। মোটেই ঘুমোন্নি বুঝি? বাঃ, ভারি সুন্দর এ যায়গাটা—ত! এটা কি গাছ? অজ্জু‌র্ন বুঝি? বুকের ব্যায়রামের অযুধ শুনেছি।"

সুব্রত ফিরিয়া দেখিয়াছিল—ভারি চমৎকার আকাশ-নীল সাড়ী একখানা তার পরণে। গলায় একগাছা সরু সোণার হার—আজ আর একান্ত অপ্রকাশ ছিল না সেটা। মেঘলা দিনের পাগলা হাওয়া তার এলানো চুলের রাশ নিয়ে বড্ড মাতামাতি করিতেছিল। ঐ দূর পাহাড়ের কোল থেকে কত মহুয়ামদিরশীকর সে মাখিয়া আগিয়াছে! মুখখানায়, নয়নের পাতায় কি জানি কি একটা মিষ্ট সরমের লেশটুকু লেগেছিল। অর্জ্জুনগাছের ছায়া, অর্জ্জুন গাছের হাওয়া সুব্রতর বুকের ভেতর সেই কাঁপুনিটাকে কমিয়ে দেয় নি নিশ্চয়।

"আপনি কখন এদিকে এসে পড়্‌লেন?"

"ধ্যানে ছিলেন বুঝি? জান্‌তে পারেন নি? আচ্ছা, মাঠের মধ্যে এই বড় বড় পাথরগুলো এলো কেমন ক'রে? আমারত' ভারি আশ্চর্য্য বোধ হয়।"

"হয়ত কোন্ দূর অতীত যুগে ভারতবর্ষের কটিদেশে এই বিন্ধ্য পর্ব্বত সত্য সত্যই একটা উত্তুঙ্গ তুষারমণ্ডিত পর্ব্বতশ্রেণীই ছিল। তার গায়ে তখন গ্লেসিয়ারও হ'ত। সময় সময় সে গ্লেসিয়ার গুলো পাথর টাথর যা পে'ত, তাই বুকে বেঁধে নিয়ে নেমে আস্‌ত। নীচে

এসে প'ড়ে গ'লে যেত'। আর বড় বড় পাথরগুলো এখানে সেখানে ঠাঁই ঠাঁই প'ড়ে রইত। দেখ্‌লে মনে হয়—একটা দৈত্য যেন পাহাড় ভেঙ্গে নিয়ে বড় বড় পাথরের চাঁই ছুঁড়ে খেলা ক'রেছে। আমি যে রকম বল্লুম, জিওলজিষ্টরা কেউ কেউ অনেকটা সেইরকমধারাই অনুমান্ ক'রেছেন।"

"গল্প শুনেছি বিন্ধ্যপর্ব্বত কোন্ সময় নাকি মাথা তুলে সূর্য্যের রথটা রোধ কর্‌তে চেয়েছিল।"

"গল্প বা মিথ্ সব সময়ে যে নির্জ্জলা গাঁজাখুরি বা আষাঢ়ে গল্প, তা, ভাব্‌বেন না। অনেক বড় বড় সত্যকথা ওসবের ভেতরে লুকানো র'য়েছে। অতীতের অনেক বাস্তব অভিজ্ঞতা, অনেক যথার্থ বিদ্যা।"

"ভাল কথা—চলুন ভেতরে। যা বল্‌তে এসেছিলুম—পিয়ন আপনার নামে এক টেলিগ্রাফিক্ মণিঅর্ডার এনে দাঁড়িয়ে আছে।"

হাতে টাকাকড়ি তখন বেশী ছিল না, তাই, সতু সেদিন সকালে বিনয়কে টেলিগ্রাম করিয়াছিল শ'খানেক টাকা পাঠিয়ে দিতে। সুষমার কাছে একখানা পত্রও সে দিয়াছিল—মাঝপথে সিপ্ রেক্ হ'য়ে ষ্ট্রান্‌ডেড হবার কথা জানিয়ে। সুষমার প্রতীক্ষিত, শিবের তরে তপস্যানিরতা গৌরী বোন্‌টির কোন নাম-গন্ধ অবশ্য তাতে ছিল না।

সেদিন সন্ধ্যার পর মৃত্যুঞ্জয়বাবু মেয়েকে বলিলেন—"আজ একটা গান গাওনা, চরিতা।" "তোমার শুন্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে বাবা? কিসের সঙ্গেইবা গান কর্‌ব? অর্গান নাই, এস্‌রাজটাও সঙ্গে নেই।" "তা হ'ক, এম্‌নি গাও। এম্‌নিই বুঝি কম মিষ্টি লাগে তোর গান?"

সুব্রত বারান্দায় একখানা ইজিচেয়ার পেতে বসিয়াছিল। টিপির টিপির বৃষ্টি পড়িতেছিল। কিন্তু কদমফোটা বনে বনে মাদল তখনও

বাজে নাই। পশ্চিমগগন-সীমান্তে কালো মেঘের একটুখানি ফাঁক তখনও রাঙা হইয়াছিল। সাঁঝের বেলা মেঘের মলিন আঁচলখানা পাতিয়া বিরহের বাদলরাতি একলা গোঙাইতে, পড়িয়াছিল তার শূন্য মন্দির দুয়ারে কোন্ পুষ্করলোকের বরবর্ণিনী মালবিকা? মলিন বাসে সারাটি অঙ্গ তার ছিল ঢাকা; শুধু একটি চরণাঙ্গুলির অলক্তকরাগ তার বুঝি আঁচলপ্রান্তে ঢাকা পড়ে নাই! হেনা, যুই, রজনীগন্ধার ভিজা গন্ধ বড়ই মিঠা খোস-মেজাজে চঞ্চল সমীরের গায় লুটাইয়া বেড়াইতেছিল। ঝাউগাছটা ফটকের ধারে দাঁড়াইয়া তখনও ফুকরিয়া যাইতেছে—"হা-হা-ওগো তোমরা যারা বাইরে আছ, এদিকে এসো না। এদিকে এসো না—শ।—শ।—তফাৎ যাও।"

সুচরিতার গান গাওয়া অভ্যাস আছে—মৃত্যুঞ্জয় বাবুর বন্ধুবান্ধবদের সাম্‌নে বসিয়াও অসঙ্কোচে গাইতে সে অভ্যস্ত আছে। কিন্তু আজিকে, এই বাদলা বাসরে যে নূতন অতিথিটি তার দুয়ারে, তাকে কি গান, কেমনে গাহিয়া সে শোনাইবে? তার কেমন একটু লজ্জা লজ্জা করিতে লাগিল। তবু গাহিল—মন্দির দ্বারে কোন্ এক সুন্দর অতিথিকে বরণের গান। রবিবাবুর গান বুঝি? কেমন সে গাহিল—সুব্রতর কেমন তা লাগিল—তা শুনিয়া কাজ নেই। সুব্রত নিজেও বেশ গাইতে পারিত।

ঐ একখানা গান করিয়াই সুচরিতা থামিল। বলিল—"আর না, থাক্।" তার নূতন অতিথির কাছে এই প্রথম গানের ঝঙ্কারেই কি তারও বীণাটির সেই গোপন সোণার তার প্রথম চকিত, সলজ্জ সাড়াটি দিয়া গেল? এই গান গাওয়াই কি প্রথম তাকে তার নিজের কাছে ধরা দেওয়াইল? কে জানে? সে বোধকরি তা বুঝিল না। অন্ততঃপক্ষে, স্পষ্ট করিয়া ত' নয়ই।

সুব্রত একটুপরে ঘরে আসিয়া মৃত্যুঞ্জয় বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—"ভারি চমৎকার গান করতে পারেন ত' উনি।"

"হাঁ, যখন মাইহারে কিছুদিন আমরা ছিলুম, তখন সেখানে এক ওস্তাদের কাছে ওকে দিনকতক গান শিখিয়েছিলুম। বীণ, এস্‌রাজও। মাইহার কাটনির কাছে একটা ছোট নেটিভ্‌ ষ্টেট্‌—জানেন ত? গানের বেশ চর্চ্চা ওখানে আছে। তিমিরবরণের শিক্ষা ত' মাইহারেই হ'য়েছিল শুনেছি।"

সে রাত্রে সুব্রত যে বিছানাটায় ঘুমাইল, সেটা সেই গানেরই যত সব গোপন কড়িকোমল পরদা, তাদেরি মরম-ঝঙ্কারের যে সব অমর অনুরণনের ঢেউ, তাই দিয়ে তৈরি!

চতুর্থ

পরদিন সকালে সাড়ে নয়টায় কলিকাতা থেকে তারা সব আসিল। সুচরিতার মা, সুপ্রিয়, তাদের দাসদাসী। মা—যেন সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। প্রবীণতা মুখের অনিন্দ্য সুন্দর শ্রীতে একটা সুস্থির গাঢ়তা আনিয়া দিয়াছে। সরল, প্রসন্ন দৃষ্টি যেন একটা সার্ব্বজনীন মাতৃত্বের স্নেহে টল্‌টল্‌ করিতেছে। সুপ্রিয় বলিষ্ঠদেহ, প্রিয়দর্শন তরুণ যুবক। বছর কুড়ি বয়েস হবে। এই সৌখীন পরিবারে তাকেই একমাত্র খদ্দরে অনুরাগী দেখা গেল। এযুগের কালেজের ছোক্‌রা কি না! অভি-ভাবকদের হুম্‌কির তোয়াক্কা রাখে না। সুচরিতা একাই ষ্টেশনে গিয়া-ছিল—বোম্বে মেল যে সময় আসে—তাদের আনিতে। সুব্রত ডাক বাংলোতেই ছিল—বারান্দায় দাঁড়াইয়া। মৃত্যুঞ্জয় বাবু আজ বিছানায় তাকিয়া হেলান দিয়া বসিয়া কি একখানা কাগজ পড়িতেছিলেন। ভালই আছেন।

রাস্তার বাঁক ঘুরিলে তাদের আসিতে দেখা গেল। আগে আগে আসিতেছে সুচরিতা আর এক হ্যাট্-কোট্ হাফ্‌প্যাণ্ট-পরিহিত ব্যক্তি। সে ব্যক্তিটির বুটের গোড়ালি যেন আঘ্রাণ করিতে করিতেই আসিতেছিল এক জোড়া বিলাতী শিকারী কুকুর। সে ব্যক্তিটির দুই আঙ্গুলের ফাঁকে একটা অর্দ্ধশেষ বিলাতী সিগারেট ঈষৎ ধূমায়মান অবস্থায় রক্ষিতও দেখা গেল। তাঁদের পিছনে আসিতেছিলেন সুচরিতার মা ও শ্রীমান্ সুপ্রিয়। দাসদাসী ও কুলিরা মালপত্র লইয়া আরও পিছনে আসিতেছিল। একজন চাকরের বগলে লম্বামত চামড়ার একটা কেস্ ছিল—বোধ হয় বন্দুকের কেস্ হবে।

সাহেবী পোষাকের সেই ভদ্রলোকটির নাম মিষ্টার সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি বি, এ। বয়স বোধ হয় ত্রিশ ছাড়াইয়া যায় নাই। এঁরা তিন পুরুষে ডেপুটিগিরি করিতেছেন। বাপ ডেপুটিগিরির পরমপদবীতে অধিরোহণ করিয়াছিলেন; কমিশনারের পার্সনাল এসিস্‌টাণ্ট এবং চরমে এডিশনাল্ ডিষ্ট্রিক্‌ট ম্যাজিষ্ট্রেটও হইয়াছিলেন। উচ্চপদের মর্য্যাদা এতই সুচারু সুষ্ঠুভাবে তিনি রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন যে, অবসর গ্রহণ কালে তাঁর ওপর "সি, আই, ই" এই দেবতুর্ল্লভ প্রসাদও বর্ষিত হইয়াছিল। তিনি এখনও সশরীরে, সমহিমায় বর্ত্তমান। কলিকাতার উপকণ্ঠে কোন স্থানে বাড়ী কিনিয়া বসবাস করিতেছেন। পুত্র সমরেন্দ্র প্রেসিডেন্সি হইতে বি, এ পাশ করিলে, পিতা, তাঁর কর্ম্মসূত্রে পরিচিত, নিষ্ঠায় সেবায় পরিতুষ্ট হোম্‌রাচোম্‌রা যত গৌরাঙ্গ দেবতাদের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁরা তখন অবশ্য ভক্তের প্রতি আশুতোষই হইয়াছিলেন। তাঁদের বরে শ্রীমান্ সমর গোঁফের রেখা ওঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হাকিমির তক্তে উঠিয়া বসিয়াছিলেন। কয়েক বছরের মধ্যেই দ্রুত কয়টি লম্ফে তিনি গ্রেডের নীচের ক'টা ধাপ পার হইয়া সম্প্রতি বাংলার কোন স্থানে প্রথম শ্রেণীর হাকিমি পদে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বোধ হয় পাকা এখনও হন নাই। দেবতার বরে অর্দ্ধেক রাজত্ব তাঁরত' ইতোমধ্যেই লাভ হইয়াছে; কিন্তু রাজকন্যা? পিতা পুত্রে সেই চেষ্টাতেই আছেন।

"এই যে সুব্রতবাবু, নমস্কার! এতক্ষণ আপনার কথাই হচ্ছিল। অসময়ে বন্ধুর কাজ ক'রেছেন আপনি। Hearty thanks. Do you smoke? আসুন—চরিতার তাতে বোধ হয় আপত্তি হবে না।"

ডাকবাংলোর বারান্দায় সুব্রতর সঙ্গে করমর্দ্দনের পর সমরেন্দ্র এই বলিয়া তাঁর সিগারেটকেসটি খুলিয়া ধরিলেন।

"ধন্যবাদ। মাপ করবেন! আমার বিড়ি সিগারেট খাওয়া অভ্যেস নেই। আপনারা এসে পড়লেন, নির্ভাবনা হওয়া গেল। উনি একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।"

"কেন—এ ছ'দিন আমাকে কি বড্ড হাঁফিয়ে উঠতে দেখ্‌তেন?"—সুচরিতা বলিল একটু সহাস্য দৃষ্টি মেলিয়া। সে চাহনিতে হাসির আড়ালে অনুযোগ ছিল, না আর কিছু?

"একলা সব দিক্‌ তাল দিতে আপনার নিশ্চয়ই কষ্ট হ'ত! আর, সে রাত্তিরেত' একটিবার চোখের পাতা বুজতেও পান নি।"

"আর আপনি সে রাত্তিরে কেমন চমৎকার নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছিলেন!" দুজনেই হাসিল।

সমরেন্দ্রর বাটারফ্লাই গোঁফ একটা হাসির ভঙ্গীতে একটুখানি কুঞ্চিত হইল মাত্র। হাসির ভঙ্গী! এজলাসের আম্‌লারা সেটাকে বলিত ভেঙ্গচানি! নিমকের গুণ তারা এম্নিই গাইত বটে!

"ও এত প্রশংসা আপনার কচ্ছিল যে, কারুর তাতে হিংসে হ'লেও হ'তে পারে। Tomy, Tomy, come here"—বলিয়া একটা কুকুরকে শিশ্‌ দিয়া ডাকিলেন। কুকুরটার গায়ে একটা আদরের চাপড় মারিয়া পায়ের বুট দরজার চৌকাটের বাইরে সশব্দে ঝাড়িয়া তিনি ঘরে ঢুকিলেন।

সুচরিতাও ঢুকিতেছিল। এক মুহূর্ত্ত দেরী করিয়া ঢুকিল। সুব্রতর দিকে ফিরিয়া বলিল—"দুদিন আপনারত' খাওয়াই হয় নি। আজকেও আবার আপনাকে এই তেপান্তরের মাঠের হাওয়া খেয়েই থাক্‌তে হয়, এই দুর্ভাবনা আমার হচ্ছিল। মা-টা সব এসে পড়াতে তাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল।"—হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচার এই নতুন টীকা এবং কৈফিয়ৎটি শোনাইয়া সুচরিতা তার হাসিভরা মুখখানা

ফিরাইয়া ঘরে ঢুকিল। হাসার সময় তার গালদুটিতে আর চিবুকে চমৎকার "ডিম্পল" ফুটিয়া উঠিত।

প্রথমদৃষ্টিতে সুব্রতর চোখে সমরেন্দ্র লোকটি কেমন কেমন ঠেকিল। তেমন সুপুরুষ সে না হইতে পারে; তাতে তেমন আটকাইত না। কিন্তু তার বিজাতীয় বেশভূষা, চা'ল-চলন তাকে সুব্রতর চোখে প্রিয়দর্শন করে নাই, নিশ্চয়। আজকা'লকার দিনে বিলাতী সিগারেট্, বিলাতী কুকুর, বিলাতী পোষাকে প্রসক্তি তার ভেতরে ঠিক অসহনীয় তিক্ততার মতন একটা কিছু না জন্মিয়ে দিক্, সেটা নিশ্চয়ই তাকে আকর্ষণ করিত না। ইংরাজী বুকুনি ব্যবহারেও যেন লোকটার একটুখানি আগ্রহের অতিশয় দেখা গেল। তখন পর্য্যন্ত অবশ্য, সুব্রত তাঁর পদগৌরবের সমাচারটা পায় নাই।

নিজেও সে ধনীর একমাত্র সন্তান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলোতে একাধিকবার সুবর্ণপদক অর্জ্জন করিয়াছে। তার পি, এইচ, ডির থিসিস্ ভারতের বাইরেও বিদ্বৎসমাজে তাকে অল্পবিস্তর পরিচিত করিয়া দিয়াছে। তারপর, কেম্ব্রিজে দুইবছর পড়িয়া সেখানকার ট্রাইপস্ পরীক্ষাতেও সসম্মানে উত্তীর্ণ সে হইয়াছিল। আরও বছরখানেক জার্ম্মাণি, ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে ঘুরিয়া, নূতন নূতন ভাবসৃষ্টি-কেন্দ্র ও কর্ম্মসাধনা-ক্ষেত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে পরিচিত হইয়া, সে দেশে ফিরিয়াছে। হার্ভার্ডের সেমিনারিতে তার হিন্দুদর্শনও সভ্যতা সম্বন্ধে বক্তৃতা বড় বড় আচার্য্যদেরও বিস্ময় ও আনন্দ উৎপাদন করিবাছিল। সে পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সভ্যতার ঘরের খবর লইয়া আসিয়াছে। আসল ও সাচ্চা যেটা, সেটাকে নাড়িয়া চাড়িয়া সে দেখিয়া আসিয়াছে। যেটা নকল ও ঝুঁটা, সেটা, সেদেশের রঙিন কোয়াসার আলোতেই, তাকে ঠকাইতে পারে নাই! এ দেশের শুক্‌নো ঝরঝরে

আলোয় সে সবের অশোভনতা ও কদর্য্যতা অতি সহজেই তার চোখে ধরা পড়িত।

নানা দেশ ঘুরিয়া, নানান্ দেশের ঝুটা ও সাচ্চার পরখ লইয়া তার চোখ ফুটিয়াছিল—যেটা তার আপন দেশের, আপন ঘরের আসল সাচ্চা, সেটাকে বাছিয়া লইতে একরাশি ঘরওরা ও আমদানী ঝুটা ও নকলের জঞ্জালের ভেতর হইতে। ভারতের যেটা নিজস্ব প্রকৃতি, যেটা তার বিশিষ্ট সাধনা, সে প্রকৃতির রূপটি তার খুব ভালই লাগিয়াছিল; সে সাধনার সিদ্ধিটাকে তার সব চাইতে সেরা বরণীয় মনে হইয়াছিল। পশ্চিম হইতে অনেক কিছু লইতে সে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু এমন কিছু সে কখনই অঙ্গীকার করিবে না, যাতে চিরকল্যাণময় ভারতীয় রূপটি ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়, অথবা অশোভনভাবে বিকৃত হইয়া যায়। এমন কিছু নূতন ধারা সে ধরিবে না, যাতে ভারতীর পুণ্য সাধনার ধারাটি রুদ্ধ অথবা ক্ষুন্ন হইয়া যায়। তার খদ্দরের পোষাক "বেণে" স্বাদেশিকতা মাত্র ছিল না। নিজের অথবা দেশের লাভ লোকসান খতিয়ান করিয়া সে খদ্দর পরিত না। তার স্বাদেশিকতার উৎস নিহিত ছিল ভাবের, বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের একটা গভীর প্রদেশে। দেশের যুগায়ত ভাব-সাধনা ও কর্ম্ম-সাধনার মাঝখানে সে পাইয়াছিল একটা বিশ্বজনীন চিরন্তন সত্যের পরিচয়—যে সত্যকে মৃত, আড়ষ্ট অতীতের শব-ভাণ্ডারের অচলায়তনে আবদ্ধ থাকিতে সে দেখিত না। সে সত্য ছিল সজীব, সক্রিয়, সপ্রয়োজন, সমর্থ একটা সত্য। শুধু ভারতেরই নয়, বিশ্বমানবের প্রয়োজন-সাধনেই সে সত্য যেন যুগ যুগ ধরিয়া তপস্যা করিয়া তার বিপুল ও অপরাহত কল্যাণ-শক্তি অর্জ্জন ও সঞ্চয় করিয়া আসিতেছে। সেই সত্যেরই পুণ্য অধ্ব পানে আজ সারা পশ্চিমের অন্তরাত্মাকে তার ব্যাকুলতম আকুতির দৃষ্টি মেলিয়া চাহিয়া থাকিতে

দেখিয়া আসিয়াছে সে। সাহেবিয়ানার সংস্পর্শ দেখিলেই অবশ্য তার নাসা কুঞ্চিত হইত না; কিন্তু অন্ধ, মূঢ় গতানুগতিকতা যেখানে আপন অন্ধতার চক্ষে মিথ্যা-অভিমানের রক্ত-অঞ্জন লেপিত, আপন মূঢ়তার পৃষ্ঠে হাস্যকর দম্ভের ভেরী তুলিয়া দিত, সেখানে শুধু কৃপামাত্র দেখাইয়াই সুব্রত রেহাই পাইত না; সে নিজেকে অসহিষ্ণু, বিরক্তও হইতে দেখিত।

সমরেন্দ্রকে কেবলমাত্র বর্ত্তমান পশ্চিমাভিমুখিনী গতানুগতিকতার গোলাম দেখিলে তার অন্তর হয়ত' শুধু কৃপাই করিত। কিন্তু সমরেন্দ্রের বিজাতীয়তার উদ্ধত অভিমান এই তাদের প্রথম দেখা-শোনাটুকুর ভেতর দিয়াই তার কাছে এতটা উৎকটভাবে জাহির হইয়া পড়িয়াছিল যে, সেটা তার অন্তরের সৌষ্ঠববোধেও একটা উগ্ররকমের খোঁচা দিল। লোকটির চা'ল-চলন তার ভাল লাগিল না। ঐ প্রথম আলাপনেই সে বুঝিল তার সঙ্গে নিজের যেন কিছুতেই ঠিক মিশ খাবে না—তেলে জলের মতন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু বা তাঁর কন্যার সৌখীন বেশভূষা, সাজ-সরঞ্জাম তাকে উদ্ধতভাবে আঘাত করে নাই। তার অন্তরের প্রীতি ওদিকে গড়াইয়া যাবার পথে সেটা কোন রকমের একটা শিথিল বাঁধও বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করে নাই। তাঁদের সৌখীনতা সম্পূর্ণরূপে বাইরেরই জিনিস; সেটাকে ফেলিয়া দিয়া তার যায়গায় অপর একটা কিছু পরিধান করিবার সময় আসিলে, সেটা যেন বেমালুমভাবেই খসিয়া পড়িবে, অঙ্গে কোনরূপ জোরজুলুমের চিহ্ন রাখিয়া যাইবে না। কিন্তু সমরেন্দ্রের পরিচ্ছদ তার প্রকৃতিতে যেন কামড়াইয়া বসিয়াছিল। সেটা ধরিয়া টানাটানি করিলে, তার মর্ম্মস্থলেই হয়ত বা বেদনা লাগে! আর, সে সম্ভাবনামাত্রেই সে হয়ত' ফোঁস করিয়া ওঠে।

এ ছাড়া এই অল্প ক'বছরের ডেপুটিগিরি সমরেন্দ্রের চা'ল-চলন, কথাবার্ত্তা, ভাবভঙ্গী—সবই একটা হাকিমি ছাঁচে বোধহয় ঢালিয়া লইয়াছিল। তার পদগৌরবটা তার আকৃতি ও ব্যবহারের সর্ব্বাবয়বেই যেন নিত্য সচেতন হইয়া, উদ্ধত হইয়া বিরাজ করিত। সে তার কার্য্যস্থলের বাইরেও যেন তার হাকিমি তক্ত হইতে নামিয়া পড়িতে অপারগ হইত ; তার এজলাসটা, খাসকামরাটা ভুলিয়া যাইতে অকৃত-কার্য্য হইত। তিন পুরুষে ডেপুটি বলিয়াই কি এতটা ?

সুব্রত অবশ্য তার অপরিচিত ভদ্রলোক। তার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ে সমরেন্দ্র যা বলিল কহিল, তাতে অবশ্য স্পষ্টতঃ সৌজন্যের, শিষ্টাচারের কোনই ত্রুটি দেখা যায় নাই। বিজাতীয় পরিচ্ছদটা তার যতটা স্পষ্ট ছিল, বিজাতীয় ভাবটা তার অবশ্য ততটা স্পষ্ট হয় নাই। আর, হাকিমির ভড়ংটা কতকটা ব্যক্ত হইলেও, হাকিমি মেজাজটা অবশ্য সবটাই অব্যক্ত ছিল। ওপরের ঐ আলেখ্যখানার আউট্‌লাইনটা সুব্রতর আপন অন্তঃপুরিকা বিশ্লেষণী দৃষ্টি আঁকিয়া ফেলিয়াছে। যথার্থের অনুরূপ হইল কি না, কে বলিবে ? অপরিচিত নূতন লোক সুব্রত যে ছবি ভেতরে ভেতরে আঁকিয়া ফেলিল, সে ছবিখানা, সমরেন্দ্রের সুপরিচিত যারা, তারা, হয়ত' সহজে, এমন কি আদৌ, সনাক্ত করিতে পারিবে না। তাদের আঁকা ছবি হয়ত' অন্যরূপ। এবং হইতে পারে যে, সেইটাই আসলের বেশী অনুরূপ।

বাস্তবিক দেখাও গেল—সমরেন্দ্র তাদের ঘরের ছেলের মতন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু এবং তাঁর পত্নী তাকে সন্তানের মতই দেখেন। সুপ্রিয় দাদা বলিয়া ডাকে। সুচরিতাও বোধহয় ডাকিত। তবে, সুব্রত তাকে সে ভাবে ডাকিতে শুনিল না। সমরেন্দ্রর পিতা মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বিশিষ্ট বন্ধু—সম্ভবতঃ বাল্যকাল হইতেই। উভয় পরিবারে ঘনিষ্ঠতা

অনেকদিনকার। কলিকাতায় বালীগঞ্জ অঞ্চলে উভয়েই পাশাপাশি জমি কিনিয়া বাড়ী করিয়াছেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু অনেক সময় জব্বলপুরেই থাকেন বটে, কিন্তু সুচরিতা ও সুপ্রিয় তাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতেই আজকা'ল থাকে। তারা কলেজে পড়ে কিনা। মা কখনও স্বামীর কাছে, কখনও বা ছেলেদের কাছে থাকেন। পাশাপাশি বালীগঞ্জের এই দুইটা বাড়ীতে খুবই মাথামাখি মেলামেশা ছিল। শিক্ষা, দীক্ষা, রুচি, অভিরুচি, চা'লচলন—দুই বাড়ীরই নব্য অভিজাত "বালীগঞ্জী" ধরণের। মোটর, বিলিয়ার্ড টেব্‌ল, টেনিস ব্যাড্‌মিণ্টন, রেডিও, গার্ডেন পার্টি, বালীগঞ্জ লেক অঞ্চলে পিক্‌নিক্, অবসর মত দার্জ্জিলিং, শিলং, সিমলায় পাড়ি—এসমস্ত অনুষ্ঠানই যথাযথ নিখুঁতভাবে বাহাল দিল। এ যুগের গণ আন্দোলনের যেগুলো বড় বড় ধারা—মহাত্মা গান্ধী ভগীরথের মতন শঙ্খনিনাদ করিয়া যে পুণ্য, বিপুল উচ্ছল ধারাটিকে, যারা আর্ত্ত, যারা পতিত, যারা অস্পৃশ্য, তাদের উদ্ধারের তরে লইয়া যাইতেছেন—সে সব ধারা বালীগঞ্জ অঞ্চলের ঐ সব অর্কিড্-শোভিত সৌখীনতার ও বিজাতীয়তার দুর্গ-পরিখাগুলির বদ্ধ জলটা এখনও নিকাশ করিয়া দিতে পারে নাই। স্বাধীনতা-স্পৃহার উচ্চ জয়ধ্বনি, জাতীয় মুক্তি-আশার দৃপ্ত বিজয়-কেতন, সে অঞ্চলে এখনও তেমন সাড়া জাগাইতে সমর্থ হয় নাই। দূর হইতে উদ্বেল জয়ধ্বনির যে ক্ষীণ প্রতিধ্বনিটুকু অলস মন্থর হাওয়া বহিয়া আনিত, মুক্তি পতাকার যে গৌরব-রাগ-রেখাটুকু সেখানকার অনুদার আকাশ, কৃপণ কুণ্ঠিত আলোক প্রকাশ করিত, তাতে কোনই চাঞ্চল্যের একটা শিহরণ সে অঞ্চলে খেলিয়া যাইত মনে হয় না। অথবা, যে চাঞ্চল্যটুকু দেখা যাইত, সেটা প্রকাশ পাইত হয় একটা বিশ্বাসহীন উপেক্ষার বিমুখতায়, নয়ত একটা শ্রদ্ধাহীন বিদ্রূপের চটুল রসিকতায়। মৃত্যুঞ্জয়বাবুদের বাড়ীর আব্‌হাওয়া ছিল

প্রথমরকমের; ডেপুটি বাবুদের বাড়ীর আব্হাওয়া ছিল শেষের রকমের। দুই বাড়ীরই কিন্তু দৈনন্দিন জীবন একটা বিজাতীয় বিলাসিতার গতানুগতিক অনুসরণ ও অনুশীলনের ভিতর দিয়াই কাটিয়া যাইতেছিল।

সমরেন্দ্রর বোন্ সুজাতার সঙ্গে সুচরিতার খুব ভাব। দু'জনেই বেথুনে পড়ে। পড়িতে যাইয়া বাইরের মুক্ত উদার নূতন প্রাণোন্মায় পূর্ণ বাতাস তারা দুজনেই অবশ্য বুক ভরিয়া লইয়া আসিত। তাতে তাদের আধ্যাত্মিক রক্তধমনীগুলি নূতন তাজা রক্তের সঞ্চারে স্পন্দিতও হইত বোধ হয়। কিন্তু এখনপর্য্যন্ত সে স্পন্দন এতটা স্পষ্ট হয় নাই, যাতে তাদের নিত্য-জীবনের প্রচলিত অনুষ্ঠানগুলোর মাঝে নিশ্চিন্ত ভাবে পড়িয়া থাকায় একটা অসহনীয় অস্বস্তি তারা বোধ করিবে। তবে, বাইরের প্রভাব একান্তভাবে ব্যর্থ নিশ্চয়ই হইতেছিল না। মগ্নচৈতন্যের ভূমিতে ভিতরে ভিতরে সেটা কাজ করিতেছিলই। বিশেষ, বালী-গঞ্জের তাদের যে বিশেষ অঞ্চলটার কথা হইতেছিল, সেখানটায় বর্ত্তমান যুগ-আন্দোলনের অন্য ধারা, অন্য ঢেউগুলো তেমন না পৌঁছিলেও, নারী-প্রগতির নূতন ঢেউটা কিছু কিছু গড়াইয়া আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল বটে। কেবল সুপ্রিয় ছোকরাটি তাদের ঐ লেক-অঞ্চলের বাড়ীর আব্হাওয়া ছাড়িয়া এত দ্রুতপায় ফাঁকা "গড়ের মাঠের" দিকে চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল যে, তাতে তার নিজের না হোক্, তাদের দুই বাড়ীর "হার্ট" দুশ্চিন্তায় ফেল্ হইলেও হইতে পারে, এমন আশঙ্কা কখন কখন হইত। সুপ্রিয় খদ্দর ধরিয়াছে; কলিকাতার ছাত্রদের সম্মিলন গুলোতে গতিবিধি আরম্ভ করিয়াছে। তবে, ডেপুটি পিতা ও পুত্র তাকে যতটা "র‍্যাবিড্" রকমের ন্যাশানালিষ্ট ভাবিতেন, সে এখনপর্য্যন্ত সে রকমের একটা কিছু হয় নাই। খদ্দর-

পরিহিত, যুবসম্মিলনের মেম্বর শ্রীমান্ সুপ্রিয়র সংস্পর্শ অবশ্য ডেপুটি-পরিবারের কাছে ক্রমেই আশঙ্কাজনক হইয়া উঠিতেছিল। তাঁরা "শোধরাইবার" চেষ্টার কসুর করেন নাই, কিন্তু "ইয়ং বেঙ্গল" খুব মোলায়েম ভাবে যখন তখন নুয়ে পড়ার গর্ব্ব রাখে না; তাঁদের হা'ল ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর আশঙ্কার হেতু তেমন স্পষ্ট অথবা জরুরি ছিল না। তিনিও বোঝাইতে কতকটা চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু সে বোঝে নাই। সুতরাং, সুপ্রিয়র খদ্দরটাকে তাঁরা "বরদাস্ত" করিয়া যাইতেন। মেয়েরা, বিশেষ সুজাতা, শুধু যে "বরদাস্ত" করিত এমন নয়। মুখে তারা যাই বলুক, ভিতরে ভিতরে তারা, ঠিক মর্য্যাদা ও গৌরব বোধ না হ'ক, একটা সস্নেহ সহানুভূতি, সুপ্রিয়র পানে আগাইয়া দিতেছিল। দেবে না?—সুপ্রিয় যে তাদের আপনার! আর, অলক্ষিতে, গোপনে, তাদেরও রক্ত ধমনীতে কোন্ এক মহান্ নটরাজ যে নৃত্যপর হইতেছেন! এ যুগের আহ্বানে তারাও যে আর বেশীদিন কাণে আঙ্গুল দিয়া থাকিতে পারিতেছে না! তবে, অন্ততঃ সুচরিতার রক্তধমনীতে, সে নটরাজ তখন চরণে রত্নমঞ্জীর বাঁধিয়া নৃত্যপর হবার সবে উপক্রম করিতেছেন মাত্র। সুজাতারও কি তাই?

তারা ভেতরে বেশ গল্পসল্প করিতেছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর সুচরিতার হাস্য বাইরেও শোনা যাইতেছিল। সমরের হাসির ওপরেও বোধ হয় হাকিমির কড়া শাসন। সুচরিতার মা বাহিরে আসিয়া সুব্রতর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিলেন। আকস্মিক বিপদের মুখে দুটি প্রাণী যখন নিতান্ত অসহায় হইয়াছিল, তখন, সে যে তাদের নিরুপায় বোঝা আপন সবল, দরদী, নিপুণ হস্তে তুলিয়া লইয়াছিল—এতে অসামান্য একটা সহৃদয়তা তিনি দেখিতে পাইয়াছেন দেখিয়া সে সত্যই বড় সঙ্কুচিত

হইতেছিল। তার ব্যবহার, তার কাজ, কর্ত্তব্যপালনের যে একটা শিষ্ট-সম্মত সাধারণ আবশ্যকতা আছে, তা' ছাড়াইয়া একটুও যায় নাই—এইটেই সে মনে করিয়াছিল। কিন্তু সেই প্রবীণার প্রশংসার তলে সত্যকার একটা আন্তরিকতা ছিল যে! আর, সে আন্তরিকতা কেবল-মাত্র কৃতজ্ঞতার ধন্যবাদে নয়, একটা মাতৃত্বসুলভ স্নেহের আদরেও, ফুটিয়া উঠিতেছে দেখিয়া সুব্রত সুখী হইল। সমরেন্দ্রের সেই "থ্যাঙ্কস্ গিভিং"এ সে যেন কতকটা বিব্রতই বোধ করিয়াছিল। মা খাওয়া দাওয়া ব্যাপারে তার অভ্যাস ও রুচির সংবাদটাও লইলেন। সুব্রত কেবল যে খদ্দর পরে এমন নয়, নিরামিষ খায়। আন্দোলন "অহিংস" রাখার আদেশ সবরমতী হইতে অবশ্য বাহির হইয়াছিল; কিন্তু খদ্দরকে যে "নিরামিষ" থাকিতে হইবে, এমন পাঁতি ত' কৈ কোনও ওয়ার্কিং কমিটি এ পর্য্যন্ত বাহির করেন নাই!

মা খাওয়া দাওয়ার যোগাড়যন্ত্র করিতে ভিতরে গেলেন। অবশ্য, তাদের সকলেরি প্রাতরাশ সুচারুরূপে আগেই সম্পন্ন হইয়াছিল। সুব্রত ভেতরের আলাপের আসরে তাদৃশ ভিড়িল না। সত্য কথা বলিতে, সে যেন তার মধ্যে নিজেকে কতকটা খাপ ছাড়াই বোধ করিয়াছিল। বিশেষ, তার খদ্দর পরিচ্ছদটার পানে সমরেন্দ্রের দৃষ্টি একটা বাহ্যিক আয়াস-রক্ষিত ভদ্রতার রঙ্গিন চসমার ভিতর দিয়াও সময়ে সময়ে যেরূপ জ্বলিয়া উঠিতেছিল, তাতে সেটাকে অনুকূল, প্রসন্ন সস্মিত দৃষ্টি বলিয়া সুব্রতর ভ্রম হয় নাই। সুব্রতর বিশেষ পরিচয় অবশ্য সেখানে কেহই জানিত না—যাতে তার পরিচ্ছদ ও চা'লচলনের যেটা সহজ অনবদ্য কৃচ্ছ্রতা, সেটা তার গৌরবের উপযুক্ত মূল্য আদায় করিয়া লইতে পারিত। বাঙ্গালাদেশের এক পাড়াগেঁয়ে তালুকদার—সভ্যতার আলোক বাতাসের সংস্পর্শেই যে হয়ত' আসে নাই—তার সাদাসিধে

চা'লচলন, বর্ত্তমান সভ্যতার বড় বড় কুলীন অভিজাতবর্গের কাছে—আপনার মর্য্যাদা আদায় করিবে কি করিয়া! ড্রয়িং রুমের পরদা ঠেলিয়া তার পক্ষে ভেতরে ঢুকিয়া পড়াটাই একটা মস্তবড় গোস্তাকি। যদি বা ঘটনাসূত্রে ঢুকিয়া সে পড়িয়াছে, তাকে এক কোণে একখানা টুল দেখাইয়া দেওয়াই যথেষ্ট! মৃত্যুঞ্জয় বাবুরা অবশ্য তার আসিয়া পড়াটাকে গোস্তাকি মনে করেন নাই; আর, তাকে বসার জন্য কোণে একখানা টুলও দেখাইয়া দেন নাই। তাঁদের একটা স্বাভাবিক অমায়িকতা ও সৌজন্য ছিল। তার ওপর, বড়ই বিপদে সহায় হইয়া, বন্ধু হইয়া, সুব্রত যে তাঁদের সঙ্গে মিলিয়াছে! হাল্‌ফ্যাসানি চা'ল-চলনে তাকে একান্ত অনভ্যস্ত মনে করিয়া তাঁদের মনের কোণে একটা প্রচ্ছন্ন কৃপার ভাব থাকিলে থাকিতে পারে; কিন্তু তাকে তাঁদের সস্নেহ আলিঙ্গনের মধ্যে টানিয়া লইবার একটা সত্যকার জীবন্ত প্রেরণাও তাঁরা অনুভব করিতেছিলেন বৈকি। কেবল, সমরেন্দ্রর বিজাতীয় রুচি ও পদের আভিজাত্যই বোধ হয়, সুব্রতসম্বন্ধে তার ব্যবহারটাকে, একটা কষ্ট-কল্পিত সৌজন্য ও ভদ্রতার সীমারেখা লঙ্ঘন করিয়া যাইতে দিতেছিল না। সে যেন সেই মাণিকপুরের ডাকবাংলোয় বসিয়াও, মৃত্যুঞ্জয়বাবুদের বিপদের দিনে সুব্রতর উপকারের কথা স্মরণ রাখিয়াও, কোনমতে তাকে নিজেদের "সেট" বা "সার্‌কল্"-এর একজনা মনে করিতে পারিতেছিল না। আর, এটাও সে ভুলিতে পারিতেছিল না যে, তার "সেট টা" নিজেদের সেটের অনেকখানি নীচে। এইজন্য সুব্রতর সঙ্গে তার ব্যবহারে একটা খোস্-মেজাজি মাতব্বরির (good-natured condescension)এর ভাবের লেশ লাগিয়াছিল, যেটা সুব্রতর কাছে আদৌ সহনীয় নয়।

সেদিন উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ঘটে নাই। খাওয়াদাওয়া শেষ

হইতে হইতে দু'টো আড়াইটে হইয়া গেল। সেদিন অবশ্য মাছমাংসের রান্না কিছু কিছু হইয়াছিল। সুব্রতকে একটু ফারাকে ঠাঁই করিয়া বসাইয়া গৃহিণী স্বয়ং বসিয়া খাওয়াইলেন। নিরামিষ রান্নাগুলো সুচরিতা নিজেই আসিয়া পরিবেশন করিয়া গেল।

"বাবা, তোমার জন্যে এই নিরিমিষ রান্না সুচরিতা নিজেই ক'রেছে। ঠাকুরকে বা আমাকে সে তোমার রান্না রাঁধতে দেয়নি।"

"এ দুদিন রান্নার যেরকম সার্টিফিকেট্ ওঁর কাজ থেকে আমি আদায় ক'রে রেখেছি, তাতে আমার ভয় হচ্ছে—ওমন দেবভোগ্য সামিগ্রি উনি নরভোগ্য করেন কি ক'রে? বুঝি বা কণিকামাত্র গ্রহণ ক'রেই ওঁকে উঠতে হয়। মা, তুমি ত আচ্ছা? এ হাটে হাঁড়ি ভাঙ্গ্‌তে তোমায় কে বল্‌ল? আর কারুর রান্না ভেবে উনি হয়ত' চাট্টিখানি খেতে ভরসা পেতেন। কা'ল যেমন ধারা নমুনা দেখেছেন, তাতে আর ভরসাই পাবেন না যে।"

"চরি, যা তুই বেশী বকিস্ নে। ছানার ডাল্‌নাটা আর একটুখানি নিয়ে আয় দিকিন। ওর রান্নাবান্নার অভ্যেস নেই, বাবা। তবু সখ ক'রে রাধতে যায়। কা'ল বুঝি খাওয়াদাওয়ার খুব কষ্ট হ'য়েছিল? আজকে এগুলো হ'য়েছে কেমন?"

"উচিত জবাব দেবার পথ ওঁর মেরে রেখেছি, মা। ভাল না লাগলেও দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা ওঁকে কোন গতিকে চালিয়ে যেতেই হবে।"

"উনি হাটে হাঁড়িভাঙ্গার কথা ব'ল্‌ছিলেন। কিন্তু কা'ল হাটও ছিল না, হাঁড়িও ভাঙ্গে নি। আমার দক্ষিণহস্তের ব্যাপারটা কোন গতিকে চালিয়ে নেবার পর কা'লকে ওঁর হাঁড়ির খবরটা নেবেন দিকি। সে খবরটা ওঁর পক্ষে খুব ভরসার ছিল না নিশ্চয়।"

একটু হাসির কলধ্বনি খেলিয়া গেল। সমর ও সুপ্রিয় অন্যদিকে পাশাপাশি খাইতে বসিয়াছিল। ঠাকুর তা'দের পরিবেশন করিতেছিল। হাসির কলধ্বনি শুনিয়া সমর অজরূপী শাশ্বত দধীচির অস্থির ভিতরকার গুহ্যাদপি গুহ্য বস্তুটির আস্বাদের গাঢ়তা হইতে মুখ তুলিয়া একটিবার চাহিয়া দেখিল—অই খদ্দরপরিহিত নিরামিষ লোকটির পানে। সে চাহনিতে তার সেই আলাদা "সেট্"এর বোধটা আরও একটুখানি সজাগ হইতে দেখা গিয়াছিল কি ?

বিকেলের দিকে সুপ্রিয় আসিয়া সুব্রতর সঙ্গে জুটিল। টুপীতে টুপীতে আকর্ষণের মতন খদ্দরে খদ্দরেও একটা আকর্ষণ আছে বৈ কি ! সে দিন মেঘ ছিল না। তারা দুজনে মাঠে অনেকদূর বেড়াইতে গেল। মুভ্‌মেণ্ট-সম্বন্ধে অনেক কথাবার্ত্তাই তাদের হইল। সুপ্রিয় বুদ্ধিমান্ ছেলে—এক আঁচড়েই বুঝিল—অই খদ্দরপরা, নিরামিষ তার সঙ্গীটি একেবারে আসল হীরে। সুব্রত অবশ্য তার পি, এইচ, ডি আর বি, এ, (ক্যাণ্টাব) এর সনন্দ দু'খানা তাকেও দেখাইল না। তা' না দেখাক্ সে, ডিগ্রী আর খেতাবের স্তম্ভের ওপর না দাঁড়াইলেও, সুপ্রিয়র শ্রদ্ধার মাপকাঠিতে সে খাটো হইল না। সন্ধ্যা হব হব—এমন সময় ডাক-বাংলোর দিকে তারা যখন ফিরিয়া আসিতেছিল, তখন তারা অপরিচিতের বাহ্যিক শিষ্টালাপের প্রবাস দূরে রাখিয়া যেন অন্তরঙ্গতা ও বন্ধুত্বের ঘরের দিকেই আগাইয়া আসিতেছিল।

সেদিনও সন্ধ্যার হোলি খেলার মাতামাতি চলিতেছিল। ফটকের গায়ে জড়ানো একটা মধুমালতীর কুঁড়িগুলো নিজেদেরই আকুল সুবাস-মদিরাতে যেন ফাটিয়া ফুটিয়া উঠিতেছিল। দূরে মহুয়ার গাছগুলোর ফুলে ফুলে তখন পিয়াসী হাওয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছিল—সদ্যঃ-পরিস্রুত মদিরের সুরভি কণাগুলি।

ফটকের ধারে বাউলটা তখন মৌনী হইয়া সাঁঝের এই মন্দিরোৎসব দেখিতেছিল, আর আপনভোলা ভাবে থেকে থেকে মাথা নাড়িতেছিল। সে উৎসবে তার কমঠকঠোর কাঠামোটার ভেতরে যে প্রাণ বাস করে, তার নিমন্ত্রণ হয় নাই কি? কালো ছায়ার গায়ে সোণালি আলোর রাঙা ছোপ, আর সোণালি আলোর গায়ে কালো ছায়ার কাজল-রেখা—আলো আর ছায়ার লুকোচুরি খেলা তখন চলিতেছিল।

ফটকের ধারে মাঠের পানে তাকাইয়া একটি হাতে তার মধুমালতীর হু'চারিটা প্রগল্‌ভা বল্লরীর সোহাগ-স্পর্শই যেন সরাইয়া দাঁড়াইয়াছিল সে! পরণে সেই রাঙা শিল্কের সাড়ীখানা। কাণে সেই মুক্তার ছুল আবার রঙিয়া প্রবাল হইয়া গিয়াছে। "কনকলতা অবলম্বনে উয়ল, হরিণী-হীন হিমধামা"—বিত্তাপতির পদ না?

"কদ্দূর গেছ্‌লেন? ঐ তেপান্তরের মাঠের ওমুড়োয় বুঝি? মাঠের ও-পিঠে বুঝি বা সেই রূপকথার রাজকন্তের দেশ? তাই আবিষ্কার করতে গেছ্‌লেন বুঝি?"

ও পিঠে না এ পিঠে?—সুব্রতর মনে একটা মৌন প্রশ্ন জাগিল।

সুব্রত অবশ্য সেইদিনই রাত্রির মেলে চলিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। কিন্তু সুচরিতার মা, মৃত্যুঞ্জয়বাবু, সুপ্রিয় ফুলবেঞ্চের সরাসরি বিচারে সে আরজি তৎক্ষণাৎ নামঞ্জুর করিয়া দিলেন। সমরও সে ফুলবেঞ্চে অবশ্য ছিল। সুচরিতাও ছিল। সমর যে স্বতন্ত্র রায় দিল, তাতে অবশ্য শিষ্টজনজুষ্ট সৌজন্য ও ভদ্রতার আইনের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সুচরিতাও একটা স্বতন্ত্র রায় দিয়াছিল—খুবই সংক্ষিপ্ত, আর—একেবারে অকাট্য। সুচরিতার সেই সংক্ষিপ্ত রায়টি শুনিয়া সুব্রত বুঝিয়াছিল—তার আরজি কোন প্রিভিকাউন্সিলেই লইতে সে আর ভরসা করিবে না। কাজেই থাকিয়া যাইতে হইল।

সেদিনও সন্ধ্যার পর গানের আসর বসিল। সমরেন্দ্রের গ্রহস্থানে শনির সামান্য একটুখানি বক্রদৃষ্টি পড়িয়াছিল কি?—যে কয়টা গান হইল সমস্তই জাতীয়তার নূতন ভাবে ভরা গান। মুখে তারিফ তাকেও করিতে হইয়াছিল— কিন্তু সমরেন্দ্রের মনের ভিতর গানগুলোর ভাষা ও ঝঙ্কার যেন কতগুলো "গন্"এর "বুমিং" সৃষ্টি করিয়া বুকটি তার কি জানি কি একটা অস্পষ্ট বিভীষিকায় দুরু দুরু কাঁপাইতেছিল। সুপ্রিয়র ওপর মনে মনে তার রাগ হইতেছিল—সেই ছোক্‌রাই ত' যত অনর্থের গোড়া হইল! ছোক্‌রা একা থাকিলে, তার জাতীয়তার সোডাওয়াটার বোতল হয় ত' সহজে খুলিত না। কিন্তু খদ্দরমণ্ডিত, বেশ "ভাল মানুষ" আর একটা হুইস্কির বোতল কাছে থাকাই ত' তাকে খুলিতে বাধ্য করিয়াছে বোধ হয়! সুপ্রিয়ই সুব্রতর পানে তাকাইয়া প্রথমে ধরিয়া দিল—জাতীয় গান। আর জাতীয় গানের এমন একটা বেসামাল ধারা আছে—সে গান একবার আরম্ভ হইলে সে ত' নিজে গড়াইবেই; তা' ছাড়া, সব্বাইকেই সে নিজের সঙ্গে গড়াইয়া লইয়া যাইবে। তার পর আর কোন গান লাগে না, জমে না। সুচরিতার গানের ষ্টকে বৈচিত্র্য ছিল। জাতীয় ছাড়া অন্য রকমের গানও সে গাইত। রবিবাবুর অন্য রকমের কতকগুলো গান সে চমৎকার গাইতে পারিত। তারই দু'একটা আজ শোনার সাধ ছিল সমরের। তাদের বালীগঞ্জের বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে ছুটিতে আসিয়া সে সেইসব গানই শুনিতে অভ্যস্ত হইয়াছে। আজ, সুপ্রিয়র পর যখন সুচরিতার গাবার পালা আসিল, তখন দেখা গেল— সেও জাতীয় গানের গড়ানে গ'ড় দিয়াছে। শুধু তাই নয়। সুচরিতা তার মধুর, উচ্ছ্বসিত ভরা কণ্ঠে যে গানটা গাহিল, তার ক'টা কলি যে ১২৪ ক ধারায় পড়িলে পড়িতে পারে—এ বিষয়ে তার ডেপুটি মনের

খাস কামরাটায় বসিয়া সমরেন্দ্রের একটু সংশয়ও হইতেছিল।

শেষকালে অনুরোধ উপরোধ হইল সুব্রতর ওপর। বেশী সাধ্যসাধনা করিতে হইল না। সর্দ্দিকাশি, গলাটা আজ ভারের পর্য্যায়ে তারাও সে ভাঁজিয়া লইল না। গাইল। বেশ ভরা, সতেজ পুরুষের গলায়। গাইবার আগে ফ্লুটটা একবার তুলিয়া লইয়া—কি চমৎকার সুরের কুহক সৃষ্টি করিল সে তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে! এস্‌রাজটা তুলিয়া লইয়া—কি একটা করুণ রাগিণীর নিগূঢ় পুলক ও অস্ফুট কান্নার সকল কড়ি কোমল পরদাগুলো ছুঁইয়া গেল সে তার নিপুণ, দরদী করে! যারা শুনিতেছিল, তারা কি যেন কি একটা আবেশে সম্মোহিত হইয়া রহিল—সমরেন্দ্রও। কোথাও যেন বাদলের সাঁঝ ঘনাইয়া আসিতেছে—কদমকেতকীর ছড়ানো গন্ধে আকুল হইয়া, ভিজে হাওয়া খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—যত নিরালা, নিভৃত মন্দিরের গবাক্ষের ফাঁকে, কোন্‌খানে, রহসি বসিয়া, এই সাঁঝের বেলা, তার প্রিয়া সুবাস কাজল চুলের রাশ আজ বাঁধিতে বসিয়াছে! কোন্ নদীর তরঙ্গ-চুম্বিত বেতসবনের ধারে কে যেন দাঁড়াইয়া আছে ব্যাকুল প্রতীক্ষায়—কখন সে আসিবে রণরণ কনকন কাঁকন নিক্কণে কনক কলসীটিতে তার জল ভরিতে।

সুব্রত জাতীয় গান গাহিল না। রবিবাবুরই একখানা গান গাহিল—বোধ হয় গীতাঞ্জলির। তার পর, সে রাত্রে আর গান হইল না। সুচরিতা যখন উঠিয়া যাইল, তখন তার মুখখানাতে সেই গান থেকে ছট্‌কে আসা একটা দূর বাদল-সাঁঝের ছায়াটির লেশ লাগিয়া রহিল কি?

পঞ্চম

সুব্রতকে দুই চারিদিন থাকিয়া যাইতে হইয়াছে। এর মধ্যে তাদের একদিন চিত্রকূট দেখিতে যাবার কথা হইল। মানিকপুর হইতে যে শাখা লাইনটা বান্দা হইয়া ঝাঁসির দিকে গিয়াছে, সেই লাইনে দু'তিনটা ষ্টেশন যাইলেই চিত্রকূট। একটা প্রসিদ্ধ তীর্থ। ভারি সুন্দর প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর ভেতরে, কত যুগের বিশ্বাসী ভক্ত প্রেমিকদের পুণ্য চরণাঙ্ক বুকে ধরিয়া, এই তীর্থ প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। রামচন্দ্র বনে যাবার সময় জানকী ও লক্ষ্মণের সঙ্গে এই জায়গাটায় কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। ভরত এইখানে আসিয়াছিলেন, তাঁদের আবার অযোধ্যায় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টায়। তাঁরা ফেরেন নাই, আরও দক্ষিণে দণ্ডকারণ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন। এই চিত্রকূটের রমণীয়তা ও মহনীয়তার ব্যাখ্যানে এ দেশের পুরাণ সাহিত্য শুধু অক্লান্তবাণী কেন, অতৃপ্তবাণী হইয়াই রহিয়াছেন। বিশ্বাসী ও প্রেমিকের চোখে এর পবিত্রতা ও পাবকতা—এর চমৎকারিতা ও রমণীয়তার তুল্য। যখন তখন যাত্রীদের সমাগম হইয়া থাকে। পরব উপলক্ষ্যে ত' কথাই নেই। যাঁরা টুরিষ্টের চোখ লইয়া আসেন, তাঁদের সম্ভবতঃ পবিত্রতা পাবকতার সংস্কারের তেমন বালাই নেই। কিন্তু তাঁরাও নিশ্চয় এই তীর্থের, আর চারধারকার গিরিশ্রেণি-বলয়িত রম্যবনাস্তরণের চমৎকারিতা ও রমণীয়তাটি উপভোগ করিয়া ফেরেন। আমরা আজ টুরিষ্টের ক্যামেরা লইয়া বাহির হই নাই। এ জায়গাটার নানান্ সুন্দর সুন্দর দেখার জিনিষের ফোটো তুলিয়া লইয়া সব বাইকার সাম্‌নে ধরিতে চেষ্টা করিব না। ভ্রমণকাহিনী অপরে লিখিয়াছেন বা লিখিবেন।

সমরেন্দ্র, সুচরিতা, সুব্রত, সুপ্রিয়—এই চারজনের পার্টি। গৃহিণীর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু স্বামীকে ছাড়িয়া আসিতে শেষ পর্য্যন্ত মত করেন নাই। সঙ্গে অবশ্য চাকর বাকর ছিল। দুটো ছোট ছোট টেণ্ট, বন্দুক ও কুকুরও সঙ্গে ছিল। সমরেন্দ্র বাংলামুলুকে যে অঞ্চলে ডেপুটিগিরি করিত, সেখানে শিকারের সখ কদাচিৎ দু'একটা পাখী মারিয়াই মিটাইতে হইত। কিন্তু সখটা তাই বলিয়া তার কম ছিল না। আর, ভাল শিকারীর একটা প্রচ্ছন্ন অভিমান বোধ হয় তার সখটার চাইতেও বড় ছিল। আজ এই মধ্য ভারতের আদিম বনানী তার প্রচ্ছন্ন অভিমানটাকে সচেতন করিয়া দিয়াছে কি? যে আদিম নিটোল পৃথুকলেবরা অরণ্যানীর আহ্বানে লাট-বেলাট্ যখন তখন ছুটিয়া আসেন—যে আদিম অরণ্যানী অঞ্চলের আদিম রাজন্যবর্গকে সেই শিকারী-বর-বেশ-সজ্জিত রাজপুরুষপুঙ্গবদের অভ্যর্থনায় কন্যা-সম্প্রদানের উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়—সে অরণ্যানীর আহ্বানে বাংলামুলুকের উদীয়মান রাজপুরুষরবি সমরেন্দ্র সাড়া দেবেন না, এমন কি হয়? তবে, বরবেশী কোন গৌরাঙ্গ-শিকারীর বরযাত্রী হইয়া বরানুগমন করিতে পাইলেই তার অন্তরতম কামনার চরিতার্থতা বোধ হয় হইত। নিজেই বরসাজে তাকে আজ যাইতে হইতেছে! তার অভ্যর্থনার জন্য কোনও এক ছোট খাট দেশীয় ষ্টেটের বিশিষ্ট-অতিথি-সৎকারের মহোৎসব আসরে "সাজ সাজ" পড়িয়া আবার সম্ভাবনা ত' কৈ দেখা যাইতেছে না। মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ তার করিতে লাগিল। আর বরানু-গমনের ঘটাটাও তাকে সান্ত্বনা দিতে পারিল না! সুচরিতা অবশ্য —কি প্রণয়-প্রসঙ্গে, কি মৃগয়াব্যসনে—সর্ব্বত্রই একটা "এ্যাকুইজিসন্"। কিন্তু ঐ দুটো খদ্দরপরা নিরিমিষ লোক—আরে ছ্যাঃ! সঙ্গে দুটো উড়ে বেহারার পানে কটাক্ষপাত করার সময়ও তার শিকারীর আসন্ন বিজয়

গৌরবটাও যেন নাসিকার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্কুচিত হইতেছিল। তবে, টেণ্ট্ দুটো, বন্দুকটা আর কুকুর—এ কয়টাই ছিল তার এ শিকার-যাত্রা-পর্ব্বের মসী-মলিন মেঘের মুড়োয় রূপোলি পা'ড়। সায়েবসুবো থাকিলে এ সরঞ্জাম দেখিয়া খুসী হইত।

ষ্টেশন থেকে একটা লরি রিজার্ভ করিয়া চিত্রকূট যাওয়া হইল। লরিটিও বোধ হয় এই পুণ্য তীর্থে পথের রজে অন্ততঃ দ্বাদশবর্ষব্যাপী অক্লান্ত পরিক্রমা করিয়াছেন। নৈলে—গৈরিক-তিলক-চর্চ্চিত, মলিন-বহির্ব্বাসা এক জরদ্‌গব রামায়ত সাধুর চেহারা হইল কি করিয়া তার? লরিটির সর্ব্বাঙ্গে গৈরিক কর্দ্দমের শৃঙ্গার-তিলক? তীর্থরজের বিভূতি অঙ্গে মাখিয়া স্বাভাবিক-বর্ণ-চোরা হইয়াছেন—অন্তঃরুক্ষ বহির্ধূসর হইয়াছেন। বসার সিট্‌গুলোর আদিম আস্তরণ অনেকদিন বিদীর্ণ হইয়া তার কুক্ষিস্থিত সামগ্রীতে ছোট-বড়-মধ্যম সর্ব্ববিধ তাম্রকূট-সেবী তীর্থযাত্রীদের কলিকার অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়া আসিয়াছে। অধুনা অন্তঃসারশূন্য সে, জীর্ণ শতধা ছিন্ন কন্থারই মত বাবাজীর জীর্ণ অস্থি-পঞ্জরে কায়ক্লেশে লাগিয়া আছে। শুধু তাই নয়—শেষ বয়সে সেও সর্ব্বভূতহিতায় আত্ম-নিয়োগ করিয়াছে বোধ হয়। সাধুসংসর্গের এমনি গুণ! ব্রতটা তার এমন গুরুতর মারাত্মক একটা কিছু নয়—খট্টমলখিলানো ব্রত। যাত্রীকে ট্যাঁকের সিকি আধুলি দক্ষিণা বাহির করিয়া দিয়া তার সেই নিষ্কাম, পরমপুণ্যপ্রদায়ক খট্টমলখিলানো ব্রত উদ্‌যাপনে সাহায্য করিতে হয়। লরির হর্‌ণ অনেক দিন হইল "শিঙ্গা ফুঁকিয়া" মৌনী হইয়াছেন। ড্রাইভার্ এবং সহকারীর শ্লীলতা-সম্বন্ধে বেপরওয়া সার্দ্ধ-তিন-গ্রামে লীলায়িত কণ্ঠনির্ঘোষই শিঙ্গার এক্‌টিনি করিয়া যাইতেছেন! এক্‌টিনির ফলে অন্য দুর্ঘটনা নাই ঘটুক, টাঙ্গা-ওয়ালা, বয়েল-ভৈঁস-গাড়ী-ওয়ালা এবং পায়দল যাত্রীদের সঙ্গে প্রায়শঃ

দস্তুরমত ভদ্রোচিত বাগ্‌যুদ্ধ, এবং কদাচিৎ নিতান্ত স্থূলোচিত বাহু-যুদ্ধ দণ্ডযুদ্ধও বাধিয়া যাইত। ফলে, টাইমের কোনই তাগিদ রহিত না। অধিকন্তু, লরি যানটির পুঞ্জীভূত জরাজীর্ণতা যেখানে সেখানে—বিশেষ, ষ্টেশনে গাড়ী ইন্ হবার ওয়ার্ণিং ঘণ্টা যখন শ্রুত হইয়াছে—তার বাতব্যাধির পঙ্গুতাকে এতটা অবাধ্য ও অসাধ্য করিয়া হাজির করিত যে, আরোহীদিগকে লটবহর সমেত "খেয়ার কড়ি দিয়া ডুবিয়া পার" হইতেও দেখা যাইত। অবশ্য সেটা "দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ" ভাবে নয়। সেটা যেন সারাটা পথ গুণ টানিয়া নৌকায় করিয়া আসারই মত।

বলা বাহুল্য, এই লরি যানটির জঠরে আধ ঘণ্টা খানেকের জন্য স্থিতি কেবল মিঃ সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জির কেন, সুপ্রিয় সুব্রতর কাছেও, তেমন সুভোগ্য হয় নাই। খট্টমলখিলানো ব্রতে যতখানি স্থিতধী, এবং ততোধিক স্থিতদেহ, হইয়া পুণ্যার্জ্জন করিতে হয়, ততখানি স্থিতধী, স্থিত-দেহ হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। তবু অভিজ্ঞতার এই প্রায়-অতিষ্ঠ-করিয়া-তোলা অভিনবতাটুকুই সুচরিতা, সুপ্রিয় ও সুব্রতর পক্ষে কম আমোদের হয় নাই। মাঝে মাঝে তারা হাসিয়াও লইতেছিল। বাস্‌টার একটা বেমক্কা ঝাকুনিতে যখন তাদের মেরুদণ্ডের মূলাধার-চক্রে কুল-কুণ্ডলিনীরও ঘুম ভাঙ্গার লক্ষণ দেখা গিয়া-ছিল, তখন, সুচরিতা তার আসন্ন পতনটাকে কোন গতিকে সাম্‌লাইয়া লইয়া বলিয়াছিল—বাসের নামটা আর শুধু বাস্ রাখ্‌লে চল্‌বে না। দ্বিত্ব বিধান ক'রে 'বাসরে বাস্' না কর্‌লে আর মানাচ্ছে না। আর, তখন সমরেন্দ্রকেও তার মেজেয় পতিত "ক্রেষ্টফলন্" হ্যাটটা তুলিয়া ঝাড়িতে ঝাড়িতে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—"হ্যাঁ, সুচরিতার বাসের ঐ নূতন নামকরণটা সঙ্গতই হইয়াছে।" তার কিন্তু হাসির চাইতে

রাগটাই বেশী পাইতেছিল। তার হাকিমি মন উসখুস করিতেছিল—এরকমধারা স্থবির, অকর্ম্মণ্য, জঘন্য লরিগুলোর "লাইসেন" বাতিল করিয়া দেবার উপায় উদ্ভাবনে। এ অঞ্চলটা তার জুরিস্‌ডিক্‌সনের বাইরে হওয়াতেই যত গোল বাধিয়াছে। "লাইসেন" নাকচ করা ছাড়া, লরি-ড্রাইভার এবং লরি-মালিকের পৃষ্ঠযুগলের জন্য অন্য কোনরূপ সুমিষ্ট, মোলায়েম একটা কিছুর বেশ বার কতক মর্ম্মস্পর্শী অভ্যঙ্গের কল্পনাও তার সেই ডেপুটি মনের খাস কামরায় উঁকিঝুঁকি মারিতেছিল কিনা, তা সে কামরার পরদার বাইরে দাঁড়াইয়া আমরা বাজে লোক কেমন করিয়া বলিব? ফল কথা, সমরেন্দ্রের পক্ষে সে বাস্ জার্ণিটুকু আমোদের হয় নাই। আরামের হয় নি সেটা কাহারও।

"ভরত রাম-লক্ষ্মণ-সীতাকে ফিরুতে এসে তাঁর রথটাকে আর বুঝি অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যান্‌নি। শ্রীরামের পাদুকাযুগল মাথায় ক'রে তিনি আর রথে চেপে যান্‌নি নিশ্চয়। রথখানাকে রেখেই গেছ্‌লেন। আজ তিন যুগ ধ'রে যতসব যাত্রী সেই রথে ক'রেই তাদের তীর্থ-দর্শনের পুণ্য সঞ্চয় ক'রে আস্‌ছে। আমরা পুণ্য সঞ্চয় কর্‌তে চ'লেছি, কি শিকার সঞ্চয়, কি শুধু আক্কেল-সঞ্চয় কর্‌তেই চ'লেছি, তা' জানিনে। তবে, আমাদের ভাগ্যেও সেই সেই মান্ধাতা-আমলের রথখানাই জুটে গেছে দেখ্‌ছি।"—সুচরিতা কথায় কথায় একবার বলিল। লরিখানা অবশ্য সহজে তার এই বিংশ শতাব্দীতে জন্ম-কোষ্ঠী-পত্র খানায় বেদখল হইতে চাহিবে না। তার জীর্ণ কলেবর সত্ত্বেও তাকে বেয়ারিং পোষ্টে সরাসরি মান্ধাতার আমলে পাঠাইয়া দেওয়া হয়ত' চলিবে না। কিন্তু যে দু'চার খানা টাঙ্গা ও এক্কা পথে চলিতেছে, তাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, অন্ততঃ তিন যুগের বয়েস তারা যে ধরিয়াছে, এবং তিন যুগের যত তীর্থযাত্রীর যাবতীয় কলুষ-মালিন্য তারা নিজ অঙ্গে বরণ করিয়া

লইয়া তাদের সব শুদ্ধ-শুচি হবার উপায় করিয়া দিয়াছে, এ পক্ষে কোনই সন্দেহ করা চলে না।

সুচরিতার মন্তব্যটা শুনিয়া হাসিল সকলেই। এমন কি, সমরেন্দ্রও। সুব্রতর হাসির পেছনে গাম্ভীর্য্যের একটা ফল্গুধারা বহিয়া যাইতেছিল কি? সে গাম্ভীর্য্য পূর্ব্বরাগের কোন একটা রসের ভেতরে ফেলিতে আমরা ব্যস্ত নই। সম্ভবতঃ সেটা তা নয়ও। তার ভেতরে ভেতরে চিন্তার আর একটা ধারা চলিতেছিল। সে যে নিয়ম করিয়া, সঙ্কল্প করিয়া, "দিনখ্যান" দেখাইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইয়াছে, এমন নয়। একটা নূতন যায়গা—সেটার প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক এই দুই রকমের (Background) আধারপটই মর্ম্মস্পর্শীরূপে সুন্দর—সেটা দেখার—সুচরিতার ও সুপ্রিয়র সঙ্গে দেখার—লোভেই সে আসিয়াছে। কিন্তু কি জানি যেন, বুঝিবা স্থানমাহাত্ম্যেরই সেগুলো সূক্ষ্ম, রহস্য প্রভাব-রশ্মি, সে গুলো, আলট্রা ভাওলেট্ রেজ্ গুলোরই মতন, তার প্রাণের গভীর মর্ম্ম-অনুভূতির কোষগুলোতে, একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করিতেছিল—যে উত্তেজনা শান্ত কিন্তু দুর্ব্বল নয়, অস্পষ্ট কিন্তু আভাস-মাত্র নয়।

টাঙ্গা এক্কাতে নয়, পায়দল নয়, লরিতে চাপিয়া যাইতেই তারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিতেছিল। কিন্তু যুগ যুগ ধরিয়া আকুমারিকা-হিমাচল ভারতের, দ্বারাবতী হইতে কামাখ্যা চন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বিস্তৃত মহাদেশের, যে সমস্ত গণনাতীত বালকবৃদ্ধ নরনারী তীর্থযাত্রী আপ্রাণ-তিতিক্ষা ও অধ্যবসায়ের পুঁজিটি সম্বল করিয়া, কত বড় একটা অলৌকিকে বিশ্বাস ও প্রেমে বুক বাঁধিয়া, কত বড় এতটা অনৈহিকে আশা ও ভরসায় উৎসাহিত হইয়া, নানাদিক্ হইতে প্রধাবিত এই বিরাট পুণ্যক্ষেত্রের দীর্ঘ-বন্ধুর পথগুলিতে হাঁটিয়া চলিয়াছে,—পায়ে অথবা কদাচিৎ যানে—;

দিনের পর দিন পুঞ্জীকৃত পথশ্রম, নিত্য অতৃপ্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা, অনাচ্ছাদিত শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা-বাদল, অনিবার্য্য দস্যু-শ্বাপদভয়, অচিকিৎসিত রোগ পীড়া, এমন কি, আসন্ন নিঃসঙ্গ মরণও, যাদের মাসবর্ষ-ব্যাপী পথ-চলার পথে বাধা তুলিয়া দিতে পারে নাই—; অন্তরের সকল বিশ্বাস, সকল নিষ্ঠা, সকল শক্তি দিয়া যারা নিজেদের সঙ্কল্পের গায় একটা অটুট, অক্ষয় বর্ম্ম রচনা ক'রিয়া লইয়া তীর্থযাত্রার কৃচ্ছ্র ব্রত পালিয়া চলিয়াছে ;—দীর্ঘ পথ চলার প্রায় শেষ পদবীতে উপনীত হইয়া নিকট অভীষ্ট সিদ্ধির সমুচ্চ পুণ্য পতাকাটি প্রথম দেখিতে পাইয়া যারা একটা বিপুল পুলকের ব্যথায় কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়াছে, প্রত্যক্ষগোচর দেবতার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে লুটাইয়াছে ;—তারা—ভারতের সেই যুগ যুগান্তরের যত অশ্রুত, অবিদিত, অখ্যাত তীর্থযাত্রী—তারা খট্‌মল-খিলানোয় কোন দিনত' ভ্রূক্ষেপ করে নাই, ধূলো ময়লা মাছি মশা দেখিয়া ত' কোন দিন অসহিষ্ণু হইয়া উঠে নাই !

যে দেশে বিনা বিজ্ঞাপনে, বিনা সভা সমিতিতে, এক একটা কুম্ভ-মেলায় হাড়ভাঙ্গা শীতে ফাঁকা ময়দানে লক্ষ লক্ষ নর নারী আসিয়া উপস্থিত হয়—আর যোগস্নানের সময় ভিড়ে দু' একশ' পায়ের তলায় নিশ্চিত চাপা পড়িয়া মারা যাবার জন্তও আগ্রহে অগ্রসর হয় ;—মহামারীতেও সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ ;—যে দেশে বদরীনাথ, কেদারনাথ, মানসসরোবর কৈলাস, অমরনাথ দর্শনযাত্রী স্থবিরা নারীদেরও কৃচ্ছ্রাদপিকৃচ্ছ্র-পালন-কাহিনীর তুলনা নেই বলিলেই হয় ;—সে দেশ আর সে বস্তুর কাঙাল হইয়া থাকুক্ না কেন, নিষ্ঠার, তিতিক্ষার, বিশ্বাসের, সাহসের কাঙাল এখনও সে হয় নাই। সে নিষ্ঠা, সে তিতিক্ষা, সে বিশ্বাস, সে সাহস আজ, এদিনে নূতন কোন কোন দিকেও মোড় ফিরিলে হয়ত' ভালই হয়। কিন্তু মোড় তাদের এতদিন যে দিকেই ফিরিয়া থাকুক, অথবা যেদিকে ফেরা

আজ উচিত হইয়া উঠ ক্—এটা নিশ্চিত যে, শক্তির সেটা মূল উৎস, সেটা এদেশে মোটেই রিক্ত হইয়া নাই, নিঃশেষ হইয়া নাই! পশ্চিমের বড় বড় মুভ্‌মেণ্টগুলোর পেছনে শক্তির যে সব গর্জ্জায়মান ফেনিল রঙ্গিন উৎস, তারা কি এই প্রাচীন তপস্যানিরত দেশের গভীর, সুস্থির, স্বচ্ছ উৎসগুলোর চাইতে ঢের বেশী শক্তিতে সমৃদ্ধ? আজ সেই নীরব উৎস-গুলোর মুখে পাথর চাপা দিয়া কি আমাদের অন্যত্র "বোরিং" করিয়া দেখিতে হইবে—এদেশে কোথাও পশ্চিমের ফোয়ারাগুলোর মতন জাঁকালো জমকালো ফোয়ারা দু'একটা বাহির হয় কি না?

সুব্রত বাসে চলিতে চলিতে চিত্রকূটের বিচিত্রিত কূটটার পানে তাকাইয়া বোধ হয় অনেকটা এইরকম ভাবনায় আন্‌মনা হইয়া পড়িতে-ছিল। তাদের এই "ট্রিপ্"টায় চটুল হাস্যরসের চাইতে একটা অদ্ভুত ও চমৎকার রসের আস্বাদ সে বেশী পাইতেছিল। অবশ্য নিজের মনের অন্দরে বসিয়াই। নিজের ভাব অথবা রুচি লইয়া অপরের ঘাড়ে চড়াও হইতে যাওয়া সে পছন্দ করিত না। এই জন্য সমরদের পার্টিতেও সে মোটেই নিজেকে অসহনীয় করিয়া তোলে নাই।

চারধারে পর্ব্বতশ্রেণীর মেখলা অবশ্য রহিয়াছে; কিন্তু যেখানটায় চিত্রকূট পর্ব্বত দাঁড়াইয়া, সেখানটায় নিকটে আর কোন পাহাড়পর্ব্বত নেই। একটা প্রশস্ত কাননভূমির মধ্যে একটাই বিশাল মন্দির যেন তার চূড়ায় আকাশের নীলিমাকে স্পর্শ করিবে বলিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। পাহাড়ের গায় নগ্নতা নেই। গাছপালা ঘন হইয়া রহিয়াছে। ভারতের তীর্থগুলির পীঠস্থান কোন্ সুদূর অতীত কালের নৈমিষারণ্যের ঋষিকুল বাছিয়া বাছিয়া করিয়াছিলেন, জানি না। আধ্যাত্মিক মহিমার কথা বলিতেছি না। তাদের নৈসর্গিক সংস্থানে যে একটা অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে,তা সুব্রত কেন, সমরেন্দ্রের মতন ব্যক্তিকেও

স্বীকার করিতে হইয়াছিল। যেখান যেখানটায় গিয়া দাঁড়াইলে মানুষের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সৌষ্ঠববোধ ও গভীরতম সৌন্দর্য্যানুভূতি—"বাঃ চমৎকার" বলিয়া থম্‌কিয়া যাইবে, সেই সেই খানেই ভারতের বড় বড় তীর্থগুলির সংস্থান পরিকল্পিত হইয়াছে দেখি। সাগরের বেলায় সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কোণারক, পুরী, দ্বারকা; হিমবানের উচ্চ বা নিম্ন উপত্যকাগুলিতে হরিদ্বার, কনখল, বদরীনাথ, কেদারনাথ, পশুপতিনাথ; চারি ধারে তুঙ্গ তুষারপ্রাচীরের মাঝ খানে অমরনাথ, মানসসরোবর, কৈলাস; প্রশস্ত পুণ্য নদীতটে কাশী, গয়া, অযোধ্যা;—কোন্ দিকে তাকাইবে, কত নাম করিবে?—প্রত্যেকটিরই নৈসর্গিক সংস্থান অপূর্ব্ব, অতুলনীয়। চিত্রকূটের কাছে আসিয়া সকলকেই স্বীকার করিতে হইল—সেকেলে রামসীতার পছন্দটা ভালই ছিল—তাঁরা চমৎকারের সেরা চমৎকার যায়গাটা বাছিয়াই আপনাদের বনবাসের প্রথম আড্ডাটি গাড়িয়াছিলেন। আজকালকার বিশ্বভুবনে সর্ব্বত্র অবাধ-গতি যাযাবর টুরিষ্টরাও রামজীর পছন্দের তারিফ না করিয়া পারিবেন না।

ভ্রমণবৃত্তান্তই বুঝিবা হইয়া পড়িতেছে! নভেলের নায়কনায়িকাদের এসব অঞ্চলে টানিয়া আনিলেই, নভেলের এক আধটা চ্যাপ্‌টার ভ্রমণ-কাহিনীর ধাঁজে তৈরী বোধ হয় না হইয়া যায় না। না টানিয়া আনিয়াও উপায় ছিল কৈ? আর, এই যায়গাতেই বুঝিবা তাদের পরস্পরের সঙ্গে সত্যকার পরিচয়ের সূচনা হইবে। যাই হোক্—চিত্রকূট পর্ব্বতের ঠিক পাদমূলে নয়, তার গায়েও নয়, একটু দূরে ফাঁকা একটা যায়গায় সমরেন্দ্রদের তাঁবু পড়িল। একটা ছিল ছোট তাঁবু, সেটা সুচরিতার জন্য; আর একটা বড়, তাতে তারা তিন জনে। পাকশাকের একটা বন্দোবস্তও ছিল। চাকর বাকররা অদূরে পল্লীর ভেতরেই ডেরা পাইল। রেলওয়ে ষ্টেশন হইতেই পাণ্ডা-বিশেষের জনৈক ছড়িদার এতটা

নির্ব্বিকায় অধ্যবসায়ের সহিত তাদের পার্টির সঙ্গ নিয়াছিল যে, সঙ্গের সারমেয়যুগলকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল—তাদের স্বজন্মের নেক্‌সট্‌ প্রোমোশন্‌টা হয়ত' হইবে, ঐ নাছোড়বান্দা শাশ্বত-নির্ব্বিকার সমমানাবমান তীর্থ-কিঙ্কর-জন্মের মতন কোন এক জন্মেই ; আর, তখনই তাদের প্রতিপালক-নিষ্ঠা তার পরাকাষ্ঠা লাভ করিবে। তাদের ত' সত্যকার প্রতিপালক-নিষ্ঠা; কিন্তু ছড়িদারের যে প্রায়শঃ বকাণ্ড-প্রত্যাশা-নিষ্ঠা! সমরেন্দ্র তার বাটারফ্লাই গোঁফের পার্শ্বে বঙ্কিম ঠামে অবস্থিত সিগারেটটিকে আদৌ স্থানচ্যুত ও বৃত্তিচ্যুত না করিয়াই ছড়িদারটির সঙ্গে যে শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দে আলাপচারী করিয়াছিল, তাতে যে কোন রক্তমাংসের দেহের, শুধু ধৈর্য্যচ্যুতি কেন, প্লীহারও স্বস্থান-চ্যুতির সম্পূর্ণ আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ডেপুটি-শার্দ্দূলের সেই অব্যক্ত, অবোধ্য "লো.গ্রাউল"টি থামিলে দেখা গেল, ছড়িদারটি যে শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত-টাকে বেমালুম স্রগ্ধরায় পরিণত করিয়াছেন। এবিষয়ে তাঁর অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়া কারুর এমনও মনে হইতে পারে—শুধু মুখের বচন কেন, হরসুহইপও তাঁর শ্রীঅঙ্গে বর্ষিত হইলে, সেটাকে তিনি "লগতু লগতু মম কণ্ঠে মঞ্জুমন্দারমালা" বলিয়া সহাস্যে বরণ করিয়া লইবেন। এতটা "তৃণাদপি সুনীচঃ তরোরপি সহিষ্ণুঃ" না হইলে কি তীর্থকিঙ্কর-জন্মের সৌভাগ্য-লাভ হয় ?

তা হ'ক বকাণ্ডপ্রত্যাশী, নাছোড়বান্দা—কাজ পাওয়া যায় তাদের দিয়ে। শুধু গাইডের কাজটি নয়—আবশ্যকমত নাগাদ জুতো সেলাই থেকে ইস্তক চণ্ডীপাঠ পর্য্যন্ত। একবার হৃষীকেশ হইতে লছমনঝোলা দেখিতে যাবার পুণ্যসঙ্কল্পের গুরুভারে অতিসমৃদ্ধ কেডস্‌-যুগল-লাঞ্ছিত-চরণ কোন এক সুপরিচিত পরমাত্মীয় বপু স্বল্পতোয়া পার্ব্বত্যতটিনী-তরণের ব্যপদেশে এবম্বিধ এক ছড়িদারসত্তমের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তদীয়

উৎসঙ্গটিকে পারের তরীরূপে পরিকল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

আজও সুচরিতা বায়না করিয়াছে—সেই রাঁধিবে। পাণ্ডার অনুচরটি একটা ঠিকা পরিচারিকা আনিয়া দিল। নামটা বোধ হয়—সুখদেয়ী। কার্য্যকালে, সুখদেয়ী কিন্তু দুখদেয়ীও হইয়াছিল। সে রামপিয়ারীর মুলুকে "রামপড়ওল" (ভিণ্ডি) ছাড়া অন্য কোন রকম শাক্‌সব্‌জি প্রসাধনে কাকেও তাদৃশ নিপুণ দেখা গেল না। সুখদেয়ীর হাতে আলু ত' কবুল জবাব দিল—সে তার ত্বকের ভাইটামিন্‌টা আজ কিছুতেই নষ্ট হইতে দেবে না! "রামরস" (নিমক) বুঁকিতে কোনও মারাত্মক গোল হইল না বটে; কিন্তু মঁসলাগুলো সে তীর্থস্থানে তীর্থরজঃ ও তীর্থকঙ্করের সৎসঙ্গেই পিষ্ট মর্দ্দিত হইবে, কিন্তু সে সঙ্গটি তারা কিছুতেই ছাড়িবে না। রাম পিয়ারীর মুলুকে "রামপড়ওল", "রামরসের" ত' দুঃখ নেই দেখা গেল। কিন্তু রামনাম-পূর্ব্ব বিহঙ্গবিশেষের সাক্ষাৎ মিলিলে বড় ভাল হইত—নিদেন, তাজা গোটাকতক তার "নিরামিষ" ডিম্ব মিলিলেও একরূপ চলিত। সমরেন্দ্রের মনে এই মর্ম্মান্তিক আপশোষটাই জাগিতেছিল কি? একটা কিছু "ওয়াইল্ড গেম" না হইলে পিক্‌নিক্‌-যজ্ঞে যে পূর্ণাহুতিটিই হবে না। আজ এ যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর সে; তাকে এ আবশ্যক অঙ্গহানি অবশ্যই মনে মনে উত্ত্যক্ত করিয়াছিল।

ছড়িদারটির মুখে এও প্রকাশ পাইল যে, ও অঞ্চলে জীবহিংসাও নাকি নিষিদ্ধ। সর্ব্বনাশ! তার শিকারযাত্রায় সে দেশের বিধানব্যবস্থা সাধক না লইয়া বাধক হবার স্পর্দ্ধা করিল! সাধারণে বিধানের যে রাস্তা দিয়া চলে, তার মত রাজপুরুষকেও সব্বাইকার সঙ্গে ঘাড় ঘসিতে ঘসিতে সেই রাস্তা দিয়াই চলিতে হইবে! "কন্‌টেম্পট্‌ অফ্‌ কোর্ট", "গিভিং অবস্‌ট্রাক্‌সন্‌ টু লফুল্‌ অথরিটি"—পেনাল

কোডের সকল ব্রহ্মাস্ত্রই কি তার রাজকীয় তূণে আজ অকর্ম্মণ্য হইয়াই রহিবে? কোন্ দিকে যোগিনী করিয়া সে শিকারযাত্রায় বাহির হইয়াছিল, প্রকাশ নেই। কিন্তু রামপিয়ারী, রামপদারত আর রামপড়ওল এর দেশে আসিয়া তার যে মূল আয়োজনটাই নির্ম্মূল হইয়া গেল! এরই নাম কি রাম আক্কেল? বন্দুক, শিকারী কুকুর যে কোন কাজেই লাগিল না তার! যাক্—ঢেউ দেখিয়া নাও ডুবাইবার প্রয়োজন নেই। দেখাই যাক্ না কেন—এ শিকার যাত্রার শ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়! পৃথ্বী বিপুলা, কালও নিরবধি বটে! মাভৈঃ!

বন্যবরাহ, বন্যকুক্কুট—এ সবের প্রাণপাত পরিচর্য্যায় মৃগয়াশ্রম অপনোদনের সৌভাগ্য হইল না বটে, কিন্তু বিশ্বনরে অবস্থিত পাচকাগ্নিকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, চিত্রকূটপর্ব্বতের প্রান্তভূমিতে অবস্থিত ঐ দুইটা শিবিরে সেদিন তাঁকে অর্দ্ধ-উপবাসী থাকিতে হয় নাই। চিত্রকূটপর্ব্বতের কটিদেশে মেখলার মত বেষ্টন করিয়া সে পরিক্রমা পথটি রহিয়াছে, আমাদের পার্টির সঙ্গে সঙ্গে সে পথ পরিক্রমার রিপোর্ট আজ আর আমরা দাখিল করিব না। সুন্দর সুন্দর মন্দির, পীঠ, আশ্রম আছে সেই পথের ধারে অনেকগুলি। বছরে যতগুলো দিন আছে, ততগুলো নাকি? তীর্থযাত্রীকে বুঝিবা ভাবিয়া লইতে হয়—এ পরিক্রমা একটা দিনের ত' নয়; এযে দিনের-পর-দিন-ব্যাপী জীবনেরই পরিক্রমা! তিন শ' ষাট দিনে একটা পাক ঘুরিয়া আসা যায়, কিন্তু পাকের ত' অন্ত নেই! প্রতিদিনের পথ চলায়, জীবনের যেটি শ্রেষ্ঠ রমণীয়, নিরতিশয় সুন্দর বস্তু, সেইটাকে নানান্ রূপে,নানান্ ভাবে আস্বাদ উপভোগ করিয়া চলিতে হয়! এই নানান্ আস্বাদ ও পরিচয়ের মধ্যে প্রাণ-মনোমদ, নয়নাভিরাম রসঘনমূর্ত্তি রামকে চিনিতে পারিলে, পরিক্রমার চরম ফলটি লাভ হয়। সকল তীর্থেরই বাইরের কতকগুলো ব্যাপারের মধ্যে একটা

অন্তরঙ্গ পরিচয়ের সঙ্কেত দেওয়া আছে! সঙ্কেতটি যেজন ধরিতে পারেন, তাঁরই তীর্থযাত্রার 'ষোল আনা' ফল।

ছড়িদারটির তিনশ' ঘাটের কথা শুনিয়া সুব্রতর ভাবুকতার উপর ঐরকম ধারা একটা অন্তরঙ্গ অনুভূতির আলোকরেখাপাত হইয়াছিল, মনে হয়। সমরেন্দ্র, সুচরিতা ও সুপ্রিয় অবশ্য সে স্থানগুলোর প্রাকৃতিক রমণীয়তা অনুভব না করিয়া পারে নাই। পাহাড়টার ঐ গোলাকার পথটা যেন প্রত্যেক পয়েণ্টেই এক একটা নূতন, সুন্দর ছবির জন্য ক্যামেরার মুখ পাতিয়া রাখিয়াছে। বড় পাহাড়টা রামজীর নিজের, পাশে লছমন জীউরও একটা ছোট পাহাড় আছে। মাঝে মাঝে পরিক্রমাপথে দেখা গেল—দু'একটি নিটোলাঙ্গী পৃথুজঘনা মধ্যদেশিনী পরশুহস্তা পুরুষ-বিবর্জ্জিতা চলিয়াছেন। ভর্ত্তৃশতকে বুঝি পড়িয়াছিলাম—"মাতুঃ কেবলং যৌবনবনচ্ছেদে কুঠারা বয়ম্"। এঁদের হস্তের কুঠার কোন্ বনচ্ছেদে প্রযুক্ত হইতে চলিয়াছে, কে জানে? আমাদের সেই সৌখীনা বঙ্গ-কুমারীকে স্বীকার করিতে হইয়াছিল—এ দেশের মাটিতে শুধু যে হ্যাণ্ড-ফ্যান্-স্মেলিংসল্ট-শোভিত-কর-চম্পকা নবনীত-পুত্তলিকাগুলিই গজাইয়াছে এমন নয়, পরশু-পট্টিশ-হস্তা, প্রগল্‌ভ-পুরুষ-মহিষ-বিমর্দ্দিনী "আমেজন" গুলিও দিব্য গজাইয়াছে। অন্ততঃ বৈচিত্র্যের দিক্ দিয়ে—"এমন দেশটি কোথাও গেলে পাবে নাক' তুমি"।

তবে, এসব নজরে পড়ার চাইতে তা'দের তিন জনের বেশী করিয়া নজরে পড়িতেছিল—ঐ সব তীর্থরক্ষীদের পুণ্যের পণ্য-বিপণিগুলি। রামসীতা নানান্ নামে, নানান্ রূপে বাহ্যতঃ বিরাজ করিতেছেন সন্দেহ নেই; কিন্তু কার্য্যতঃ যে দেবতাটির অর্চ্চনা প্রায় সর্ব্বত্রই কায়মনোবাক্যে চলিতেছে, সে দেবতার নাম—পয়সা। বিপণিদারেরা নিক্তি ধরিয়া যাত্রীদের পুণ্য প্রসাদ মাপিয়া দিতেছেন। শঙ্খধ্বনি, ঘণ্টাধ্বনি,

আশীর্ব্বচন, প্রসাদনির্ম্মাল্য-বিতরণ—সমস্তই উচিত মূল্যের অনুপাতেই হইতেছে। উচিত মূল্য না পড়িলে, ক্রেতাদের অপমান, লাঞ্ছনাও যে একটু আধটু না পোহাইতে হইতেছে, এমন নয়। এই এক্জিবিশনটি দেখিয়া বিদ্রূপের হাসিতে সমরেন্দ্রদের অধরোষ্ঠ-কোণ যতটা কুঞ্চিত হইয়াছিল, একটা বীভৎসতা, কদর্য্যতার গন্ধে তাদের নাসাও ততটা কুঞ্চিত হইয়াছিল বৈকি! পারত্রিক পুণ্য প্রসাদ পাইবার দোকানগুলোর এইরকম ধারা "ইতরোমি", আর ঐহিক চর্ব্ব্য-চুষ্যাদি প্রসাদ পাইবার দোকানগুলোর "নোংরামি"—এই দুই-ই তাদের নব্যমার্জ্জিত সুরুচি-সৌষ্ঠববোধে আঘাত করিয়াছিল বৈকি! সুব্রতর—কেবল সুব্রতরই বোধ হয় মনে হইতেছিল—চাঁদের ঝক্ঝকে একটা পিঠই আমরা দেখিলেও, তার আর একটা পিঠও যেমনধারা নিশ্চয়ই আছে, তেমনি এই দশভুজা-প্রতিমার দরমা-দড়ি-খড়-কাবারি দিয়ে তৈরী পেছনটা আমরা আজ দেখিলেও, তার একটা সাম্নের দিক্ও নিশ্চয়ই আছে। আর, সে সাম্নের দিক্টা সুন্দর হইলেও হইতে পারে। পুরী জগন্নাথ-মন্দিরের গায়ে জঘন্য ছবিগুলোর প্রত্নতত্ত্ব যাই হোক্, সেগুলোর উদ্দেশ্য সম্ভবতঃ শ্রীমন্দির প্রবেশার্থী ও প্রবেশার্থিনীদের একটা প্রাথমিক টেষ্ট-পরীক্ষা করিয়া লওয়ানো। উদ্দেশ্যের হয়ত' আজ কোনই স্পষ্ট উদ্দেশ পাওয়া যাইতেছে না; কিন্তু উদ্দেশ্যটা বোধ হয় উহাই। সব তীর্থস্থানেই পুণ্যপীঠ-স্থানগুলিতে জঘন্য ও কদর্য্য একটা কিছু, বীভৎস ও বিসদৃশ একটা কিছু, দোকান পাতিয়া বসিয়া আছে, দেখি। যারা সব বিক্রেতা, তারা অনেক স্থলেই অভদ্র, নিষ্ঠুর, লোভী। কিন্তু তাদের সেই অভদ্রতা নিষ্ঠুরতা, দুঃশীলতা ও লোভই হইল যারা ক্রেতা, তাদের "টেষ্ট-পরীক্ষা"। যেজন তার বাঞ্ছিত, অভীষ্ট দেবতার দুয়ারে আসিয়াও নিজেও দর কষাকষি করিল, অপমানিত বোধ করিল, রাগিল, "শালা ডাকু গলায়

ছুরি দিয়েছে” বলিয়া আপশোষে মাথা কুটিল, সেজন সত্যসত্যই দেব দুয়ারে ত' আসেই নি ; সে পড়িয়া আছে তার শত শত রাগ-দ্বেষ, আত্মাভিমান, আত্মম্ভরিতা, পরপ্রবঞ্চনা ও পরপরাভবনেচ্ছারই জাহান্নমে। অন্ততঃ বাঞ্ছিতের দুয়ারে আসিয়া তাকে মনে রাখিতেই হইবে —“লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, এ তিন থাকৃতে নয়!” এখানে শত লাঞ্ছনাকেও যে মাথায় করিয়া লইতে পারিল, সে আখেরে জিতিল না ঠকিল ? যে তার সদা-আত্মম্ভরি আত্মাভিমানের পূর্ণ থ'লেটি বুকে চাপিয়াই তীর্থ পরিক্রমা করিল, একটা কড়িও অন্যায় বাজে খরচ করিল না, যে থলিটায় কারুর হাত পড়ার সম্ভাবনা মাত্রেই ফোঁস করিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল, সে তীর্থে আসিয়া সওয়া করিয়া যাইল কি ?

সমরেন্দ্রেরা অবশ্য এতটা ভাবিয়া দেখেনি। তারা হাসিয়া, ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়াই চলিল। তাদের বুকের থ'লেটি থেকে একটা কড়িও তারা অন্যায় বাজে খরচ করিল না। সমরেন্দ্রর বেশভূষা তা'দিগকে তীর্থ-পুণ্য-বিপণিকারদের “শত হস্ত” ব্যবধানে রক্ষা করিয়াছিল। ইউরোপীয়ান ড্রেস্ শুধু রেলওয়ে ট্রাভ্‌লিং এর বেলায় কেন, সর্ব্বত্রই একটা সসম্ভ্রম, সন্ত্রস্ত ব্যবধান আদায় করিয়া নেয়, দেখা যাইবে। হ্যাট মাথায় থাকায় তীর্থের কাকগুলো তেমন মাথা ঠোক্‌রাইতে পারিল না। সভয়ে, দূর হইতে দু'চারিজন তীর্থ-পুণ্যের ষ্টল-ওয়ালা অথবা ফেরিওয়ালা, সে এক্-জিবিশনে, তাদেরও কিছু অপূর্ব্ব পারলৌকিক সামগ্রী সওদা করার মহা-ভাগ্যবান্ হইতে আহ্বান করিয়াছিল বটে। কিন্তু সমরেন্দ্রের অনমুকরণীয় কৃপা-রোষ-অবজ্ঞা-বিদ্রূপ-মিশ্রিত বক্র-দৃষ্টি তাদের অধ্যবসায়শীল হইতে সাহস দেয় নাই। তাদের তিন জনের এই সগর্ব্ব বিজয়-অভিযানে “লিডিংপার্ট” লইয়াছিল মিঃ সমরেন্দ্র স্বয়ং। সুপ্রিয় আর সুচরিতা অনেকটা যেন তাতে গ'ড় দিয়াই যাইতেছিল। আর,

তাতে খানিকটা হাল্কা রকমের মজাও পাইতেছিল। প্রতিমার দরমা-দড়ি-খড়ের দিক্‌টা সুব্রতর চোখেও পড়িয়াছিল সন্দেহ নাই। চোখে না পড়িয়া যাওয়া শক্ত। কিন্তু সে এটাও বোধ হয় ভুলিতে পারিতেছিল না যে, এ সবের একটা প্রচ্ছন্ন কিন্তু সুন্দর সাম্‌নের দিক্‌ও আছে। আর, তাদের সভ্য ভব্য নব্য চক্‌চকে চাঁদটারও বুঝিবা অপর একটা পিঠ থাকিলেও থাকিতে পারে—এমন একটা আশঙ্কাও তার মনে জাগিতে-ছিল। সে "গোমরামুখো" হইয়া অবশ্য পার্টিতে যোগ দেয়নি। হাসি তামাসাতে সেও যোগ না দিতেছিল এমন নয়। কিন্তু হাসিতে একটু বেশীমাত্রায় যোগ দিতে যাইয়া সে বোধ করিতেছিল—তার বুকের পাঁজরের হাড়ে কোন্ খানে যেন খচি লাগিতেছে। একবার সে আর সুচরিতা দুচার পা পিছাইয়া গিয়াছিল। সুচরিতা বলিল—

"আপনাকে থেকে থেকে ফিলজফারের পার্টে দেখা যাচ্ছে কিন্তু।"

"কেন—এমনধারা ষ্টেজের ওপর ফিলজফারের পার্টটা কি একেবারেই বেমানান, অসাজন্ত ?"

সুচরিতা একটু গম্ভীর হইয়া বলিল—

"এমন সুন্দর যায়গাটাতেও মানুষ ধর্ম্মের নামে কতকগুলা ষ্টল্ খুলে রেখেছে দেখ্‌লে সত্যিই কষ্ট হয়।"

"হয়; কিন্তু ধর্ম্মের ষ্টল, ধর্ম্মের ষাঁড়, ধর্ম্মের মর্কট, ধর্ম্মের কাগ-শেয়াল, ধর্ম্মের বোলতা ভীমরুল ছাড়া আরও কিছু কিছুও হয়ত' এসব জায়গায় দেখ্‌বার আছে, যা দেখে, আর এক দিক্ দিয়ে, মনটা বোধ হয় অবাক্ হয়েও যায়।"

"কিসের কথা ব'ল্‌ছেন, ঠিক ধর্‌তে পার্‌লুম না। ধর্ম্মের ভীমরুল পর্য্যন্ত কোন রকমে বোঝা গেছ্‌লো। এবার যে এনে ফেল্লেন একেবারে

ধম্মের কোয়াসা। তার ভেতর দিয়ে কিছুই দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। আপনার মত আমার ত' 'ওকলট্‌সাইট্‌' নেই।"

"তা না থাকুক্‌, আপাততঃ তাতে কোনই মারাত্মক ক্ষেতি দেখ্‌ছি না। আপনার চর্ম্ম চক্ষুদু'টোকে একটুখানি হুঁসিয়ার ক'রে চলুন দিকি—সামনে সিঁড়ির ধাপ নেবে গেছে।" পরিক্রমার পথে যায়গায় যায়গায় ওঠা নামা আছে।

আর কথা চলিল না। না চলুক্‌, সুচরিতার মনের কোণ থেকে সুব্রতর সেই "ধম্মের কোয়াসাটা" একেবারে উড়িয়া গেল কি?

সুব্রতর মনে পড়েছিল সুষমা বৌদির কথা। কত সহজে তার সব ভাবগুলা তার সেই বৌদির ধারণায় ও সহবেদনায় গিয়া ধরা দিত! একদিন কাটুনি থাকৃতে তারা কাটাই আশ্রম দেখিতে গিয়াছিল। দু'টো অনুচ্চ পাহাড়ের মাঝখান দিয়া গম্ভীরতোয়া তন্বী কাটাই নদীটি অতি-মন্থরগতিতে চলিয়াছে। সে অঞ্চলে মানুষের সাড়াশব্দ নেই বলিলেই হয়। (নিকটে পরে কিছুদিন পাথর-কাটাই কনট্রাক্‌টারদের শুভাগমন হইয়াছিল।) জলের মাঝ থেকে দু'একটা বড় বড় পাথর উঁচু হইয়া জাগিয়া আছে। দু'একটা রঙ-বেরঙের পাখী তাতে আসিয়া বসিতেছে, আবার ফুরুৎ করিয়া উড়িয়া যাইতেছে। গভীর খাত পর্য্যন্ত এব্‌রোখেব্‌রো কালো পাথরের লম্বা সিড়ি নামিয়া গিয়াছে। পাশে পাহাড়টার গা বাহিয়াও পাথরের সিঁড়ি উঠিয়াছে। উপরে আল্‌সে বাঁধানো বড় ছাদের মতন পাকা-মেঝে একটা জায়গা। পাথরের তৈরি বসার আসন এখানে সেখানে। তুলসী ও গেঁদার গাছ ধারে ধারে। একটা স্বাভাবিক গুহাকে দুয়ার লাগাইয়া ঘরের মতন কে করিয়া দিয়াছে। পাথরের পাঁজর ফুড়ে বড় অশথ গাছ হইয়াছে। তার তলায় ধ্যানের বেদী। এক পাশে একটা পাকা ঘর। রামজীর বিগ্রহ সেখানে।

ভারি মিষ্টি একটা ধূপের গন্ধ তার ভেতরে। কোথাও জনমানব নেই। সুব্রত ঘণ্টা খানেক ঠায় সেই অশথ গাছ তলার বেদীটার নীচে বসিয়াছিল। খোদ বেদীটাকে অসম্মান করার ইচ্ছা তার হয় নাই। না জানি, কত সাধু সজ্জন সে বেদীতে তাঁদের সিদ্ধাসন পাতিয়া গিয়াছেন! বিনয় ও সুষমা নীচে—সেখানটার একটা শিবলিঙ্গ আর পাথরের গোমূর্ত্তি আছে, —সেইখানে বসিয়াছিল। সুব্রতকে বিরক্ত তারা করে নাই। ঘণ্টা খানেক পরে সুব্রত নামিয়া আসিলে পর বৌদির সঙ্গে তার দু'চারটা কথা হইয়াছিল। ঘণ্টাখানেক ধরিয়া সুব্রত যেন কাণ পাতিয়া শুনিতেছিল একটা অবিচ্ছিন্ন অনাহত ধ্বনি। কিসের সেটা? যেন ভারতের বুকের ভেতর—পাঁজরের নীচে কোন্‌খানে—সত্য-ঋত-অমৃত সাধনার, তপস্যার যুগ যুগ সঞ্চিত শক্তি—যত না আলোক, আনন্দ, অভয়,—উৎসের মতন এখনও ঝির্ ঝির্ করিয়া ঝরিয়া যাইতেছে! বুকে তার বড় বড় কালো কালো পাথরের চাঁই চাপানো রহিয়াছে। কি সেগুলো? মূর্চ্ছা, ক্লান্তি, অবসাদ, না আসন্ন মৃত্যুর ঘোর? যাই হোক্—এখনও স্থির হইয়া বসিয়া কাণ পাতিলে, একটা অনাহত অবিরাম প্রণবোচ্চারের মতন—সেই গভীর বিশ্বকল্যাণ-কাম উৎসের নিগূঢ় ঝর্ ঝর্ ঝর্ শুনিতে পাওয়া যায়। অবশ্য, নিজের গলার কি মনের চেঁচামেচিতে ব্যস্ত হইলে কি শোনা যাবে? সুব্রত বোধ হয় একটা কিছু শুনিতে পাইয়াছিল। মনে পড়ে, একদিন কোন এক খ্যাতনামা সাধু বলিয়াছিলেন—"বাবা, তপপাহাড়ের ওপরের গুহাটায় খানিক গিয়ে চুপ ক'রে ব'সো দিকিন্। শুন্‌তে পাবে।" তপপাহাড় বৈদ্যিনাথের কাছে। কি শুন্‌তে পাবো? কোন একটা নাদধ্বনি—যেটাকে আশ্রয় করে এই বিচিত্র বিশ্বসঙ্গীত নানান্ রাগরাগিণীতে ফেটে ফুটে যাচ্ছে; যাতে আবার সব একদিন চুপচাপ্ মিলিয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে! ঠাকুর

পরমহংস বলিতেন—সানাইএর ভো এর কথা, যেটাকে আশ্রয় ক'রে আর একটা সানাই-এ সুরের কত না করৃতব খেলে যাচ্ছে! মর্ম্মদৃষ্টি মর্ম্মশ্রুতির কথা আজকা'লও শুনিতে পাওয়া যাইতেছে। কেহ হয়ত' বলিয়া দিতে পারে, মাটির নীচে কোথায় মণির খনি আছে; কেহবা পারে, পাতালের জলের সন্ধান দিতে। সুব্রত কি একটা উৎসের সাড়া পাইয়াছিল কাটাই আশ্রমে সেই পাথরের বেদীমূলে বসিয়া! নীচে আসিয়া দু'চার কথায় সুষমা বৌদিকে সে কথা সে বলিল। বিনয়ও শুনিল—শুনিয়া হাসিল না, চুপ করিয়া রহিল। সুষমা বোধ হয় বুঝিলও। অন্ততঃ তার আর আপনার মাঝে কোনরকমধারা একটা আধ্যাত্মিক "কোয়াসা" পরস্পরের সহ-অনুভূতিটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, এমন মনে করে নাই সুব্রত সেদিন।

তীর্থপরিক্রমার পুণ্য, এবং বোধ হয় ততোধিক ক্লান্তি ও বিরক্তি, সঞ্চয় করিয়া পার্টি সন্ধ্যার একটু আগে তাঁবুতে ফিরিয়া আসিল। সুব্রতর হিসাবনিকাশটা আলাদা করিয়া দেখাইলাম না। ক্লান্তি ও বিরক্তি তারও একটু হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু লাভের অঙ্ক ছাড়াইয়া ফাজিল একটা কিছু হইয়া পড়ে নাই বোধ হয়।

সন্ধ্যার সময় টেণ্টের বাইরে একটা টেবিলের চার ধারে বসিয়া চা খাইতেছিল তারা। কেক্ বিস্কুটের অনুপান তাদের সঙ্গেই আনা হইয়াছিল। সুব্রতর চলিতেছিল—গান্ধী চা—এককাপ গরমজলে চিনি আর নেবুর রস মিশিয়ে। অনুপান পূর্ব্ববৎ। নৈষ্ঠিক নিরামিষাশী এখনও সে হইতে পারে নি। কালে ভদ্রে কেক্ বিস্কুট তার চলে। তবে সে সবে রুচির উগ্রতা আর নেই।

সেই মানিকপুর ডাকবাংলোয় খাবার বেলা সেদিন তাকে "একঘ'রে" থাকিতে দেখা গিয়াছিল। আজ আবার এখানেও, চায়ের টেবিলেও,

তার "ভিন্ন ডহর"। এই ভিন্নত্বটুকু সমরেন্দ্রের আধ্যাত্মিক আভি-জাত্যটাকে যেন আঘাত করিতে লাগিল। কে এই ব্যক্তি—পাড়াগেঁয়ে এক জমিদারের ছেলে, বিদ্যে সাধ্যিত' অজ্ঞাত-কুলশীল, ঘটনাচক্রে তাদের "হাই" সার্কেলে আসিয়া পড়িয়াছে! আকস্মিক এক দুর্ঘটনায় মৃত্যুঞ্জয় বাবু আর সুচরিতার কৃতজ্ঞতার উপর দাবী সাব্যস্ত করিয়া লইয়াছে! কৃতজ্ঞতার সীমা ছাড়াইয়া আর কিছুতে "চড়াও" হবার বাসনা পোষণ করিতেছে না ত'? কে জানে! তা হ'ক না কৃতজ্ঞতা—সুচরিতাও তাদের ব্যবধানটা, কতকটা অচিন্তিত-ভাবে, খাটো করিয়াই কি মিশিতেছে না তার সঙ্গে? সেটা অবশ্য তত সহজে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না—সেকি এত সহজে তার "সেট্", তার শিক্ষা-সহবৎ, তার "আব্‌হাওয়া" ভুলিয়া যাইবে? কিন্তু তার সতর্ক হইয়া চলা উচিত। আর সেত'—।

ছোট টেবিলটার দু'পাশে দু'খানা মেঘ জমিয়াছিল। "রাইভাল্‌রি"—প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ের—মেঘ যে দু'খানা, তা' আমরা বলিতে ব্যস্ত হইতেছি না। অব্যক্ত চেতনায় অনেক কিছু থাকে, হয়ত' বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আছেও। এখন বিশ্লেষণ করিয়া কাজ নাই। ঠিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রণয়ে যদি বা নাও হয়, এটা ঠিক সে, মেঘ দু'খানা বিপরীত তড়িতে ভরা। "অন্তরীক্ষে" বসিয়াছিল দু'টি ভাই বোন তারা। আর, দুটোর মাঝখানে যে বিজলি খেলিল, তার উৎপত্তি মর্ম্মপুরীর কোন্ গোপন ডাইনামোয়, তার খোঁজ ত' আজ লইব না বলিয়াছি। কিন্তু, বাহ্যতঃ দেখা গেল—সেদিনকার তীর্থ-পরিক্রমার অভিজ্ঞতার বিনিময়টাই হইল উপলক্ষ্য।

"সুব্রত বাবু, আজ এক পেয়ালা চা খেলে বোধ হয় বেশ খানিকটা রিলিফ্ পেতেন।"—সমরেন্দ্র বলিল।

নিজের গান্ধী চায়ে চুমুক দিয়া সুব্রত বলিল—"এটাও কিছু কম রিলিফ্ দিচ্ছে না, মিঃ চ্যাটার্জ্জি।'

"ঠিক জানিনে, তবে ওটা বোধ হয় দুধের তেষ্টা ঘোলে মেটানো।"

রসিকতা তার ধাতে তেমন আসিত না। একটু হাসিল সে।

"আর সত্যি বল্‌তে, আজ শরীর যতটা রিলিফ্ চাচ্ছে, মনটা তার চাইতে কম রিলিফ চাচ্ছে না। কি বল, সুপ্রিয়? ন্যাচারাল্ সিনারি বেশই বল্‌তেই হবে—কিন্তু মানুষ যা গেড়ে রেখেছে এখানে, আর যা' সব চালাচ্ছে, তাত' মশাই ডিস্‌গাস্‌টিং, রিভোল্‌টিং, সিকেনিং! যত সব ধম্মবিক্রীর দোকান। যত ব্যাটা গাঁটকাটা, আর আল্‌সের আর ভণ্ডের বাথান। A clean sweep is the only remedy. বুঝ্‌লেন?"—সমরেন্দ্র বলিল।

"গাঁটকাটা, আল্‌সের আর ভণ্ডের অভাবত' কোথাও নেই। এখানেও সে সব আছে। ভো'ল আলাদা। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সেটা মোটেই ভাল নয়। সংস্কারের দরকার আছে বৈকি! তবে সুইপিংটে বেশ বিবেচনা ক'রে সতর্ক হ'য়ে করাই দরকার হবে। ক্লিন্‌সুইপের চাইতে সুইপিং ক্লিনের দরকারটাই বেশী ব'লে মনে হয়। অনেক কিছু ভাল জিনিষও আছে, সেগুলো ঝেঁটিয়ে না ফেলে যত্নে তুলে রাখ্‌লেই ভাল কর্‌ব।"

"মাপ ক'রবেন—এর ভেতর যে এমন কিছু র'য়েছে বা থাক্‌তে পারে, যেটাকে যত্ন করে আমাদের তুলে রাখ্‌তে হবে—এটা ত' আমার জ্ঞান-গম্য হচ্ছে না। রামের কাহিনীটে, সত্য হোক্ মিথ্যা হোক্, মন্দ নয়। রামায়ণ মহাভারত পুড়িয়ে ফেল্‌তে বলিনে। এ যায়গায় রামরা যদি কিছুদিন এসে থেকেই থাকেন, তা সেটাও মনে রাখ্‌বার জন্য একটা কিছু এখানে খাড়া ক'রে রেখে দিলেও ক্ষেতি নেই। কিন্তু তাই নিয়ে এত বড় একটা ভণ্ডামি আর জুয়োচ্চুরির ব্যবসা হাজার হাজার বছর

ধ'রে চল্‌বে—গরীব দেশের লাখ লাখ টাকা কতকগুলো ইঁট আর পাথরে আবদ্ধ ক'রে রেখে—অগুণ্‌তি গরীব বেচারীদের রাহাজানি আর জুলুম বাজিতে ধনেপ্রাণে ফতুর ক'রে—যত রকম আল্‌সেমি, বাঁদ্‌রামি আর বজ্জাতির কেল্লা হ'য়ে খাড়া থাক্‌বে—দেশের যাদের চোখ ফুটেছে তারা কথা কইতে পারে না, গবর্ণমেণ্টেও গায়ে হাত দিতে পাবে না—দিলে নাকি ধর্ম্মে হাত দেওয়া হ'বে—এ কাণ্ডকারখানাটার কি কোন সত্যিকার সাফাই আছে, সুব্রতবাবু?" —সমরেন্দ্রর এই সুললিত ভাষণের মাঝে মাঝে ইংরাজি বুকুনিগুলো আমরা তরজমা করিয়া দিয়াছি। গরীব বেচারীদের জন্য তার দরদ উথলিয়া উঠিতেছিল বোধ হয়। মুখে সিগারেট্‌ তখনও অবশ্য ধূমায়মান হইতেছিল!

সুব্রতর একবার আঁতে ঘা দিয়া জবাব দেবার লোভ হইয়াছিল। তার ঐ সৌখীন সিগারেট্‌—মাত্র ঐটেই—গরীব বেচারীদের রুটি কতটা কাড়িয়া লইতেছে? সিগারেটের বদলে বিড়ি টানিলে বেচারীদের রুটির আকার বেশ একটু খানি বড়ই হইত!

"আমরা নানান্‌ সখে, আমোদে যে কোটি কোটি টাকা উড়িয়ে দিচ্ছি, তার চাইতে এই মুখ্যু গরীব বেচারীদের তীর্থযাত্রার খেয়ালে বেশী টাকা নষ্ট হচ্ছে না, মিঃ চ্যাটার্জ্জি। আর, এখানে ইঁটপাথরে লাখ লাখ টাকা আবদ্ধ থাকার কথা বল্‌লেন—আল্‌সেমি আর ভণ্ডামির মহাসমাদরে প্রশ্রয় পাবার কথা বল্‌লেন। এক দিক্‌ দিয়ে কথাগুলো ঠিক। কিন্তু জার্ম্মাণিপ্রভৃতি দেশের এক একটা ক্রুপ্‌ ফ্যাক্‌টরিতে কত টাকা যে বাঁধা প'ড়েছিল বা আছে, আর সেসব টাকা খরচ ক'রে কোন্‌ শুভচণ্ডী দেবতার যে সেবা চ'লেছে, তাও একবার তুলনা ক'রে দেখ্‌লে মন্দ হয় না। এক আমেরিকান্‌ টুরিষ্টরেই তাদের ভবঘুরে

সখ মেটাতে বছরে কত টাকা পৃথিবীময় ছড়িয়ে আসে, তার হিসেব নিচ্ছে কে? আমরা দুবেলা দুমুঠো খেতে পাইনে, আর তাদের টাকা কাম্‌ড়াচ্ছে। কাজেই তারা যা কর্চ্ছে, তাই শোভা পাচ্ছে।"

"সখ আর আমোদ জিনিষটে কি ফুঁদিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়—নেই বল্লেই নেই ক'রে দেওয়া যায়?"—সুচরিতা মাঝখান থেকে বলিল।

"যায় না। কিন্তু মানুষের বিশ্বাস, খেয়াল, আকুতি আর আশা—এগুলোকেই কি উড়িয়ে দেব বল্লেই উড়িয়ে দেওয়া যায়? এই তীর্থযাত্রীরা একটা বড় রকমের বিশ্বাস, আকুতি আর আশা নিয়েই তাদের ক্ষুদ কুঁড়ো ক'টি কুড়িয়ে পথের সম্বল ক'রে এসব জায়গায় এসে থাকে জান্‌বেন।"

"বিশ্বাস, আকুতি, আশা—এসব বড় বড় কথা না ব'লে, একটা অন্ধ কুসংস্কারের খেয়াল বল্লেই ঠিক বলা হ'ত নাকি, সুব্রত বাবু?"—সুপ্রিয় জেরা তুলিল। সুপ্রিয় কেবল যে যুবসম্মিলনগুলোতে গতিবিধি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে, এমন নয়। দু'একখানা কম্যুনিষ্ট লিটারেচার্‌ও পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। গড্ বেচারীকে আউট্‌ভোট্ করার পক্ষে সে অবশ্য এখনও তার ভোটটি দেয় নি। কিন্তু রিলিজন্ জনসাধারণের পক্ষে আফিং এর নেশার মতই মারাত্মক—এসব বুলি সেও দস্তুরমত আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে। ধর্ম্ম ধর্ম্ম, পরলোক পরলোক—করিয়াই এ দেশটা ভণ্ডামি আর বেলেল্লামির গোল্লায় গিয়াছে—এ দেশের জনসাধারণ নিজেদিগকে, যারা কুলে শীলে, ধনে মানে অভিজাত, তাদের দ্বারা পদদলিত, নিষ্পেষিত হইতে দিয়াছে—এ ধারণাটা তার মনের নরম মাটিতে এর মধ্যে বেশ খানিক দূর শিকড় চালাইয়া দিয়াছে। ধনী বা বড় মানুষের প্রতি আক্রোশটা তার এখনও তেমন সজাগ হয়

নাই বটে ; কিন্তু ধর্ম্মের বে-পরওয়া বাঁধন, আর সমাজের বেয়াড়া শাসন-গুলোর প্রতি সে ক্রমেই বিদ্রোহী হইয়া উঠিতেছিল।

সুব্রত দেখিল আজকার তর্কযুদ্ধে সে একটা ত্রিকোণ ব্যূহের ভেতরে পড়িয়াছে। সে সংক্ষেপে তার উত্তরটা দিল।

"তীর্থে ধর্ম্মের নামে যে অনাচার অপচার চল্‌ছে, সেটার সমর্থন আমি করিনে। জায়গাটা ঝেঁটিয়ে—বেশ শক্ত বুকের পাটা নিয়েই ঝেঁটিয়ে—নেবার দরকার আছে। কিন্তু যারা সব তীর্থ কর্‌তে আসে, তা্রা একটা বিশ্বাস আর আশা নিয়েই আসে। সে বিশ্বাস আর আশার উচিত দর ক'ষে দিচ্ছে কে ? যেগুলোকে আমরা নিজেরা মানিনে বুঝিনে, সেগুলোকেই অনেক সময় মিথ্যা খেয়াল, কুসংস্কার ব'লে হাঁকিয়ে দিয়ে, নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। গরীবরা চাকার তলায় পিষে ত' মর্‌ছেই—যদি কালেভদ্রে সে হাড় ভাঙ্গা পিষুনিটা থেকে দিনকতক ফুর্‌সুৎ ক'রে নিয়ে, বিশ্বাস আর নিষ্ঠার সঙ্গে, গোটাকতক তীর্থ ঘুরে যেতে পারে, তবে, যতটা খরচায় যতখানি সওদা তারা ক'রে নিয়ে গেল, তার হিসেব নিয়ে, নিশ্চয়ই তারা ঠ'কেছে, এমনটা আমরা বোধ হয় মনে কর্‌ব না। বিশ্বাসটা তাদের অমূলক হ'তে পারে, কিন্তু তাই দিয়ে যদি তারা খানিকটে আনন্দ, খানিকটা শান্তি, খানিকটে আশা আর তৃপ্তি অর্জ্জন ক'রে ফেরে, তবে, তারা মিথ্যে মালের সওদা ক'রে বোধ হয় ফির্‌ল না। ভারতবর্ষ এখনও মরেনি, কেন না, তার মজ্জাতে এখনও একটুখানি আনন্দ আছে। এদেশের গরীবদের দুঃখ দুর্দ্দশার তুলনা নেই। কিন্তু আশ্চর্য্য কোন উপায়ে এদের মধ্যে এখনও যতটা আনন্দ, যতটা আশা, যতটা শান্তি, যতটা ভদ্রতা আছে দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে, অন্য কোন দেশের গরীবদের ভেতরে ততটা বোধহয় নেই। সেটা কমিয়ে, তাদের বাঁচাতে পারা শক্ত হবে।"

"তীর্থ বেড়ানয় যা খরচটা তাদের হয়, তাতে নিজেদের মুখে দু'গাস অন্ন বেশী ক'রে তুল্‌তে পেলে কি তাদের বাঁচার উপায় আরও বেশী ক'রে হ'ত না ?"—সুপ্রিয় আবার বলিল।

"বলা শক্ত। মানুষ—এমন কি, ঐ মুখ্যু গরীব বেচারীও—শুধু একটা পেট হ'লে তা চল্‌ত। কিন্তু মানুষ যে তার সব খানা পেটই নয়। তার এমন আর একটা কিছু আছে, যেটাকে ক্ষুধিত করে ফেলে রাখ্‌লে, ভ'রতি পেটেও যে তার কুলোয় না। আনন্দ, শান্তি, আশা, তৃপ্তি ব'লে জিনিষগুলো ঠিক পাকস্থলীতেই ভিয়েন হয় না, সুপ্রিয় বাবু। বাঁচ্‌তে হলে গরীবকে যেমনধারা খেতেও হয়, তেমনি ধারা আবার ভালবাস্‌তেও হয়; বিশ্বাস কর্‌তেও হয়, আশা করতেও হয়। পেটটার ভাগে কম ক'রেও এগুলো তার কর্‌তে হয়। নৈলে সে বাঁচে না। তার জাত, তার গোষ্ঠী, তার সমাজের ধারাটাও চলে না।"

"পয়েন্টটা গুলিয়ে যাচ্ছে, সুব্রত বাবু। আনন্দ, আশাটাশা যা ব'ল্‌ছেন, তা কিছু কিছু চাই বৈ কি! কিন্তু কথা হচ্ছে—তারা যে দাম দিয়ে এই সব তীর্থে জুয়োচ্চরির দোকান গুলোতে এসে সে সব মাল কিন্‌তে চাচ্ছে, সে দামটা দিয়ে অন্য জায়গা থেকে তারা সেসব মাল বেশী পরিমাণে কিন্‌তে পার্‌ত না কি? তাদের শিক্ষা দীক্ষা দিলে, তারা আজক'াল অনেক নতুন নতুন "সোর্স" থেকেও ফূর্ত্তি বলুন, আনন্দ বলুন, পেতে পার্‌ত! নয় কি? অন্য দেশের "ম্যাস্" কে ত' কৈ তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে আনন্দ পেতে হয় না।"—সমরেন্দ্র বলিল।

"সত্যিই ত'—তাদের পেনি পেপার আছে, ঘোড়দৌড় আছে, বিয়ার গার্ডেন বা বিয়ার ডেন্ আছে, রাজনীতি আছে, এমন কি, লিঞ্চিং পর্য্যন্ত আছে!"—সুচরিতা হাসিতে হাসিতে বলিল। সুব্রত দেখিল—সুচরিতার হাতের এ তাসটা তার পক্ষেই পড়িল।

"প্রথম, এ দেশের শিক্ষা অথবা অশিক্ষা কুশিক্ষার চাইতে অন্য দেশের শিক্ষা দীক্ষা যে সব রকমে ভালই, এটার হেস্তনেস্ত করার দরকার আছে। গোড়ায় গিয়ে দেখ্‌তে হবে—মানুষ সত্যিকার স্বাস্থ্য, শান্তি, আনন্দ, অন্ততঃ এসবের আশাটুকু, কি থেকে বেশী ক'রে পেয়েছে বা পেতে পারে। তারপর, অন্যদেশের মতন শিক্ষাদীক্ষাটা কিছু একদিনেই দেওয়া যায় না। বেশ কিছু সময় লাগ্‌বে। ততদিন না হয় এ দেশের লোকেরা যাতে ক'রে তাদের বোঝাটা একটুখানি হাল্‌কা ক'রে নিতে পারে, তাদের বুকের কলিজেয় একটুখানি আশাভরসার বল জমিয়ে রাখ্‌তে পারে, তাই করুক না। আমরা হন্তারক হ'য়ে কি ভাল করব ?"—সুব্রত বলিল।

"তীর্থগুলোতে এতগুলো টাকা গেড়ে রেখে, এত আল্‌সে বাট্‌পারদের ভুরিভোজন করিয়ে, নিজেদের পায়ের-ঘাম-মাথায়-ফেলে পুঁজি-করা পয়সা নষ্ট ক'রে, সময়-পাত, দেহ-পাত, প্রাণ-পাত পর্য্যন্ত ক'রে বোঝাটা ভারিই ক'রে তুলছে তারা। এরা একদম পিষে ম'রে গেলে শিক্ষা টিক্ষা দেবেন কাদের নিয়ে ?"—সমরেন্দ্র তার এজলাসে বসিয়া শেষ মন্তব্যটা রায়ের মতনই বাহির করিল। সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া পড়িল সে।

সেদিন চা-এর বৈঠক এইখানেই ভাঙ্গিল। লজিকের হাতখানা ধরিয়া মীমাংসার দিকে ধীরেসুস্থে চলিতে কেহই ব্যস্ত ছিল না। মেঘে মেঘে খানিক বিজলি খেলিয়া যাইল মাত্র। ফলে, মেঘগুলো এক হইয়া মিশিয়া যাইল না।

ষষ্ঠ

সেদিন বেশী গরম পড়িয়াছিল। সুব্রত ক্যাম্পের ভেতরে সেরাত্রে শুইল না। বাইরে একখানা খাটিয়ায় শুইয়া রহিল। আকাশে তারাগুলো জ্বল্ জ্বল্ করিতেছিল। বাতাস, শুধু মানুষের হাঁটা পথটিতে নয়, চিত্রকূট পর্ব্বতটার প্রতিগুল্মের শাখা-পল্লবের অবকাশে, প্রত্যেক শিলাস্তূপের রন্ধ্রে রন্ধ্রে, কি জানি কি একটা উদাস ভজনগীতি গাইয়া গাইয়া পরিক্রমা করিয়া বেড়াইতে ছিল। পর্ব্বতটার ঠিক মাথায় একটা বড়গোছের তারা যেন জানকীর কোন এক তাপসী সখীটির মতন এখনও সজলনেত্রে চাহিয়া আছে—সেদিক্ পানে, যেদিকে তার প্রিয় সখী চিত্রকূটের মায়া কাটাইয়া দর্ভাঙ্কুর ক্ষতচরণা স্বামী আর দেবরের সাথে চলিয়াছেন দণ্ডকারণ্যের পথে! সুব্রতর দিক্ ঠিক ছিল না—বোধ হয় পূব দিকটাতেই হবে—হনুমানধারার বেশ লম্বা পাহাড়টা সেই জ্যোৎস্নাহীন কিন্তু স্বচ্ছ নৈশ অন্ধকারের সাগরের মাঝখান থেকে মাথা তুলিয়াছে। বজ্রায়ুধ সেরাত্রে কোন্ অলকায় উর্ব্বশীর নাচ দেখিতে ছিলেন—তাঁর মেঘের রথে চেপে ব্যোমপথে সেদিন পাহারা দিয়ে বেড়াইতে ছিলেন না—তাই, সিন্ধু-কুক্ষিতলে পলায়িত মৈনাকের দল আবার চুপি চুপি আঁধারের সাগর ঠেলে মাথা তুলেছিল ধরণীপৃষ্ঠে তাদের সেই আদিম জন্মভূমিটার পানে—যেখানে তাদের যত সব জ্ঞাতি গোষ্ঠী ইন্দ্রের বজ্রনিগড়ের বাঁধনে আসাড় পঙ্গু নানাস্থানী হইয়া পড়িয়া আছে! তীর্থের মন্দিরে মন্দিরে মঙ্গলারতির শঙ্খঘণ্টা তখন আপনাদেরই অপূর্ব্ব লীলায়িত প্রতিধ্বনি-গুলোর জালে যেন জড়াইয়া থামিয়া চুপ হইয়াছে! কোন্ সম্পন্ন শেঠজীর

কাঞ্চনমূল্য রজতখণ্ড তখনও বোধ হয় একটা পুণ্য বিপণিতে মিঠা আওয়াজে পড়িয়াছিল—নৈলে হঠাৎ অতবড় জবর একটা ঘণ্টাধ্বনি সে অঞ্চলটা কাঁপাইয়া তুলিবে কেন? ঘণ্টার শব্দটা যেন অতিদুস্তরা বৈতরণীও পার হইয়া চলিয়াছে সেই পরপারের কাছারিতে, যেখানে চিত্রগুপ্ত তাঁর পাপপুণ্য জমাখরচের খাতাটা খুলিয়া বসিয়া আছেন। ঘণ্টাধ্বনি যেন চিত্রগুপ্তকে ধাক্কা দিয়া বলিতেছে—"মুন্সীজি, ঝিমোচ্ছিলেন নাকি? মৌতাতের মাত্রাটা আজ বেশী হয়নিত'? উঠন, একটা বড় রকমের পুণ্যের অঙ্ক পাকা খাতায় জমা ক'রে নিন্।"

তখন রাত্রি দশটা হবে। সকালে উঠিয়া তাদের হনুমানধারা দেখিতে যাবার কথা হইয়া আছে। সুচরিতা সন্ধ্যার সময় পূবদিক্‌টায় তাকাইয়াই বুঝিল—হনুমানধারার চমৎকার সুন্দর পাহাড়টা যেন তাকে নীল আকাশে প্রতিফলিত আলোছায়ার একটা ভারি মিষ্টি হাতছানি দিয়া ডাকিতেছে। "ওটা কি পাহাড়? ভারি সুন্দর ত'?"—সে শুধাইয়াছিল। তখন ছড়িদারটি হাজির ছিলেন—কখনই বা নেই?—তিনি ব্যগ্র হইয়া বলিলেন—"ওটা হনুমানধারা পর্ব্বত, মায়ীজী। কোটিতীরথ, দেবাঙ্গনা, হনুমানধারা—এই সব ওখানে আছে! ওখানে গেলে কোটিতীরথ করার পুণ লাভ করা যাবে।" কোটিতীর্থের পুণ্যের লোভ তাদের বিশেষ ছিল না। তবু পরদিন সকালে কিছু খাওয়ার পরই হনুমানধারা দেখিতে যাওয়া স্থির হইল। "হনুমান" নামটায় তাদের পরিহাসচটুল রসনায় কিছু কণ্ডুয়ন সৃষ্টি না করিয়াছিল, এমন নয়। কিন্তু বিশ্বাসীর অন্তঃকরণ-পীঠস্থানে হনুমানজীর মন্দিরটা স্বয়ং রাম-লছমন-জানকীজীর মন্দিরের চাইতে কম উঁচু হইয়া নাই ত!

সুব্রতর ঘুম আসিতে বোধ হয় দেরী হইতেছিল। তার মনে সে রাত্রে ভাবনার তিনটে ধারা বহিয়া যাইতেছিল। আলাদা আলাদা—

ত্রিবেণী-সঙ্গমে এখনও পৌঁছায় নাই। একটা ধারা—চিত্রকূট বেড়াতে এসে সে পেল কি? তীর্থের নোংরামি বাঁদ্‌রামিগুলো তাকে "ঠকাতে" পারে নি। তাদের যত সব বাধা, সেসব ঠেলে সে ভেতরে ঢুক্‌তে বোধ হয় পেরেছে। সেই কটাই-আশ্রমে বাইরের কিছু বিক্ষেপ ছিল না। সেখানে তাই বেদীমূলে বসামাত্র সে শুন্‌তে পেয়েছিল—এই সনাতন দেশের বুকের পাঁজরার নীচে যে হৃদয়ের রক্ত ঝর্‌ ঝর্‌ ক'রে শিরে শিরে ব'য়ে যাচ্ছে। সে পে'য়ছিল এক শাশ্বতকল্যাণ উৎসের নিগূঢ় সাড়া। একটা অনাহত ধ্বনির মতন। সেটাকে ধর্‌তে পেরেও সে বোধ হয় সেটাকে ভাল ক'রে চেনেনি। আজ্‌কে তীর্থ স্থানের যত সব বাজে মিথ্যে গোলের মধ্যেও সে পেল সেই গভীর উৎসটারই সাড়া। আর আজকে সেটা শুধুই সাড়া নয়—আজ তার একটা স্পষ্ট বাণী ছিল, একটা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবার্থ ছিল!

এ মহাপাদপটার ওপরের খোলটায় জরার আর ব্যাধির অনেক কিছু চিহ্ন দেখা যাচ্ছে; অনেকগুলো ডালপালাও শুকিয়ে গেছে বা যাচ্ছে। মনে হয়—বুঝি গাছটা মর্‌তেই ব'সেছে। কিন্তু প্রাণের রসধারার নিগূঢ় অন্তঃসঞ্চারটি তাকে আজ আশ্বস্ত ক'রে দিল—এ ত' মরণ নয়, কৃচ্ছ্রসাধন। এর নগ্নতা আর জীর্ণতার ভেতর থেকে শাখা-পল্লব-ফল-পুষ্পের অতুলনীয়, মহনীয় সম্পদ্‌ এখুনি ফুটে বেরুলো ব'লে! দেবতারা আকাশে বাতাসে, আলোকে আঁধারে, শিশিরে বর্ষায়, সকালে সন্ধ্যায় এর যতসব নিগূঢ় শিরায় শিরায় ঋগ্‌বেদমন্ত্রের সেই বিশ্বে ওতপ্রোত মাধ্বীকণা ক্ষরণ কর্‌ছেন যে! এ যে সেই অব্যয় অক্ষয় অশ্বত্থ—যার কথা শ্রুতি শুনিয়ে গেছেন, গীতা গেয়ে গেছেন। পশ্চিমের দিক্‌চক্রবালে আজ দাবানল জ্ব'লেছে। মহাভয়ে আর্ত্ত আজ যত বিশ্বপ্রাণী! কে তাদের আপন তাপসের আশীষহস্ত

বাড়িয়ে আশ্রয়ের জন্য ডেকে নেবে? কে তাদের আপন শান্ত শীতল ছায়ার মুক্ত, পৃথু, পুণ্য অঞ্চলে আবার বসতে দেবে? তাদের মদির পিপাসায় রক্ত ওষ্ঠে স্বচ্ছ, স্নিগ্ধ বারিধারা দেবে—অমৃতের আশা? তাদের বিরাট্ রাক্ষুসে ক্ষুধার মুখে দেবতার প্রসাদ পরমান্ন তুলে দেবে—অভয় ও আনন্দ? শুধু ভারতের সাধনার "স্পিরিট্‌টে" নয়, তার আসোল যেগুলো "ফর্‌ম"—রূপ আর অবয়ব—সেগুলোও যে আজ নূতন ক'রে কাম্য, বরেণ্য, মৃগ্য, সাধ্য! এই স্পষ্ট অনুভূতিটে সে চিত্রকূটে এসে পেয়ে গেল। আর, সে ভুল্‌বেনা—এ দেশের ওপর ওপর যা কিছু সব জীর্ণ, যা কিছু সব কুৎসিত, তাই সব দেখে। ঐ চিত্রকূটই যে তার প্রতীক—তার গুরু! এবং ভুল্‌বেনা সে—ভিন্‌দেশের ওপর ওপর যা কিছু সব তাজা টাট্‌কা, যা কিছু সব রঙ্গিন ঝক্‌ঝ'কে, তাই সব দেখে! গুরু তার চোখ দুটোতে জ্ঞানাঞ্জন-শলাকা আজ লাগিয়ে দিয়েছেন যে!

তার বাবা বিলেত না গেলেও নব্যমতের ছিলেন। কল্‌কাতায় থিয়েটার রোডের বাড়ীতে নব্যভাবেই তিনি থাক্‌তেন। সুব্রতও সেই ভাবেই মানুষ হ'য়েছে। তার ওপর সে বিলেত টিলেত ঘুরেও এসেছে। সাহেবিয়ানার সখ মিটুতে সে ত' কসুর করে নি। বাবা আজ তার নেই। মা আছেন—তিনি, ভারতীয় সভ্যতার যেটা অনিন্দনীয় ভব্যতা, সেইটেরি যেন, সৌম্য সঞ্চারিণী মূর্ত্তি। তাঁর মুখে সতু ছেলেবেলায় রামায়ণ মহাভারত শুনেছে, ব্রতনিয়ম কথা শুনেছে। তার ছোট্ট বুকখানা সে সব কথায় ভ'রে উঠ্‌ত, ভ'রেই থাকৃত। কিন্তু অন্য ধরণের শিক্ষা-সহবতে সব চাপা প'ড়ে গেল। সে কালাপানি পার হবার অনেক আগেই বুঝ্‌তে পেরেছিল—সে যেন মায়ের সেই আহ্নিকের ঘরটা থেকে অনেক দূরে স'রে এসেছে বাবার থিয়েটার রোডের বাড়ীর ড্রয়িংরুমটারই কাছে। বাবার ড্রয়িংরুম থেকেই সে কালাপানি পারি-

দিয়েছিল। ফিরে যখন এল সে, তখন বাবা তার আর ইহলোকে নেই। মা আছেন পাড়াগেঁয়ে তাঁর আহ্নিকের ঘরটিতে ব'সে, ঘৃতের দীপটি আর দেবার্চ্চনী ধূপকাঠিটি জ্বেলে! হ্যাট্‌কোট্‌ সে তখনও ছাড়েনি—তবু সে এসেছিল একটা সংশয়াকুল, আলোড়িত, অশান্ত, অতৃপ্ত অন্তর নিয়ে তার মায়ের মন্দির-দুয়ারেই। মায়ের মন্দিরে ঢুকতে সে সাহস করেনি তখন। মা-ই বেরিয়ে এসেছিলেন—তাঁর নির্ম্মাল্য আর আশীর্ব্বাদ নিয়ে। যে মাথা পেতে সে নির্ম্মাল্য আর আশীর্ব্বাদ নিয়েছিল। তার পর ভাল ক'রে সংস্কৃত শিখ্‌তে আরম্ভ করে সে; ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে গিয়ে দেশের পুরাণো পুঁথিগুলোর ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করে সে। ক্রমেই সে যেন গোটা সত্যটা বুঝ্‌ছিল; সত্যের গোটা ও খাঁটি চেহারাটা দেখার চোখ তার ফুটে আস্‌ছিল। আজ চিত্রকূটে এসে তার সেই থিয়েটার রোডের চোখের সখের ঠুলিটে একেবারেই কি খ'সে পড়ে গেল?

আর একটা চিন্তার ধারাও আজ তার অন্তরে বহিয়া যাইতেছিল। —সে জীবনের এক পথসন্ধিস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে আজ। এখন সে চল্‌বে কোন্ পথে? বাবা তার প্রজাপীড়ক ভূস্বামী ছিলেন না। এমন কি, প্রজাদের সুখদুঃখে অবিচলিতও তিনি থাক্‌তেন না। তাঁর গাঁয়ে আর জমিদারীর ভেতর নানান্ ভাল কাজ তিনি ক'রে গেছেন। কিন্তু সে সব তিনি ক'রে গেছেন তাঁর মন আর ধনের খানিকটে দিয়েই। বাকিটা তাঁকে তাঁর থিয়েটার রোডের বাড়ীতে একটা নব্যধরণের সৌখীন মার্জ্জিত জীবনের আয়োজন অনুষ্ঠানের ভেতরেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছিল। মা তার বরং তাঁর মনের, এবং যতটা তাঁর নিজের আয়ত্ত ততটা ধনেরও, প্রায় সবটাই ঢেলে দিয়েছেন দীনদুঃখীদের সেবায়। দরিদ্র ও আতুর সত্যসত্যই সেই প্রবীণা নারীর চক্ষে নারায়ণ! সে

নিজে কোন্ পথ ধরবে ? গরীবদের ওপর তার একটা সত্যিকার দরদ আছে। মায়ের রক্তের সঙ্গে সে সেটা পেয়েছে। দেশের বুকের ওপর দিয়ে আজ এক নূতন ভাবের ও উদ্দীপনার বান ডেকে যাচ্ছে। সে নিজে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়বে, না, তফাতে থেকে আর আর অনেক বড় মানুষের মতন শুধুই অবসর মত মাতব্বরি করবে, "বস্" সেজে পৃষ্ট-পোষকতা করবে ? নিজের গায়ে তেমন আঁচটি না লাগিয়ে "সিম্প্যাথাইজ" করবে ? সে বেশ বুঝেছিল, স্রোতটাকে একেবারে অস্বীকার করা তার পক্ষে অসম্ভব হবে। কিন্তু দেশে তার জমিদারীর কাছারিতে ব'সে, অথবা কল্কাতায় তার থিয়েটার রোডের বাড়ীটীতে ব'সেই, সে কি সেটাকে স্বীকার করবে ? সেরকমধারা স্বীকার করাই কি তার পক্ষে সহনীয় হবে, যথেষ্ট হবে, তৃপ্তির হবে ? আর যদি বা সে নিজেই সে স্রোতে লাফিয়ে পড়ে, তবেই বা তার কর্ত্তব্য হবে কি ? স্রোত যেদিকে টেনে নিয়ে যায়, সেই দিকেই ভেসে যাওয়া ? আজ্কের এই নূতন জীবনের স্রোতটাকে একটা নতুন আদর্শের, লক্ষ্যের দিকে প্রেরণা দিতে সে চাইবে না কি ? আজ সব্বাই, অথবা অনেকেই, যেটাকে যেভাবে দেশের ও দশের শ্রেয়ঃ মনে করছে, সে সেটাকে ঠিক সেভাবে সেরূপে শ্রেয়ঃ যদি ভাব্তে না পারে, তবে ? তার ধ্যানে যদি শ্রেয়ের দেবতা আর একটা প্রাণ, আর একটা প্রতিমা নিয়ে ফুটে ওঠেন, তবে ? আর, সেরকমধারা ফুটে ওঠার লক্ষণ কি এখনি দেখা যাচ্ছে না তার ভেতরে ?

এই দুটো ধারা গঙ্গা-যমুনার মতন অন্তরে তার সেদিন বহিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এই দু'টোই কি ? আর একটা ধারাও সরস্বতীর মতন অন্তঃসলিলা হইয়া, গোপন হইয়া, সমস্ত অন্তস্তলটা তার কি একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব রসে সরস করিয়া দিয়া বহিয়া যাইতেছিল না কি ?

গোপন সে ধারাটি, কিন্তু অন্তরতম, মধুরতম বুঝিবা সেটার রসসঞ্চার! এই যে তরুণী ও শিবিরটায় আজ রয়েছে—একটা আকস্মিক মুহূর্ত্ত তাকে কি তার সকল কামনার ও আশার, সকল চিন্তার ও কল্পনার, সকল চেষ্টার ও কর্ম্মের যেটা কেন্দ্র, তার কাছে এনে থুয়ে গেল? সে তার জীবনে এসে পড়ার আগে একটা কেন্দ্রই কি তার ঠিক হয়েছিল, এতটা স্থির, এতটা স্পষ্ট হ'য়ে? তাকে ভালবেসেছে কিনা, এ প্রশ্ন এখনও নিজেকে করে নি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন তাকে তার সবতার কেন্দ্রস্থলে বসিয়ে না রাখ্‌লে, তার আর চল্‌বে না ত'! একেই কি বলে ভালবেসে ফেলা? কে জানে! বুকের ভেতর একটা নতুন সোণার তার রিণিরিণি বাজ্‌তে সে আজ শুনেছে বুঝি। কিন্তু—কিন্তু এম্‌নি ক'রে অন্তরতম দেশে তার যে আজ অভ্যাগত, সে রয়েছে তার কতখানি দূরে! আর শিক্ষা-সহবৎ, রুচি, পছন্দ, আব্‌হাওয়া, এসব তাকে যে বড্ডই ফারাকে নিয়ে রেখেছে! সত্যিই যেন একটা আধ্যাত্মিক ঘন কোয়াসা মাঝখানে থেকে, সুচরিতার যেটা সত্যিকার আপন রূপ, সেটাকে, সুব্রতর আত্মার যেটা আত্মীয় পরিচয়, তার কাছে এনে দিচ্ছে না! একটা বিভিন্ন ভাবের দূরত্ব, একটা প্রতিকূল আবহাওয়ার অস্পষ্টতা, সৃষ্টি করে রেখেছে! চিত্রকূটে এসে সে দূরত্বত' দূর হয়নি, সে অস্পষ্টতাত' চ'লে যায়নি! বরং সমরেন্দ্র ওসব দিক্ দিয়ে···রুচিতে, পছন্দে, চা'লে চলনে, ভাবে চিন্তায়, তার কত না কাছে মনে হয়! সব দিক্ দিয়েই সেই কি তার সব চাইতে কাছে? কে জানে? এ শেষ প্রশ্নটা কিন্তু সুব্রতকে সহজে রেহাই দিল না। ঘুমাইয়া পড়িতে তার অনেকখানি রাত হইল।

ছোট তাঁবুটায়—যেখানে সুচরিতা শুইয়া ছিল—সেখানে তার স্বপ্নের "সাইকো এনালিসিস্" করিতে আমরা ভিড়িব না। ওদিকে এসময়

পা টিপিয়া যাওয়া প্রবীণ গল্পলেখকের পক্ষেও অমার্জ্জনীয় বেয়াদবি। আর, সমরেন্দ্র আর সুপ্রিয় সমস্ত দিন কুইক মার্চ্চে পরিক্রমার পর ঘুমিয়ে প'ড়ে বোধ লয় স্বপ্নটুকুও দেখিতেছিল না। তবে, ফ্রয়েডের অচরিতার্থ বাসনাগুলো বড় সর্ব্বনেশে জিনিষ!—সমরের বড় সাধের শিকারের সখত' সেদিন মেটে নাই; সে ঘুমাইয়া ঘুমাইয়া ফিউডেটরি ষ্টেটের জগদ্দল রাজ-হাতীটার হাওদায় চাপিয়া সেই মধ্যদেশের আদিম অরণ্যানী "গেমের" জন্য ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছিল নাত'?

তীর্থস্থানে তেরাত্রি না হোক, একটি রাত্রি বাসই কি তাদের পক্ষে একেবারে নিষ্ফল হইয়াছে? চিত্রগুপ্তের জমাখরচের খাতাটা দেখিয়া কাজ নেই। আর দেখিতে যাইবেই বা কে? তেমন তাগিদ থাকিলে না হয়, নচিকেতাঃ নামে নেই অকালপক্ক ডান্‌পিটে ছেলেটাকে তলব করা যাইত। কিন্তু পরপারের কাছারির খবর নেবার তাগিদ সেদিন চিত্রকূটপর্ব্বত-প্রান্তে ঐ তাঁবু দুটোয় ছিল না। পাণ্ডাজীর কোন অনুচরও তখন উপস্থিত ছিল না, তাদের সেই প্রসুপ্ত তাগিদ-বোধটাকে উদ্বুদ্ধ করিয়া দেবার জন্য।

তা না থাকুক, এ পারের একটা হিসাব শুইতে যাইবার আগেই সারিয়া রাখা ভাল। মানিকপুরের ডাকবাংলায় তারা সব বাই একটা সৌজন্য-শিষ্টাচারের আব্‌হাওয়াতেই বাস করিতেছিল। তাদের ক'জনের ভাবে চিন্তায়, রুচিতে সংস্কারে, অভ্যাসে আগ্রহে—যেখানে যেখানে মিল, আর যেখানে যেখানে গরমিল, সে সব জায়গা যেন সৌজন্য-শিষ্টাচারের বালি চূণকামের তলায় ঢাকা পড়িয়াছিল! যেখানটায় বা একটু আধটু ফাট দেখা গিয়াছিল, সেখানটায় কেহই বালির জমাট খসাইয়া দেখে নাই—সে ফাটটা বাইরেরই ফাট, না ভেতরের—একেবারে খিলেনের কি ভিতের! কিন্তু এখানে আসিয়া তাদের সেই আকস্মিক মিলনের ভেতরের

ফাটগুলোও অনেকটা বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সমরেন্দ্রর বিজাতীয় চা'ল-চলন মানিকপুরে থাকিতেই অবশ্য সুব্রতর চোখে পড়িয়াছিল। কিন্তু তার চিন্তায় ও রুচির ধাঁজগুলো, অভ্যাসগুলো সে নিঃসন্দিগ্ধভাবে ধরিতে পারিল এই খানে। সুব্রতর ভেতরটাও অবশ্য অনেকটা স্পষ্টাস্পষ্টি দেখিতে পাইল সমরেন্দ্র এখানে আসিয়া। সুপ্রিয়র সঙ্গে সুব্রতর বন্ধুত্বের সূত্রপাত মানিকপুরেই হইয়াছিল; কিন্তু এখানে আসিয়া তারা দু'জনেই দেখিল তাদের মিলনের ভূমিটা ততটা সমতল নয়। সে বন্ধুর ভূমির ওপর তাদের বন্ধুত্বের সৌধ যদি গাঁথিয়াই তুলিতে হয়, তবে ডিজাইনের সূত্রপাতটা নূতন করিয়া করিতে হইবে। সুপ্রিয় দেশকে স্বাধীন করার যে আকুতি, তার মদিরা "দেশেই" চোঁয়াইয়া নেয় নি। বিদেশের—হয়ত মস্কোরই—ক্রয়ারি থেকে চোঁয়াইয়া নিয়াছে বা নিতেছে। তবে, সে উগ্রমদের এক আধ চুমুক তার পেটে পড়িয়াছে বৈত নয়! সুপ্রিয়ও তার নূতন বন্ধুটিকে দেখিল কতকটা মিষ্টিকের চেহারায়। কিন্তু মিষ্টিসিজ ম—অন্তর্মুখীনতা—সে বোঝে না। যতটুকু বোঝে, দেশের তাতে ক্ষতি হইয়াছে বলিয়াই তার ধারণা। আর ধর্ম্মের যেটা প্রাণ, সেটা না হোক, ধর্ম্মের যে আকারটা, যে ব্যবহারটা তার চোখে পড়িয়াছে—ব্যক্তির জীবনে বা সমাজের জীবনে—সেটাকে সে ভালচোখে দেখিতে পারে নাই।

আর সব চাইতে মর্ম্মান্তিক ভাবে বোধ হয় সুব্রত বুঝিল তার আর সুচরিতার মাঝের ব্যবধানটা। বালির জমাটের ফাট সেটাত' নয়! একেবারে খিলেনের অথবা ভিতের ফাট কি সেটা? তাই যদি হয়—সর্ব্বনাশ! মিল কি করিয়া হইবে? অথচ, এদিকে, যেটা প্রাণেরও প্রাণ, সেটা যে মিলের নাড়ীই খুঁজিয়া মরিতেছে!

সুব্রত এও দেখিল—ওরা তিনজনে যে ঠিক এক ধাঁজে তৈরি তা'

নয়। কিন্তু তা না হইলেও, তারা যেন একই রকম আধ্যাত্মিক আব্-হাওয়ার দুর্গের ভেতর বসবাস করিতেছে। সুব্রত রহিয়াছে সেটার বাহিরে দাঁড়াইয়া। মানিকপুরের সৌজন্য-শিষ্টাচারের শেওলায় দুর্গের পরিখাগুলো প্রায় বেমালুম ভরিয়া ছিল। এখানে সেগুলো গভীর ও বিস্তৃতভাবে স্পষ্ট। কিন্তু—তবু সুব্রতর কেন জানি মনে হইতেছিল—কে যেন তার অন্তরটা থেকে ঐ দুর্গটার ভেতর পর্য্যন্ত একটা গোপন সুড়ঙ্গ খুঁড়ে চ'লেছে! বাইরের এই গভীর খাতটার ওপর প্রকাশ্য সেতু পড়িতে আপাততঃ দেখা নাই বা গেল! ফলকথা, সুব্রতর পায়ের তলায় একটা আশার কি ভরসার সুড়ঙ্গ খোঁড়ার শব্দ সে বোধ হয় পাইতেছিল। কিন্তু আশ্বস্ত হইতে পারে নাই সে। কি জানি কিসের একছা অস্বস্তিতে অধীর হইয়া উঠিতেছিল বাহিরে দাঁড়াইয়া। মস্কিল এই—হৃদয় যেখানে তার হাত দুটি বাড়িয়ে দেয় কাকেও কাছে পাবার জন্যে, মস্তিস্ক এবং আর আর অঙ্গ, সেখানে হয়ত তাদের হাতদুটি একেবারেই গুটিয়ে নেয়!

পরদিন একটু বেলা হইলে পর হনুমানধারা দেখিতে যাওয়া হইল। টরিষ্টের যদি চিত্রকূট পর্ব্বতের সংস্থানটা ভাল লাগিয়া থাকে ত' এ যায়গাটা আরও ভাল লাগিবে। লম্বা পাহাড়টা—এক জায়গায় যেন ঘুরিয়া কতকটা গোল হইয়া আসিয়াছে। গায়ে গাছপালা বড় বড় কালো পাথর—এ সবের অভাব নেই। অর্থাৎ, দস্তুরমত নৈকষ্য কুলীন পাহাড়ই সেটা। উঁচুও বড় মন্দ নয়। এক জায়গায় অনেকগুলো সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া পাহাড়ে যেখানটায় উঠিতে হইল, সেখানটায় "কোটীতীরথ"। উঠ্‌তে দু'একবার জিরিয়ে নিতে হয়েছিল। সেখানে ঝরণা আছে। একটা আশ্রমের মত সাধুসেবার আস্তানা আছে—মায় গোসেবার গোশালা পর্য্যন্ত। গো-সন্ন্যাসিহিতায়চ! সাধু অসাধু কোন রকম

লোকেরই ভিড় নেই ! বেশ ঠাণ্ডা চুপ্ চাপ। শুধু নীচের গাছগুলোতে ময়ূরের ঝাঁকের কেকার কসরৎ শোনা যাইতেছিল। পাহাড়টায় কে কবে বোরিং করিয়া, শুধু সপ্ত পুণ্য নদনদী কেন, কোটি তীর্থেরই পুণ্যোদক, সম্মিলিত ধারায় বুঝি এখানে ঝরাইয়া দিয়াছিল ? যেখানে রামলক্ষ্মণ-সীতা এসেছেন, সেখানে তেত্রিশ কোটি দেবতা আর তেত্রিশ কোটি তীর্থ অবশ্য গরহাজির থাকিতে পারেন না। তাঁদেরও সব আসিতে হইয়াছে। সমরেন্দ্র, সুপ্রিয়, সুচরিতা, হয়ত দেবতা ও তীর্থ বেচারীদের এরকমধারা টানাহেচড়ায় হেসে ফেলেছিল। কিন্তু সুব্রত বোধ হয় সেই কাটাই আশ্রমের বেদীতলের গোপন নির্ঝরটাকে এখানে একটিবার ব্যক্ত হইয়া ফুটিয়া উঠিতে দেখিয়াছিল ! এই কোটি তীর্থই দেখ্তে হয়ত একদিন আস্তে হবে—বিশ্বভুবনে যত প্রতারিত পরিশ্রান্ত তৃষ্ণার্ত্তকে !

পাহাড়টার কাঁধের ওপর দিয়া খানিকদূর যাইয়া মিলিল—দেবাঙ্গনা। একটা বড় গোছের ঝরণা কালো কালো পাথরগুলোর ধাপে ধাপে লাফালাফি করিতে করিতে নীচে নামিয়া গিয়াছে। দেবতা ও তীর্থেরা সব্বাই আসিলেন, আর দেবাঙ্গনারা আসিলেন না, একি হয় ? সন্ধ্যার অস্তরাগ সাবান দিয়ে এইখানটাতে বুঝি দেবাঙ্গনারা জানকীজীর অঙ্গ প্রসাধন করিয়া দিতেন ; পাহাড়ী মিষ্টিবাস বনফুলের মালা দিয়ে তাঁর কবরী বেঁধে দিতেন। দেবাঙ্গনা নামটা শুনিয়া সুব্রত একটিবার সুচরিতার মুখের পানে চাহিয়াছিল—ঈষৎ রাঙা গাল দুটি তার দেখিয়া মনে হইয়াছিল সেও বুঝিবা দেবাঙ্গনা প্রত্নতত্ত্বটা ঐ ভাবেই আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে ! বেশ চুপ চাপ বনপথের ভেতর দিয়া চলিয়া তারা শেষকালে পাহাড়টার মাথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। বন দু'ধারে ক্রমেই পাতলা হইতে চলিয়াছে।

খানিক দূর চলিয়া, এমন একটা যায়গায় তারা আসিয়া পড়িল,

যেটা তাদের সব্বাইকেই আশ্চর্য্য করিয়া দিল। একি!—উঁচু পাহাড়টার মাথায় মাথায় তারা চলিতেছিল; হঠাৎ কি দেবাঙ্গনারা মায়া খেলিয়া তাদের লইয়া কিঞ্চিৎ "কে'জো" পরিহাস করিলেন? বেমালুম তাদের হাত ধরিয়া নীচে কোন এক ফাঁকা ময়দানে ছাড়িয়া দিয়া গেলেন! সত্যিই ভোজবাজী নয়ত? পাহাড়ের মাথাটা আর যেন মাথা নেই, বুক হইয়া গেছে। আর অত বড় পাহাড়, তার বুকটা কম প্রশস্ত হইলে মানাবে কেন? একটা সমতলক্ষেত্র—বন্ধুরতার চিহ্নটুকু নেই। চারি ধারেই গগন কিনারা পর্য্যন্ত সে ময়দানের বিস্তার। কোন দিকেই মনে হয় না—বস্, ঐখানেই ময়দানটা শেষ হইয়া, হঠাৎ গড়াইয়া, কালো কালো পাথরের মস্তবড় একটা পাহাড়ের গা হইয়া, নীচে নামিয়া গেছে। সে ময়দানে দাঁড়াইলে পাহাড়টাকে ভুলিয়া যাইতে হয়—ভুলিয়া যাইতে হয়, একটা কষ্টকর চড়াই ভাঙ্গিয়া সেখানে আসিতে হইয়াছে, আবার একটা আয়াসসাধ্য উত্‌রাই ভাঙ্গিয়াই নামিয়া যাইতে হইবে। কোন্ যাদুকরী যেন তাদের আচম্‌কা মেঘের ওপর লইয়া আসিয়াছে, যেন একটা উপরকার লোকে! স্বর্গের মন্দারকানন অবশ্য দেখা গেল না—কিন্তু কোন্ মহর্লোকে যেন কোন সিদ্ধের প্রশস্ত তপোবন বিরাজমান! গাছপালা দু'চারিটা এখানে সেখানে। পৃথিবীর মাটিতে তারা শিকড় চালায় নি, মাটির রসে তাদের অবয়ব গড়িয়া ওঠে নি! মুগ্ধের মতন—আবিষ্টের মতন—চলিতে চলিতে হঠাৎ বাঁদিকে দূরে তারা দেখিতে পাইল—এক ঝাঁক হরিণ, কেউ শুইয়া কেউ বা দাঁড়াইয়া, এক সার গাছের ছায়ায় নিশ্চিন্তভাবে রহিয়াছে। জলজীয়ন্ত হরিণ গো—কনকমৃগ নয়, মরীচিকা নয়! তপোবন নয়, বল্‌ছিলে যে? ঐ যে পথের একধারে এক মৃগমিথুন কালিদাসের কোন্ একটা নাটকের

তাদের অভ্যস্ত পার্টটা একান্তে রিহার্সাল দিতেছিল—সমরেন্দ্রদের বুটের শব্দে চোঁচা দৌড় দিল চকিত মঞ্জুল চারিটি চাহনি তাদের মেলিয়া! তবে বুঝি তপোবন নয়? তপোবন হইলে এখানে ভয় টয় থাকিবে কেন? সেই চন্দ্রাপীড়-প্রণয়িনী, পুণ্ডরীক-প্রণয়িনীদের দেশ—গন্ধর্বলোক বুঝি বা এটা? তা' হইলে, খুঁজিয়া পাতিয়া দেখিলে একটা অচ্ছোদ সরোবরও মিলিয়া যাইতে পারে।

"সত্যিই ত! চারধারে গাছে ঘেরা কত বড় একটা পুকুর এর ওপর" —সুচরিতার নজরে প্রথমে পড়িল সেটা। সমরেন্দ্র তখন হরিণের পাল দেখিয়া তার বন্দুকটার সদ্ব্যবহার করিতে পারিল না—এমন চমৎকার রাজর্ষিদের বাঞ্ছিত মৃগমাংস আজ তাদের ভাগ্যে জুটিল না।—এই আপ-শোষটা বিনাইয়া বিনাইয়া সুপ্রিয়কে শুনাইতেছিল। অনায়ত্ত কুরঙ্গ-প্রিয়-অঙ্গ শোকে অবশ্য সুপ্রিয়র সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। সুচরিতার অচ্ছোদ-আবিষ্কার প্রথম সুব্রতরই মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

"সত্যিই, এখান থেকে আর নেবে যেতে মন চায় না। মনে হয়—এই পাহাড়ে লেকটার ধারে একখানা কুঁড়ে বেঁধে থেকে যাই। বেশ হয়, না—?"—সুচরিতা ধীরে ধীরে বলিল! কারুর দিকে চেয়ে ছিল না সে তখন। গলার স্বরটায় কি যেন একটা অতি মৃদু, অস্পষ্ট মধু আহ্বানের ইঙ্গিতটুকু ছিল। তাই না কি? সুব্রতর অন্তরতম প্রদেশে একটা শিহরণ খেলিয়া গেল। চুপ করিয়া রহিল সে। সুচরিতাও যেন বাইরে কারুকৃথে শোনার জন্যে কথাক'টা বলে নি। তার মনের কোণেই কার সঙ্গে সে কাণাকাণি করিয়াছে! উত্তর সে আশা করে নি, চুপ করিয়া রহিল। সে কাদ-ম্বরী মহাশ্বেতার দেশের আকাশ বাতাস তার একটা গোপন দীর্ঘশ্বাস চুরি করিয়া রাখিল কি? সুব্রতর দীর্ঘশ্বাসটা বোধ হয় একটু দীর্ঘই

হইয়াছিল—সুচরিতার কাণেও সেটা যায় নি ত'? সুচরিতা এবার একটু হাসিয়া তার সব-উপমায়-লজ্জা-দেওয়া সেই চোখদুটি তুলিয়া সুব্রতর মুখের দিকে চাহিল।

"চলুন, অনেক দূর এগিয়ে প'ড়েছেন ওঁরা।"

সুব্রত তখন সেই সুড়ঙ্গটা কোঁড়ার শব্দ বোধ হয় শুনিতে পাইতে ছিল—যেটা তার আর নিজের মাঝে মস্তবড় ব্যবধানটা গোপনে বুঝি কুঁড়িয়া কুঁড়িয়াই চলিয়াছে!

"পাহাড়ের ওপর সুন্দর সুন্দর লেক আমাদের দেশে কাশ্মীর, ওদেশে সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি অঞ্চলে ঢের আছে। কিন্তু এটা যে পাহাড়ের মাথার ওপর পাহাড় ভুলিয়ে দেওয়া একটা ফাঁকা ময়দানে মায়া-সরোবর!—যাতে মাঠের হরিণী নিঝুম দুপুর বেলা জল খেতে আসে—যার তীরে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে, তাকিয়ে সে থাকে—মাঠের ঐ দূর সীমানায় কোথায় তার সেদিনকার সাঁঝের সঙ্গীটি ফেঙ্‌ড়াবেরোনো শিঙটি তার দোলাতে দোলাতে মেলার পথে চ'লে আস্‌ছে।"

"বাঃ—হরিণীর চোখ দুটোয় একটা কিছু কবিত্বের রঙ্ ফলিয়ে দিলে—আপনার এ বর্ণনাটা অলঙ্কার শাস্ত্রের একটা রসের নমুনারূপে গ্রাহ্য হ'য়ে যেতে পার্‌ত।"—দুজনেই হাসিল।

আর সব্ বাইকার সঙ্গে তারা আসিয়া জুটিল।

"পাণ্ডাজী, তোমার হনুমানধারা আর ক'দ্দর? এ যে তেপান্তরের মাঠরে বাবা—চল্‌ছিত চ'লেছিই।"—সুপ্রিয় জিজ্ঞাসা করিল।

"ঐ যে সাম্‌নের ঘরের ওপর নিশেনটা দেখা যাচ্ছে, ঐখানে জানকীজী রসুই ক'রেছিলেন। ঐখানেই নীচে হনুমানধারায় নাম্‌বার রাস্তা"—ছড়িদার পথপ্রদর্শকটি জানাইয়া দিল।

ভক্তশ্রেষ্ঠ হনুমানজী এ ভক্তচতুষ্টয়কে বঞ্চনা করেন কি রূপে?

প্রত্যক্ষদর্শনই দিতে হইল। অদূরে দেখা গেল দুদিকে থেকে দুদল হনুমান্ আসিয়া একটা খণ্ডযুদ্ধের অভিনয় করিলেন। তৎপরে ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিয়া অদৃশ্য হইলেন! ছড়িদার প্রভুপাদটি খৈনী নিষ্ঠীবন সিঞ্চনে হনুমান্ পর্ব্বতজীর মস্তক পবিত্র করিতে করিতে চলিতেছিলেন—এইবার দেবতার সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া পরমপুলকিত চিত্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত করিলেন। ভক্তচতুষ্টয় দেবদর্শনে এতই ভক্তি গদ্গদ হইয়াছিলেন যে, কণ্ঠে তাঁ'দের বাঙ্নিষ্পত্তি হইল না। কেবল সমরেন্দ্রর হাতটা সুড় সুড় করিতেছিল—হায়, এ হেন সমরাঙ্গনেও কোথাও অস্ত্রলেখাটি তার অঙ্কন করিয়া দেবার সুযোগ হইল না!

জানকীজীর রসুইএর ঘরটায় উঁকি মারিয়াই নীচে নেবে পড়ার সিঁড়িতে তারা পা দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই আকাশ ময়দানের ভেল্কিটা তাদের ভাঙ্গিয়া গেল। কোন্ আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপটা ঘষিয়া সৃষ্টি হইয়াছিল তাদের সেদিনকার পথচলার সেই সমুন্নত মহর্লোক না গন্ধর্ব্বলোক? যাক্—আবার সেই কালো কালো পাথরের যত যতসব নল নীল গয় গবাক্ষ, তাঁরা পাহাড়ের গায়ে গায়ে দিব্বি ঘুমাইয়া লইতেছেন দেখা গেল। খ্যাসা লম্বোদর স্ফীতোদের বটে! বেশ খাড়া সিঁড়ির ধাপ—অনেক দূর নেবে গেছে। ক'টা মনুমেণ্টের সমান উঁচু হবে সে যায়গাটা? কে জানে! গোটাকতক ধাপ নেমে এসেই দেখা গেল—আবার একটা তীর্থ। অনেকগুলো পাকা ঘর টরও রহিয়াছে। পাণ্ডা, লোক জনও কিছু কিছু বর্ত্তমান। সংস্থানটা মনোরম—পশ্চিম আকাশের যা কিছু রূপ আর বর্ণের গৌরব, তা সেটাকে স্পর্শ, অভিনন্দিত না করিয়া যাবে না, বন্দোবস্ত করা আছে। একটা বড় কালো পাথরের গা গড়াইয়া ঝির্ ঝির্ ঝির্ জল পড়িতেছে—একটা চৌবাচ্চায় সে জল

জমিয়া ছাপাইয়া নীচে গড়াইয়া যাইতেছে। হনুমানজী একদিন তাঁর বুক চিরিয়া দেখাইয়াছিলেন—তাতে রাম নাম লেখা। তাঁর সেই ত্রেতা যুগের বুকের ক্ষতটা কি আজও শুকায় নেই? বুকের যত সব ছিন্ন ধমনী বহিয়া আজও ঝির্ ঝির্ ঝির্ ঝরিতেছে, সেই অমর সেবকের বুকের রক্ত—স্নিগ্ধ, অনাবিল, পাবন ধারায়! হে চিরন্তন, চির-কল্যাণ-ময়, চিরপাবন হনুমান ধারা! তোমার এই শাশ্বতী স্নেহময়ী ভাবময়ী মূর্ত্তিকে আজ নমস্কার! বিশ্বে যেখানে যত বুকের ক্ষত হইতে রক্তকণা যুগ যুগ ঝরিতেছে, তোমার রামনামাঙ্কিত বুকের রক্তের স্পর্শে তারা শান্ত হবে, পুণ্য হবে, ধন্য হবে! তোমার বুকে লেখা রাম, তাই তোমার স্পর্শ প্রণারাম! আর সব বুকের রক্তে লেখা কাম, তাই তাদের স্পর্শ জ্বালাময়, লেলিহান!

সমরেন্দ্রর পার্টি কিছু ক্লান্ত হইয়াছিল। এখানে বড় একটা গাছের ছায়ায় তারা একটু দাঁড়াইল, ছড়িদারটি লোটা ভরিয়া জল আনিয়া দিল। এমন জায়গাতেও চমৎকার একটা গুহার ভেতরে ঠিক হনুমান ধারার পাশেই দেখা গেল, পুণ্যের দোকান খুলিয়া বসিয়া আছেন একটি গলিতনখদংষ্ট্র তীর্থ ব্যবসায়ী! ব্যবসা ব্রহ্মলোক, শিবলোক, বৈকুণ্ঠ—কোথাও বন্ধ নেই? ব্যবসাদারটি তাঁর মাল বিকাইবার জন্য চেঁচামেচি করিতেছেন—মাল বিক্রী না হইলে অথবা আশানুরূপ মূল্য না পাইলে, বিড়বিড় করিয়া খরিদ্দারের চৌদ্দপুরুষের পারলৌকিক মুণ্ড চর্ব্বণ করিতেছেন—দেখিয়া সব্বাই বিরক্ত হইল। মোদ্দা, একটা কিছু চর্ব্বণ তাঁর চাই-ই—হয় রাজ-মুণ্ডাঙ্কিত ঐহিক তাম্র, রজতখণ্ড, হয় যমদণ্ডাঙ্কিত পারলৌকিক মুণ্ড। এমন কি, সুব্রতও বিরক্ত হইল। অন্ততঃ এ যায়গাটা ঐ "কোটিতীরথ" আর "দেবাঙ্গনার" মতন নিরিবিলি হইলেই ভাল হইত—তার মনে হইল।

একটা আঙ্গিনার মতন যায়গা পাথরের স্ল্যাব বসাইয়া তৈরী। এক দিকে পাহাড়ের গাটাই খাড়া উঠিয়া গিয়াছে, অন্য দিকে একেবারে পাঁচ সাত তলা নীচু একটা খাড়াই অবরোহণ—কি ব'লে চল্‌তি কথায়?—খাদ? যাই হোক্—খাদই সই—খাদটার ধারে আল্‌সের মতন করিয়া সামান্য উঁচু পাথরের একটা গাঁথ্‌নি তুলিয়া রাখা হইয়াছে, দেখা গেল। পাছে কেউ পড়িয়া যায়। কিন্তু ও কি? ঠিক আল্‌সের ওপর বসিয়া রহিয়াছে একটা বুড়ী। বুড়ী বৈকি—নারী না কি কুড়ি পেরুলেই বুড়ী। আমাদের এ বুড়ীটি কিন্তু জ'টে বুড়ীর মত লাঠি ধরিয়া গুড়িগুড়ি চলা বুড়ী নয়। আধা বয়েসী—কিন্তু চুলগুলো তার প্রায় সাদা হ'য়ে গেছে। পরণে গেরুয়া, ছিন্ন নয়। গলায় মালা, স্ফটিকের বুকনি দেওয়া নয়। দেখিতে বেশ সৌম্য, ভদ্র চেহারা। ঠিক আল্‌সেটার ওপর বসিয়া বুড়ী ঢুলিতেছিল না কি। পড়িলেইত সর্ব্বনাশ!

সমরের টন্‌টনে পাব লিক কর্ত্তব্যজ্ঞান তাকে স্থির থাকিতে ছিল না।

"এই বুড়ী! আল্‌সের ওপর ব'সে ঘুমোচ্ছ কেন? নেবে বস। নৈলে প'ড়ে যাবে যে!"—সে সাবধান করিয়া দিল; অবশ্য উদ্‌বোধন পর্ব্বে তার হাকিমি ষ্টিক্‌টার সংস্পর্শ ওক্ষেত্রে অনাবশ্যক ও অশোভন, এবং সে তা হইতেও দেয়নি।

বুড়ী চোখ ছুটি খুলিল। কিন্তু চম্‌কে ওঠে নি সে। বেশ ধীর, অবিচলিত। চোখ ছুটি তার ধ্যানের দৃষ্টি—তার পেছনে, একটা যেন অগাধ বিশ্বাস আর প্রেম!

"রামজী যদি রাখেন, কিছুতেই আমি পড়ব না, বাবা। আর রামজী যদি মারেন, তোমরা কেউ আমার পড়া ঠেকাতে পারবে না।" —বিশ্বাসের কোন্ গভীর তপোগুহা হইতে কথা কটি তার বাহির হইয়া আসিল কে জানে!

সুচরিতার কাণে এবং প্রাণে কথাক'টা নূতন। কিন্তু সে হাসিল না, একটু গম্ভীর হইল। সমর, আর বোধ হয় সুপ্রিয়ও, হাসিল।

"এইরকমধারা 'রামজী রাখ্‌বেন আর রামজী মার্‌বেন' ক'রেই এত বড় একটা দেশত' পক্ষাঘাতের রুগী হয়ে প'ড়েছে। আত্মপ্রত্যয়, আত্মনির্ভর নেই।"—সমরেন্দ্র বলিল।

ভগবানে বিশ্বাস না হইলে খাঁটি আত্মপ্রত্যয় হয় না, আর তাঁতে নির্ভর না হইলে সত্যিকার আত্মনির্ভরও হয় না—এই উত্তরটা সূত্রাকারে সুব্রতর মনের ভেতরে একবার উদিত হইল। কিন্তু এ যায়গায়—যেখানে হনুমানজীর রামনামাঙ্কিত বুকের রক্ত এখনও ঝির্ ঝির্ ঝরিতেছে—তার তর্ক করিতে প্রবৃত্তি হইল না। বিশেষ, সুচরিতার গম্ভীর মুখখানা তার চোখে পড়িয়াছিল। কি জানি কেমন করিয়া হইল—আস্তে আস্তে যাইয়া বুড়ীর পায়ের ধূলা লইল সে। সাধুবন্দনা জীবনে এই তার প্রথম। আর শুনিলে সব্বাই আশ্চর্য্য হবে—সুচরিতাও যাইয়া প্রণাম করিল। তারও এই প্রথম।

"রাম্‌জী, তোমার ভাল কর্‌বেন, বাবা। আর, মায়ী, তুমিও বড় লক্ষ্মী হবে, ভাগ্যবতী হবে রাম্‌জীর কৃপায়।"

বর্ষীয়সী উদাসিনীর মুখে রামজীর এই আশীর্ব্বাদ তারা দু'জনেই শ্রদ্ধার সঙ্গে বরণ করিয়া লইয়াছিল বোধহয়। ভবিষ্যতে ভাগ্যবতী সে হবে কিনা জানে না, কিন্তু আজ তার এই আকস্মিক "দুর্ব্বলতায়" সমরেন্দ্র আর সুপ্রিয় যে তাকে প্রশ্ন ও বিদ্রূপ, এ দুটো হইতেই তখনকার মত রেহাই দিয়াছিল, এতে সুচরিতা আপনাকে উপস্থিত কম ভাগ্যবতী মনে করে নাই। বাস্তবিক, সেও জানেনা, কেমন করিয়া কি হইল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ্ সিঁড়ি ভাঙ্গিয়া নীচের দিক্ তারা নামিয়া

চলিল। নামিবার সময়ও জিরাইয়া লইতে হয়। দাব্নায় ব্যথা ধরে। যখন নীচে নামিয়া আসিয়াছে তারা, তখনও হনুমানধারার রক্ত-পতাকাটাকে উড়িতে দেখা গিয়াছিল পর্ব্বতগাত্রে স্তরে স্তরে ঘন-বিন্যস্ত বৃক্ষশ্রেণীর অবকাশের মধ্য দিয়া। কিন্তু সেই উদাসিনীটি? সুচরিতার মনের ভেতর থেকে তার ছবিটি কিন্তু তখনও মুছিয়া যায়নি। ভারি সৌম্য, দীর্ঘজীবনের যত পরীক্ষিত সত্য প্রত্যয় আর পবিত্রতা মাখানো সে মুখচ্ছবি! আর কখনও কি দেখা হবে? কে জানে!

নীচে সুচরিতার জন্য পাল্কির মতন একটা যানের ব্যবস্থা রাখা হইয়াছিল। এতক্ষণ হাঁটিয়াই আসিয়াছে সে। পাল্কিতে ঢুকিতে তার অনিচ্ছা হইতেছিল—বোধ হয় কতকটা লজ্জাও। শুনেছে পাড়া-গাঁয়ে বিয়ের ক'নেরা পাল্কি চেপে যায়। বেশত! সে পাড়াগেঁয়ে বিয়ের ক'নে নাকি, যে পাল্কি ক'রে যাবে? শেষপর্য্যন্ত কিন্তু নিজের পায়ের অবস্থাটা, সমরেন্দ্র ও সুপ্রিয়র তত্ত্বাবধানে, বেশ ক'রে "ডায়ও-গ্নসিস্" ক'রে, তাকে পাল্কিতে ওঠার অনিচ্ছা আর লজ্জা, এ দুই-ই হজম করতে হ'ল।

পাহাড়টা ছাড়িয়া চলিয়া যাবার সময় সুব্রতর একবার মনে হইয়াছিল—চিত্রকূটে সুচরিতার সঙ্গে তার যে ব্যবধানটা সে আবিষ্কার করিয়াছিল, হনুমানধারা তাদের সেই ব্যবধানটাকে নিশ্চয়ই বড় করিয়া দেয় নাই। পাহাড়ের ওপরে সেই প্রান্তরের মাঝখানে সেই সরোবর-তটে সুচরিতার প্রথম সেই কথা ক'টি—"এখানে কুটীর বেঁধে থেকে গেলে বেশ হয়, না?"—তখনও তার অন্দর মন্দিরের মাঝে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, অচ্ছোদতটে মহাশ্বেতার বীণাটিরই বুঝিবা একটা অমর অনুরণনের মতন! সে বীণার বাণীটি কি ভাষা তার মনের কাণে আজ ক'য়ে গেছে?

তারপর, হনুমানধারা আশ্রমে সেই বর্ষীয়সী তপশ্চারিণীর পায় তার মৌন অভিবাদন—এই একটামাত্র স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গীতেই কি সে সরাইয়া দিল না—তাদের মাঝখানে যে ঘন আধ্যাত্মিক কোয়াসাটা সে কা'ল চিত্রকূটে আবিষ্কার করিয়াছিল? অনেক কিছু আচরণ, অনেক কিছু আলাপের ভেতর দিয়া সে কোয়াসাটা জমিয়া উঠিয়াছিল বটে, কিন্তু তা' হইলেও, সেটা কি শেষপর্য্যন্ত একটা কোয়াসাই—একটা মরীচিকাই নয়? আর, ছোট খাটো একটা আকস্মিক অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়া প্রকাশ পাইলেও, উদাসিনীর ভগবন্নিষ্ঠা, তপশ্চর্য্যা ও পবিত্রতার পায়ে তার আজিকার ঐ প্রণতিটুকুই কি হইল তার ভেতরকার নিগূঢ় বাস্তব সত্যের সত্য পরিচয়?

কা'ল সমস্ত দিন ধরিয়া আন্তরিক প্রভেদ ও পার্থক্যের যে জালটা সে বুনিয়াছিল, আজকে এই হনুমানধারায় দু'টি মুহূর্ত্তে—মাত্র দুটি মুহূর্ত্তে—সে সে জালটা কি ছিঁড়িয়া রাখিয়া যাইল, বালকের খেলা মস্তবড় একটা মাকড়শার জালকে যেমনধারা হেলায় ছিঁড়িয়া রাখিয়া যায়?

এতখানি আশ্বাস পাইতে অবশ্য সুব্রত তখন ভরসা পাইল না, কিন্তু তবুও, সেই গোপন সুড়ঙ্গ কাটার আওয়াজ আজ বুঝি তার কাণে স্পষ্ট শোনা গিয়াছিল!

আজকে টেণ্ট আর চিত্রকূট-পর্ব্বতপ্রান্তে ছিল না, অন্যত্র সরাইয়া আনা হইয়াছিল। সেদিনই অপরাহ্ণে ভরতকূপ হইয়া মাণিকপুরে "ফেরত গোষ্ঠ" করার কথা। তখন অনেকখানি বেলা হইয়া পড়িয়াছিল—পাহাড়ের ওপরে বেশ হাওয়া ছিল, কিন্তু নীচে খুবই গরম। পরিশ্রান্ত, ঘর্ম্মাক্ত হইয়া তারা টেণ্টে ফিরিল। একটা বড় পুকুরের ধারে আম্রকুঞ্জের ছায়ায় তাদের টেণ্ট সহজেই তাদের শ্রম অপনোদন

করিয়া দিল। আহারাদির ব্যবস্থা সেদিনও নিরামিষ। এত ঝাঁকে ঝাঁকে হরিণ থাকিতেও নিরামিষ! ভোগের এত আয়োজন চার পাশে ছড়ানো, তার মধ্যে ত্যাগী হইয়া বসিতে সমরেন্দ্র, আর বোধ হয় সুপ্রিয়ও, মনে মনে বিদ্রোহী হইতেছিল। তাদের এই "ট্রিপ্‌টাই" বোধ হয় তার মুখ্যাংশেই পণ্ড হইয়া গিয়াছে—তাদের আমোদটা শুধু নিরামিষ নয়, আলুণো হইয়া গিয়াছে—এই অনুভূতিটা সমরেন্দ্র অতি কষ্টেই দাবিয়া রাখিতে পারিয়াছিল।

বেলা পড়িলে তারা ভরতকুপের দিকে চলিল। ভরতকূপ শাখা-লাইনে আর একটা ষ্টেশন। চিত্রকূট হইতে ক'মাইল দূর। ভরতকূপে একটা কূয়ো দেখাইয়া পাণ্ডারা বলে—সেটা স্বয়ং ভরতজীই কাটিয়ে দিয়ে গেছ্‌লেন। কুয়োটা বড়, পুরোণোও বটে। কালো কালো পাথরের স্ল্যাব্‌ সাজাইরা বসাইয়া তার ভেতরটা বাঁধানো হইয়াছিল। এখন সেই স্ল্যাব্‌গুলো যায়গায় যায়গায় ফাঁক হইয়াছে, আর ভেতরে সাদা পায়রা বাসা বাঁধিয়াছে। নিকটে ও দূরে ছোট বড় পাহাড়ের অভাব নেই। কিন্তু ভরতকূপ যায়গাটা পাহাড়ের ওপর নয়। নীচের সমতল যায়গায়।

সেদিন বিকালে অশ্বারোহণে তারা চলিয়াছিল। এমন কি, সুচরিতাও। তার জন্য একটা লেডিজ স্যাড্‌ল "ইম্‌প্রোভাইজ্‌" করিতে হইয়াছিল। দুইদুইবার সে পাল্‌কিতে উঠিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। সেদিন সকালে ঐ যা একবার!—সেটা বোধ হয় কতকটা বস্তুগত্যা, আর কতকটা পল্লীবধূদের অভিজ্ঞতার একটা অপূর্ব্ব আস্বাদ পাবার লোভে। গম, ভুট্টা এ সবের ক্ষেতে তখন ফসল ছিল কি?—যাক্‌, বেশ উর্ব্বরা মনে হইল যায়গাটা। অনেক গ্রাম, অনেক মাঠ, আর বেশীর ভাগ বাঁধারে কতকগুলো পাহাড়—যে গুলোর মাথা সম্ভবতঃ

বুকেরই মতন—থুইয়া তারা ধীরে ধীরে চলিতেছিল মেঠো একটা পথে। ততদূরে প্রাণিহিংসা নিষেধের পরওনা জারি ছিল না। সমরেন্দ্র দু'একটা পাখী মারিয়া তার শিকারের দুধের তেষ্টা ঘোলে মিটাইয়া লইয়াছে। সন্ধ্যা হইয়া গেছে। ভরতকূপের কাছাকাছি এসে একটা বড় রকমের পাহাড়ের প্রায় গা ঘেঁসিয়া তারা চলিতেছিল। পাহাড়ের গায়ে খুব জঙ্গল। কোথায় যেন আঁধারে একটা ঝরণার কুলু কুলু কুলু শোনা যাইতেছিল। পথটাও ঝোঁপজঙ্গলের ভেতর দিয়া। টর্চ্চলাইটে পথ দেখিয়া শুনিয়া চলা হয়ত' যাইত—কিন্তু তাদের বাহন "পঙ্‌ক্ষীরাজ-গুলো" টর্চ্চলাইট্‌ মোটেই পছন্দ করিতেছিল না। কাজেই, আঁধারেই তারা চলিতেছিল। স্বয়ং সমরেন্দ্র পুরোভাগে। সুব্রত সব্বাইকার পেছনে। সব চুপ্‌ চাপ্‌। হঠাৎ সমরেন্দ্রর ঘোড়া থম্‌কিয়া কাণ খাড়া করিয়া দাঁড়াইল। ঐ সাম্‌নের নালার ধারে ঝোপটা থেকে কি একটা শব্দ ওটা? কুকুর দু'টো ঘেউ খেউ করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সূচনার পূর্ব্বেই তাদের নির্ব্বেদ উপস্থিত হইয়াছিল। গুটিত-পুচ্ছ হইয়া তাঁরা দুটিতে "অর্দ্ধবাহু" দশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি? কেইবা সেদিকে লক্ষ্য করিবে তখন? সমরেন্দ্রের হাতে টোটাভরা বন্দুক ছিল—কিন্তু সেও বুঝি হতভম্ব হইয়া গেছে। তার তখন "অন্তর্দ্দশা" বুঝি? সেই জানে। অথবা, সেও বুঝি জানে না। ঝোঁপ থেকে প্রায় একজোড়া টর্চ্চেরই মত রোশনাই একবার দেখা গিয়াছিল। আর একবার সেই ভৈরব গুরু মন্দ্র। তার পর মুহূর্ত্তেই দু'বার বন্দুকের আওয়াজে এই পার্ব্বত্য বনভূমি ধ্বনিত হইয়া উঠিল। আর একটা ভয়ানক গর্জ্জন করিয়া কি যেন একটা কি পার্টির ঠিক সাম্‌নেই লাফাইয়া পড়িল। পার্টি তখন গড়ের মাঠের মাউন্‌টেড্‌ ষ্ট্যাচু!

সুব্রত টক্‌ করিয়া ঘোড়া লাফাইয়া যাইয়া সমরেন্দ্রর হাত থেকে

বন্দুকটা লইয়া বাঘটাকে দুই গুলিতে শেষ করিয়াছিল। চোখের পলক ফেলিতে ফেলিতে এই কাণ্ড সমাধা হইয়াছে। বাঘটার বিকশিত চারু দশনপাতি, আর বিরাট্ প্রস্ফুটিত পদ্মহস্ত, প্রাণান্তের পরও, তাদের আতঙ্কের মাত্রা সহসা কমিতে দেয় নাই। "ট্রফিটি" বহন করিয়া নেবার সুযোগ ছিল না। বিশেষ, সমরেন্দ্রর কাছে সেটা যে লজ্জারই "ট্রফি"। হরিণ আর পাখীর বেলায় তাকে যে বেজায় উৎসাহী দেখা গিয়াছিল!

মিনিট পনের পরে পার্টি আবার চলিতে লাগিল। ভরতকূপ ডাইনে রাখিয়া রেলওয়ে-ষ্টেশনের দিকে তারা চলিয়াছে। আর বন-জঙ্গল নেই, ফাঁকা জায়গা। ষ্টেশনের কাছাকাছি যখন তারা এল, তখন রাত্রি সাড়ে আট্টা হবে। একটা অনুচ্চ নেড়া পাহাড় বাঁদিকে। কোন্‌খানে পাহাড়ের কোলে একটা বড় রকমের কিসের কারখানা তখনও চলিতেছিল বুঝি। দূরে ইলেক্‌ট্রিক লাইট্ অনেকগুলো জ্বলিতেছে। শুর্‌কির রাস্তার ধারে দিব্যি তৈরি অনেকগুলো "লন্"। অদূরে কতকগুলো বাংলোও দেখা যাইতেছিল। সঙ্গের গাইড্‌টি বলিল—কিসের একটা কারখানা। কোন্ সাহব-কোম্পানী নাকি চালাচ্ছে। কতকগুলো সায়েবসুবোও থাকে।

দুর্ভাগ্য বুঝি একলা আসে না। সেদিন সমরের মন্দ বরাতটার "কাপ" ছাপাইয়া পড়িবে বুঝি? সঙ্গের কুকুরদুটো ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল। এতক্ষণে মৌনব্রত তারা ভাঙ্গিয়াছে। লাঙ্গুলও তাদের পশ্চাৎ-পদযুগলের অন্তরালের আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে, সগৌরবে ফিরিয়া আসিয়াছে। কুকুরের দস্তুরমত লড়াই বাধিয়া গেল। বোধ হয় আর কেহ স্বজাতি তাদের সে অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই অন্ধকারে একটা অগ্নিবিন্দু বেগে অগ্রসর হইতেছে দেখা গেল। ওঃ—

সায়েব! কারখানার অথবা আর কোথাকার কোন্ সাহেব তিনি, প্রকাশ নেই। তাঁর কুকুরকে আর দুটো কুকুরে, সম্ভবতঃ কালা আদমির কুকুরে কামড়াইয়াছে—তিনি ত' একেবারে অগ্নিশর্ম্মা! হাতে ছিল ছড়ি। পার্টির নেতা ছিল সমরেন্দ্র, তার পিঠে পড়ে আর কি। আর চাবুক-বর্ষণের উদ্যোগে কি সুললিত গভীর সামমন্ত্র সায়েবের শ্রীমুখে নির্গত হইয়াছিল! চাবুক পড়ার আগেই মিঃ সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি অবশ্য দস্তুরমত "এ্যাপলোজাইজ্" করিলেন। সে নাকি ভারি দুঃখিত হইয়াছে এই দুর্ঘটনাটার জন্য—সায়েব সেখানে আছেন জানিলে সে নিশ্চয়ই কুকুরের গলায় চেন্ দিয়া লইয়া যাইত—ইত্যাদি ইত্যাদি—সে বিনাইয়া বিনাইয়া সায়েবের শ্রীকর্ণে শোনাইতে লাগিল। সায়েবদের শ্রীকর্ণের প্রসাদ কি করিয়া সুষ্ঠ উৎপাদন করিতে হয়, তা' সে বিলক্ষণই জানিত বোধ হয়।

কিন্তু বর্ত্তমান ক্ষেত্রে তার সে সিদ্ধবিদ্যাটায় ফল ফলিতে দেখা গেল না। সায়েবকে আরও বেশী উত্তেজিত হইতেই দেখা গেল। হয়ত' কিঞ্চিৎ "লিকরের" মাহাত্ম্যও সে ক্ষেত্রে ছিল। তারপর, সায়েবটা ও অঞ্চলের ছোটবড় কোন উষ্ণীষধারীদেরই বোধ হয় কোন দিন তার কুকুরের চাইতে বেশী সম্মান দেয় নি। সমরেন্দ্রের লম্বা এপোলজির ভেতরই সে সুচরিতাকে লক্ষ্য করিয়া কি একটা বেয়াড়া পরিহাস করিল। সমরেন্দ্র রীতিমত "প্রোটেষ্ট" করিতে যাইতেছিল। কিন্তু দেখা গেল, তখনি আশু আক্কেলোৎপাদক উপায়বিশেষের প্রয়োগের পর সায়েব "অল্‌রাইট" বলিয়া সুব্রতর করমর্দ্দন করিল, আর তার সঙ্গে দুটো চারটে মিষ্টালাপও করিল। ওদের ঐ একটা মস্তবড় গুণ!

নয়টার গাড়ীতে মাণিকপুরের দিকে তারা চলিল। ঘণ্টাখানেকও লাগে না। সেদিন সন্ধ্যার পর পর দুটো ঘটনা তাদিগকে বেশী কথা-

বার্ত্তা চালাইতে দেয় নাই। সুব্রত আজ তাদের সকলেরই চোখে খানিকটে বড় হইয়া গেছে। এমন কি, সমরেন্দ্ররও চোখে। সে লজ্জা পাইয়াছিল—"ক্রেষ্ট ফলন্" হইয়াছিল। সেদিনকার নেতৃত্বের মুকুটটা তার মাথায় শোভা পায় নি যে! কিন্তু সে লোকটা মন্দ ছিল না বোধ হয়। পারত' পক্ষে অবিচার সে করিত না। সুব্রতর প্রাপ্য শ্রদ্ধাটা সে আজ তাকে মনে মনে দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। খদ্দর পরা নিরামিষ লোকটাত' সহজ নয়! শার্দ্দূল ও সাহেব—উভয় সঙ্কটেই সমান নির্ভীক। আর সমরেন্দ্র এটা লক্ষ্য করিয়াছিল—সে সুন্দর ইংরেজী বলিল সায়েবটার সঙ্গে। তার উচ্চারণ, ভাষা, ভঙ্গী—সবই অনবদ্য। সচরাচর কিন্তু সে ইংরেজি বুকুনির দিকে ঘেঁষিত না। পাড়াগাঁয়েই জীবনটা কাটায় নি সে নিশ্চয়!

তারপর দিন রাত্রির বোম্বেমেলে সুব্রত কলিকাতায় যাবে স্থির করিল। সেদিন সকালে সুষমাবৌদির এক চিঠি সে পেয়েছে। বৌদিদির অন্তর্দৃষ্টিটি মর্ম্মভেদী—তিনি, তার মাণিকপুরে "ডিরেল" হইয়া পড়িয়া থাকার "প্রোজেয়িক" ব্যাপারের মধ্যেও একটা নতুন "রোমাণ্টিক" "লাইন্" টাইন খোলার সূচনা হইয়াছে কিনা শুধাইয়াছেন। পুরোণো লাইনটেত' "জাম" হ'য়ে গেছে, এখন একটা লাইন্ পেতে নিতে হবে বৈকি! সেই চিরপরিচিত চির-অচেনা পুষ্পধন্বার দেশেই "ল্যাণ্ড আকোয়ার্" ক'রে প্রাণটার পরতে পরতে পেতে যেতে হবে সে নতুন লাইনের পাটিগুলো! সেদিন আর সুব্রত চিঠির কোন উত্তর দিলনা।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু প্রায় সেরে উঠেছেন। তবে সেখানকার জলহাওয়াটা তাঁর ভাল লেগেছে। আরও দু'চার দিন থেকে যাবেন। সেদিন সব্বাইকার সঙ্গে মিষ্টালাপে সুব্রতর দিন কাটিল। সমরও তাঁকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিল—তার কর্ম্মস্থলে যাইয়া দিনকয়েক থাকিয়া আসিতে।

এ নিমন্ত্রণটি সুব্রতকে রক্ষা করিতে হইয়াছিল। কবে—কি ভাবে —পরে আমরা জানিতে পারিব।

গৃহিণী তাকে একেবারে আপন করিয়া লইয়াছেন। "বাবা, আমাদের ঘর তোমার আপন ঘর ভেবো। কল্‌কাতায় থাক্‌লেই যেন আমাদের ওখানে এসো। আস্‌ছ ত' ?"

"যাব বৈকি, মা। তবে দিনকতক দেশে যেতে হবে এখন। মা যেতে লিখেছেন। কি দরকার টরকার আছে বুঝি।"

সুচরিতাই বুঝি সেদিন অনেকটা আড়ালে আড়ালে রহিল। সন্ধ্যার সময় মুখে যে গানটান করে নি—এস্‌রাজটায় একবার দু'চার পোঁচ বাজিয়েছিল। কি সুর—তা সেই জানে, আর তার অন্তর জানে!

রাত্রি নয়টায় যখন সে সব্বাইকার কাছে বিদায় লইয়া ষ্টেশন অভিমুখে চলিল, তখন সুচরিতা কোথায়—তাকে ত' সে কৈ দেখিতে পাইল না!

সুপ্রিয় সঙ্গে যাইতেছিল গাড়ীতে তুলিয়া দিতে। ফটকের সেই বাউল ঝাউগাছটা আজও বুঝি ছাড়পত্র দেখিতে চাহিতেছিল। বিনা সর্ত্তে সে আজ কাকেও একেবারে ছাড়িবে না—যেই আজ তার সে পুরীটার বাইরে যাবে, তাকেই একটা কিছু "জামিন" রেখে যেতে হবে। শুধু "অন্‌ প্যারোল", সে কারুক্‌খে আজ বাইরে যেতে দেবে।

সেই ফটকের গায়ের পুষ্পিতা প্রগল্‌ভা মধুমালতীটে হাত দিয়ে এবারও পাশে সরিয়ে আনত-দৃষ্টি নীরবে দাঁড়িয়েছিল সে।

"চল্লুম তবে"।

সে কিছু বলে নি—কেবল মাথাটি ঈষৎ নেড়েছিল, আর—আর নিমেষের তরে চোখদুটি তার তুলেছিল সুব্রতর চোখদুটোর পানে! চোখদুটি তার ছলছল হ'য়েছিল কিনা, অন্ধকারে দেখা যায়নি।

সপ্তম

"মা, সকালে আহ্নিকের পর তুমি কোথা গেছ্‌লে? একটা কথার জন্যে তোমার খোজ ক'রেছিলুম।"

সুব্রত তাদের কল্যাণপুরের বাড়ীতে দুপুরে খাইতে বসিয়া মাকে বলিল। মা কাছে বসিয়া পাখার বাতাস না করিলে ছেলের খাওয়া হইত না। কল্যাণপুর বাংলার কোন জেলায় মফঃস্বলে একখানা গ্রাম। সুব্রতদের পৈতৃক ভদ্রাসন এই গ্রামে। তারা বনিয়াদী জমিদারের ঘর। মাহাল টাহাল যা আছে, তাতে প্রচুর মুনাফা হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট আফিসের মতন বেশ ধরাবাঁধা নিয়মে জমিদারি সেরেস্তার কাজকর্ম্ম সব চলে। নায়েব গোমস্তা প্রভৃতি অন্যায় আদায়ের জন্য জোর জবরদস্তি করার তেমন সুযোগ পান না। আর, কর্ত্তাদের সেদিকে দৃষ্টি বরাবরই এত প্রখর ছিল, আর অন্যায়ের গন্ধটুকু পাইলে তাঁদের এতখানি কঠোর সচেতন হইতে দেখা যাইত যে, কর্ম্মচারীরা বেচালে চলিতে সাহসও করিত না। প্রজারা কেবল অনুগত ছিল, এমন নয়; অনুরক্তও ছিল।

কল্যাণপুরের বাড়ীখানা বড়। তার ওপর, সুব্রতর বাবা হালফ্যাসানে নূতন একটা অংশও সংযোগ করিয়াছিলেন। দেবালয়, অতিথিশালা, চতুষ্পাঠী—এগুলো আগে হইতেই ছিল। একটা দাতব্য চিকিৎসালয়, একটা সাধারণের কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক, আর একটা পাঠাগার—এগুলো জমিদার বাড়ীর সুপ্রশস্ত কম্পাউণ্ডের ভেতরেই, জলাশয়ের অপর দিকে, পরে স্থাপিত হইয়াছিল। সুব্রত একটা পল্লীমঙ্গলসমিতি—শিশুমঙ্গল আর মাতৃ-মঙ্গল যেটার মুখ্য উদ্দেশ্যের অন্যতম ছিল—প্রতিষ্ঠিত করি-

য়াছে। সে নিজেই সে সমিতির প্রাণ বলিলেই হয়। গ্রামের ছেলেদের আর যুবকদের অনেককেই, সে তার জমিদারী গৌরবের প্রবলপ্রতাপে নয়, তার উদার ও স্নেহশীল চরিত্রের মধুর প্রভাবে, সমিতির কাজে টানিয়া লইতে পারিয়াছে। ছেলেরা যে তাকে বড়মানুষের প্রাপ্য মর্য্যাদা আর আজ্ঞাবহতাটুকু দিত, এমন নয়। আপনাদের বড় ভাই, গুরু ও নেতার প্রাপ্য যে সম্মান, শ্রদ্ধা, সেবা ও আনুগত্য—তাই তাকে দিত। সেও তাদের সঙ্গে ভূস্বামীর গদিতে বসিয়া মিশিত না। গ্রামের দৈনন্দিন সুখদুঃখ, হাসিকান্নার জীবনের যে সরু সরু অলি গলি পথগুলি চারিধারে চলিয়াছে—পল্লীর দেহে রস-রক্ত-বহা নাড়ীগুলোর মতন—সে সেই পথে দাঁড়াইয়া, সকলের আনন্দ ও ব্যথার সঙ্গী, উদ্যোগ ও কর্ম্মের সাথী হইয়াই, মিশিত। গ্রামের জনসাধারণ, বিশেষ ছেলেরা, তাকে সত্য সত্যই ভালবাসিত। তার সদাচার, পরোপচিকীর্ষা ও চরিত্র-মাধুর্য্য, বিলেত থেকে ফেরার পরও, তাকে "একঘ'রে" হইয়া থাকিতে দেয় নাই। এ হতভাগ্য দেশেও এমন সমাজ কদাচিৎ দেখা যাবে, যেটা তার দুর্গদ্বার অবারিত করিয়া দেয় না, যখন সত্যকার ত্যাগের, মৈত্রী ও সেবার যেটা মহত্ত্ব, সেটা আসিয়া তার পুণ্যকেতন তুলিয়া পরিখাপারে উপনীত হয়। উদারতা এ দেশের ধাতে, এ দেশের যেগুলো প্রাচীন অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, সেগুলোর ভেতরে, নেই বলিলে অযথাভাবে নিজেদেরই "কুলায়"টিকে ময়লা করিয়া ফেলা হইবে।

"কৈবর্ত্তপাড়ার হরিচরণদের বাড়ী একবার গিয়েছিলাম, বাবা। তার দুই ছেলেরই টাইফয়েড্। ভারি বিপদে প'ড়েছে তারা স্ত্রী পুরুষে দুজনে। তা' ছাড়া আরও দু'একবাড়ী যাওয়ার দরকার ছিল।"—মা ছেলের প্রশ্নোত্তরে জানাইলেন।

"কেন, মা, তুমি তোমার ঐ শরীর নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে

বেড়াও? কা'ল আবার তার ওপর একাদশী গেছে। তোমার ও শরীর ভেঙ্গে পড়্তে কতক্ষণ? কেন, আমাদের সমিতিতে কৈবর্ত্তরা কোন খবর দেয় নি? আমরাইত যা যা দরকার সব ব্যবস্থাই ক'রে দিতে পার্তুম।"—সতু কল্কাতাতেই বেশীর ভাগ কাটাইয়াছে, কাজেই তার কথাবার্ত্তায় ক্রিয়ার ওপর প্রত্যয়গুলো একটুখানি অন্য ধাঁজেই হ'ত।

"তোমার সমিতির ছেলেরাইত' দেখ্লাম বাবা, সেবাশুশ্রূষা যা' করার তা' সবই কর্ছে। কোথাই বা তারা না করে? কিন্তু তবু, বাবা, আমার কাণে কারুর বিপদ্ আপদের কথা এসে পড়্লে, আমি না গিয়ে পারিনে ত'।"

"বিপদ্ আপদের কথা কখন দৈবাৎ তোমার কাণে এসে পড়্বে, তার জন্যে তুমি বুঝি চুপ্টি ক'রে ব'সে থাক? আমাদের সমিতির বিশ পঞ্চাশটা কাণে কোন কিছু পৌঁছবার আগেই দেখি, তোমার দুটি কাণে সেটা এসে পৌঁছিয়েছে! মনে হয়, মা, তুমি তোমার মাতৃত্বের কাণটি সর্ব্বদাই খাড়া ক'রে রেখেছে—গ্রামে, শুধু গ্রামেই বা কেন, এ অঞ্চলে, কোথায় কোন্ অসহায় শিশুটি তোমার বেঘোরে প'ড়ে কাঁদ্ছে তাই শুনতে।"

"নারে, না। আমি খবর পেলে যাই ব'লে, তারা আমাকে খবর দেয়।" একটুখানি হাসিয়া আবার বলিলেন—

"কি বলে জানিস্ তারা? বলে—রাণীমা এসে বাড়ীতে একটিবার পায়ের ধূলো দিলে রোগ বালাই, অলক্ষ্মী আর কিছু থাক্বে না! যত সব পাগল!"

"পাগল নয়, মা। তোমার পায়ের ধূলো যেখানে পড়ে, সেখানে সত্যইত' অলক্ষ্মী থাক্তে পারে না, মা। সারা জীবনটা তুমি যে দীন-

দুঃখীর ভেতরেই তোমার নারায়ণকে চিনে এসেছ, সেবা ক'রে এসেছ! তুমি তোমার দরদ নিয়ে, সেবা নিয়ে যেখানে যাবে, সেখানে যত দুঃখ কষ্ট আর্ত্তির ভেতরে তোমার সেই চিরদরদের নারায়ণকে প্রকট হ'তেই যে হবে, মা। আর, লক্ষ্মীনারায়ণ জোড়েই এসে থাকেন যে। নারায়ণ যেখানে প্রকট হবেন, লক্ষ্মীও সেখানে হবেন নিশ্চয়। অলক্ষ্মী আর থাকৃবে কি ক'রে?"

"অত তলিয়ে কোন দিন ভেবে দেখিনি। তবে, কেউ ডাকৃলে না গিয়ে পারিনে।"

"অহেতুক দরদ ত' ওকেই বলে মা। তুমি কি আর দীনদুঃখীর দুয়োরে যেতে নায়েব গোমস্তার সেরেস্তা সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে? গেলে কি লাভ, না গেলে কি ক্ষেতি,—এই সব হিসেব ক'রে দেখ্‌বে? তোমার দাসদাসীদের পাঠিয়ে দিয়েও ত তুমি তাদের দুঃখ কষ্টের প্রতীকার করতে পার। আমাদের সমিতিও অনেক কিছু করে। কিন্তু সে সবই কতকটা হিসেবনিকেশের সেরেস্তায় প'ড়ে গেল। কাছারির সেরেস্তার, সমিতি টমিতির বাইরে, সে সব থেকে স্বতন্ত্র, মানুষের ভেতরে এমন একটা কিছু জিনিষ আছে, যেটা মাঝখানে কোনরকম ব্যবধান না রেখেই, কোন অনুচর-টনুচর সঙ্গে না নিয়েই, সরাসরি গিয়ে মানুষের দুঃখদরদের কাছে দাঁড়ায়—দাঁড়াতে চায়। ভেতরকার সেই বস্তুটাকে সেরেস্তার দড়ি দিয়ে বাঁধতে গেলে, অথবা সেটাকে অনুচর কিঙ্কর দিয়ে ঘিরে রাখ্‌তে গেলে, সেটা আর স্বাধীন থাকে না, আপন স্বরূপে, মহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকে না। আর, তা না থাকৃলে, যে দুঃখদরদের কাছে সেটা হয়ত' এগিয়ে যাচ্ছে, যে দুঃখ দরদও সত্যি সত্যি তার কাছে ঘেঁষ্‌তে চায় না; একটা পরদা আড়াল রেখে, বেনামিতে বকলমে, তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়, তার সঙ্গে দেনাপাওনা মিটিয়ে নেয়। তুমি হরি-

চরণদের বাড়ী নিজে না গিয়ে একজন সরকারকে কিছু দিয়ে পাঠিয়ে দাও, দেখ যে, হরিচরণ সে দান হাত পেতে নেবে। দানটা কুলুঙ্গিতে তুলে রেখে এসে হাত যোড় ক'রে প্রণামও জানাবে। কিন্তু ওটা যেন অনেকটা দেনাপাওনার ব্যাপার। দানটা পেয়ে তার উপকার হ'লো। কিন্তু দানটা তার প্রাণের একেবারে অন্দরপর্য্যন্ত গিয়ে পৌঁছুবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না দানের পেছনে পেছনে দরদী দাতাটিও সরাসরি হাজির না হচ্ছেন। সরকারমশায়ের মারফৎ সে তার কৃতজ্ঞতার প্রণামটা পাঠিয়ে দিতে পারে, কিন্তু তার ভাষাহীন অন্তর আবেগের কোন চিহ্ন—দু'ফোঁটা চোখের জলত' কৈ পাঠিয়ে দিতে পারে না! এই জন্যে মনে হয় মা—ডেপুটি দিয়ে, প্রতিনিধি দিয়ে, সমিতি দিয়ে কাজ করার যে সুবিধেটে হয়, সেটাকে সেরেস্তার খাতায় উঠিয়ে রাখা যায়; কিন্তু নিজের দরদ নিয়ে নিজেই গিয়ে যা করা যায় বা না যায়, সেটার কোনই হিসেব নেয়া যায় না। অথচ সেইটেই খাঁটি, আসোল। দরদ রিক্ত হস্তে গেলেও আসোল কাজটা ক'রে সে আসে।

"আরও একটা কথা। রাণীমার পায়ের ধূলোয় যদি তাদের বিশ্বেস থাকেত' সেটাও—তাদের সে বিশ্বেসটাও—উড়িয়ে দেবার জিনিষ নয় মা। বিশ্বাসে অনেক কিছুই হয়। সরকার মশায়রা গিয়ে, আমাদের সমিতির ছোকরারা গিয়ে, যা করবে, তার চাইতে ঐ বিশ্বাসটা তাদের কিছু কম করে না, মা।"

সতুর এই লেকচারটুকু মা পরিতোষের সঙ্গেই শুনিলেন। তিনি বুদ্ধিমতীত' ছিলেনই, লেখাপড়াও মন্দ জানিতেন না। সতুর এই সেবা-ধর্ম্মের ব্যাখ্যানটুকুতে ঢুকিতে যাইয়া তিনি গোলকধাঁধায় পড়েন নাই।

সুব্রত নিজেই মার শরীরের দিকে তাকাইয়া, তাঁর একাদশীর কথা তুলিয়া,তাঁর পাড়ার পাড়ায় ঘুরিয়া বেড়ানয় একটুখানি অনুযোগ করিয়াছিল—তাঁর ঘোরার কাজটা সমিতিদ্বারাও নির্ব্বাহ হইতে পারে, বলিয়াছিল। কিন্তু, তার দুশ্চিন্তা, তার অনুযোগ কতক্ষণ সে খাড়া করিয়া রাখিবে মার তার অহেতুক অকৃপণ করুণাবন্যার মুখে? মার তার দুয়ারে দুয়ারে দরদ বিলাইয়া বেড়ানর যেটা নিগূঢ় কৈফিয়ৎ, সেটা সে নিজেই ব্যক্ত করিয়া শুনাইল মাকে—আর, বোধ হয়, নিজেকেও। তাতে, তার নিজের অনুভূতির তলে তলে একটা গৌরব, কৃতার্থম্মন্যতা-বোধ ছিল বৈকি! সব্বাইকার রাণীমা যে তারি আপন মা!

কিন্তু সে অনুভূতিটার তলে তলে কেবল গৌরবের বোধটাই ছিল কি? একটা আশঙ্কা, একটা বেদনাও ভেতরে ভেতরে গুমরিয়া উঠিতেছিল না কি? মায়ের বয়স হইয়াছে, তার পর, শরীরটা মোটেইত' ভাল নয়। অল্পদিন আগে বাবা তার চলিয়া গেছেন। তখন যে শোকটা মা যদি তার মাথাটা আপন বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বহিতে পারিতেন, তবে সে বোঝাটা হয়ত' অত নিষ্ঠুরভাবে তাঁর বুকের সব ক'খানা পাঁজর ভাঙ্গিয়া রাখিয়া যাইত না! কিন্তু সে ছিল তখন বিদেশে—সিন্ধুপারে। এই সিন্ধুপারের ব্যবধান মাতা ও পুত্র দু'জনারই শোকের বোঝাটাকে প্রায় অসহনীয়রূপে গুরু করিয়া দিয়াছিল। তার তাজা রক্তের ঘা শুকাইয়া আসিতেছে। কিন্তু ঐ বর্ষীয়সী নারীর বুকের ক্ষতটা বাইরে শুকাইলেও, অথবা শুকাইবার মতন হইলেও, ভিতরে নালী ঘা হইয়া রহিয়া যায় নাই কি? তিনি স্বামী বর্ত্তমানেও দীন দুঃখীদের দুঃখ মোচনে অগ্রসর হইতেন। কিন্তু আজ যে তিনি আর্ত্তের ডাকে যেখানে সেখানে ছুটিয়া না যাইয়া পারেন না, সেটার মূলে স্বাভাবিক করুণা বা দরদ আছে, খুবই আছে সন্দেহ নেই; কিন্তু ঐ

আপন বুকের গভীর দরদটা পরের দরদে দরদী হইয়া ভোলার একটা আশাও কি তার মূলে তলে তলে নেই ?

মার সম্বন্ধে যে কথা, তার নিজের সম্বন্ধেও আজ সেই কথা নয় কি ? সেও আজ তার বুকের একটা নতুন দরদ কাজের নেশায় ভুলিয়া থাকিতে চায় না কি ? সেই মাণিকপুর হইতে একটা নতুন দরদ সে বুকে করিয়া অনিয়াছে। বড়ই গোপন সেটা। এমন কি সুষমা বৌদিকেও সে সেটা জানায় নি। দিন দিন সেই গোপন দরদটায় তার বুক যে ভরিয়া উঠিতেছিল ! সত্যই, যখন তখন ভেতরে একটা আন্‌চানানি সে অনুভব করিত। শুধু সুচরিতাকে ভালবাসার জন্য আন্‌চানানিটা নয়। শুধু ভালবেসে যে আনচানানি, সেটাকে বুকে ধ'রে, এমন কি, বুকের ভেতর পুষে রেখেও, একটা জানি কেমন ধারা সুখ আছে ! জীবন নিজেকে সুকুমার মনে করে, প্রিয়তর ও পূর্ণতর মনে করে, ঐ রকম একটা ব্যথা সে বুকে ধরিতে পায় যখন, তখন। এটা প্রিয়জনকে অন্তরের নিবিড় অনুভূতির ভেতর পাবার যে সুখ, শুধু তাই নয়। এটা তাকে অন্তরে বাহিরে—সর্ব্বত্র, সর্ব্বতোভাবে, একান্তভাবে আপনার করিয়া পাবার যে আশা, সেই আশার সুখ। যেখান সে আশাটি নেই, স্পষ্টভাবে নেই,—সেখানে ভালবাসিয়া সুখের চাইতে দরদই বুঝি বেশী।

সুচরিতাকে বিরূপ সে অবশ্য দেখে নহে। বরং এক আধ্‌বার মনে হইয়াছে, বোধ হয় সেও—। কিন্তু সেটা মনে করিতে তত সাহস সে পায় নি। অন্ততঃপক্ষে, ক্ষেত্রটা সন্দিগ্ধ। কৃতজ্ঞতা, বন্ধুত্বের ওপর আর কিছু কি ? "হাঁ—তাই" বলিতে সে ভরসা পাইয়াছে কৈ ? তারপর, আসল কথা—সুচরিতা ও সমরেন্দ্র কি আগে থেকেই পরস্পরকে বাছিয়া রাখে নাই ? তার অন্তরে যে নৃতন ঝড়টা উঠিয়াছিল, তার

ভেতরে কোন একটা স্থিরকেন্দ্র সে কোন মতেই খুঁজিয়া পাইতেছিল না।

তার পাড়াগাঁয়ের মাঠ ঘাট, খাল নালা, বাঁশের ঝাড়, বেতের বন, আম কাঁঠাল সুপুরি নারকেলের বাগান, সরু সরু ছায়ায় ঢাকা পল্লীপথ, নানান্ রঙের কত কি পাখীর গান—এসব তার কৈশোরের প্রথম ভালবাসা। কল্‌কাতায় বাবার কাছে থাক্‌তে সে তার জীবনের এই প্রথম প্রণয় বহ্নিটিকে তার ছোট্ট বুকখানার সমস্ত দীর্ঘশ্বাস দিয়ে বাঁচিয়ে রাখ্‌ত। পূজো পরব উপলক্ষ্যে বাড়ী এলে তার আনন্দের সীমা থাক্‌ত না। যেন সোণার খাঁচার দুয়োরটা আল্‌গা পেয়ে বেতবনের ছোট্ট পাখীটা আবার ফুরুৎ করে পালিয়ে এসেছে তার স্নিগ্ধরৌদ্রোজ্জ্বল হাওয়ায় দোলানো সেই সবুজ স্বপন দোদুল দোলাটিতে! কখন দোয়েলের সঙ্গে, কখনও বুলবুলের সঙ্গে, কখনও বৌ-কথাকওর সঙ্গে, বাগানে বাগানে সে সুরের লুকোচুরি খেলা ক'রে বেড়াতো। দাস দাসীরা খুঁজ্‌তে বেরিয়ে তাকে হয়ত দেখ্‌তে পেত—বাগানের সা'র যেখানটায় শেষ হ'য়ে ঢেউ খেলানো ধানের ক্ষেতের নতুন সবুজ সাড়ীটায় ছাওয়ার পা'ড়টি বুনে দিয়েছে, সেইখাসে একটা নালার ধারে কাশবনের ঝোঁপের মাঝে চুপ্‌চাপ ব'সে থাক্‌তে। গাছ থেকে কাঠ বিড়ালী নেবে এসে সেখননে সাম্‌নের দুটি পায়ে ক'রে শ্যামা ঘাসের শস্যটি খুঁটে খাচ্ছে চারিভিতে চকিত চাহনিটি তার মেলে। জলের বুকের দিকে নুয়ে পড়া একটা নলখাগ্‌ড়ার শীষে ব'সে মাছরাঙ্গা যেখানে দোল খাচ্ছে মাছের দিকে নজর রেখে। ঐ দূর বনের মসী রেখার খাঁচা থেকে কি এক ঝাঁক পাখী আকাশের নীল বুকে এক ছড়া চলন্ত হার গেঁথে যেখানে মাথার ওপর দিয়ে শাঁ ক'রে চ'লে যাচ্ছে কোন দিক্ না তাকিয়ে। সুব্রত তার ভেতরে আপন ভোলা হ'য়ে ডুবে থাক্‌ত।

তার কৈশোরের সেই প্রথম ভালবাসা আজও সে ভুলিতে পারেনি। কত দেশ বিদেশ ঘুরিয়া আসিয়াও তাকে স্বীকার করিতে হইয়াছে, তার বাংলার পল্লীরাণীর স্নিগ্ধশ্যাম আঁচলটি ভরিয়া কুড়ানো তাজা ফোটা শিশিরে ভেজা শিউলি ফুলগুলো, অন্য দেশের গোলাপ চন্দ্রমল্লিকা, অথবা আর আর যত বিদেশী ফুলের, বাহার আর চটক দেখে নিশ্চয়ই হার মান্‌বে না। তার পল্লীর সেই খাল বিল, মাঠ বন এখনও তার সব চাইতে ভাল লাগে। কিন্তু আজ—আজ তার সেই চির আদরের পল্লী-রাণীর নিভৃত আঁচলটিতে শুয়ে প'ড়ে, তার তৃপ্তির তলে তলে একটা নতুন ব্যথা গুম্‌রে উঠ্‌ছে কেন? সাঁঝের বেলা ফাগ গুলে দেয় যখন অলস হাওয়ায় কাঁপানো বিলের জলে, তখন—তখন ঝাঁ ক'রে স্বপ্নটা তার ছুটে যায় কোন্ এক পাহাড়-ঘেরা তেপান্তরের মাঠের দেশে রক্তদুকূল-পরণা এক রাজকন্যের অলক্তকচরণ-রাগ-রেখাটুকুর তল্লাস কর্‌তে! ঝোপে ঝোপে রঙবেরঙের পাখীগুলো যখন ভারি মিষ্টি সুরে ডেকে যায়, তখন —তখন কোন্ দূর পান্থশালায় কোন্ দিনেকের প্রিয় অতিথির বীণের ঝঙ্কারের শেষের রেশটি তার মনে প'ড়ে যায়, আর বুকের ভেতরটা তার কেমন ক'রে ওঠে! যখন তখন চোখ দুটো তার ঝাপ্‌সা হ'য়ে আসে! ভারি মুস্কিল ত!

তাদের বাড়ীতে বেশ সাজানো গোছানো বড় বাগান ছিল। মার্ব্বেল দিয়ে বাঁধানো পুকুরের ধারে এসে নিরিবিলি দাঁড়ালে, ভারি তাজ্জব এক কাণ্ড ঘট্‌ত—কোন্ কুহকিনী বেমালুম পুকোরটা চুরি কর্‌ত, আর তার যায়গায় বসিয়ে দিত, হনুমানধারার মাথায় আকাশ-ময়দানে সেই অচ্ছোদ সরোবর—হরিণ হরিণী যার পাড়ে দাঁড়িয়ে আয়নায় নিজেদের সেই কবিকুলকুহরিত লোলমঞ্জুল চাহনির ছবি দেখ্‌ত—আর—আর কে যেন এসে চোখ দুটি তার নত ক'রে সলাজ মৃদুগুঞ্জরণে বল্‌ত—

"এখানে একটা কুটীর বেঁধে থেকে গেলে বেশ হয়—না ?"

তাদের বাগানের বড় ফটকটার গায়েও একটা মধুমালতী দিন দিন বড্ড বিদগ্ধা, প্রগল্‌ভা হ'য়ে উঠ্‌ছে; তার পাশ কাটিয়ে আনাগোনা করার সময় আবার কি প্রাণ-মনোমদ একটা ভেল্কির মধ্যে সে প'ড়ে যেত—সে ভেল্কিটে কেউ তাকে তুলিতে রং ফলিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌তে বল্লে, তার হাতখানা যে বড্ডই কেঁপে যাবে, তার চোখ দুটো যে বেজায় ঝাপ্‌সা হ'য়ে আস্‌বে! কাজেই—থাক্।

তার ভেতরে এই নতুন ফ্যাসাদটা তাকে অস্থির করিতেছিল। কাজের নেশা—দিনরাত মেতে থাকা যায় এমন নেশা—তাই সেও খুঁজছিল। মার তার যখন তখন তাঁর ভাঙ্গা শরীর নিয়ে না বেরুলে চল্‌বে না। তার নিজেরও অস্থির মনটা নিয়ে কাজের ভেতরে ঝাঁপিয়ে না পড়্‌লে চল্‌বে না। মায়ের নিগূঢ় কৈফিয়ৎটা সে ত' বাহির করিয়াছে। তার নিজের যেটা নিগূঢ় কৈফিয়ৎ, সেটা মায়ের কাছে গোপন। মা তাই বুঝি পাল্টা জেরা তুলিলেন।

"আমার ভাঙ্গা শরীর দেখে তুমি আমাকে যখন তখন ঘুরে বেড়াতে মানা কর্‌ছিলে। কিন্তু, তোমাকেও ত' সাবধান হ'তে হয়, সতু। বরাবর সহরে কাটিয়েছ তুমি। কদ্দিনই বা পাড়াগাঁয়ে থেকেছ? আজ হঠাৎ এসে জল ভেঙ্গে, কাদা ভেঙ্গে, মশা জোঁকের ভেতরে, সময়মত না নেয়ে, না খেয়ে, দিন নেই রাত নেই, পল্লীসেবা ক'রে বেড়ানো—এতটা কি সহ্য হবে, বাবা? আমার ভয় হয়—এই বুঝি অসুখে পড়্‌লে। শরীরটের দিকে একটু তাকিও।"

"রাণীমা একটিবার যেয়ে পায়ের ধূলো দিলে রোগবালাই অলক্ষ্মী দূর হ'য়ে যায়—আর আমার রাণীমা যেখানে সদাক্ষণ র'য়েছেন, সেখানে

অসুখবিসুখ হবে, একথা আমাকে বিশ্বেস করতে বলো মা ?"

—কথা ক'টা বলিবার সময় তার স্নেহপ্রতিমা রাণীমার পায়ের ধূলোর কাছে তার দৃষ্টি গিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। চোখ দুটো তুলিয়া মার মুখের পানে চাহিল। সমস্ত অন্তরের আশীষ পুঞ্জীভূত হইয়া আষাঢ়ের বর্ষণোন্মুখ একখানা নব মেঘের মতন সেখানে লাগিয়াছিল বুঝি। নবমেঘ ? আশীষের সেই পুণ্য ভারের ওপর কোন একটা প্রচ্ছন্ন ব্যথার ছায়াটুকুও পড়িয়াছিল বুঝি !

"রাণীমা তোদের আর কদ্দিন পায়ের ধূলো দিয়ে বেড়াবেন, বাবা ? লক্ষ্মী নারায়ণের মন্দির দুয়োরে আঁচল পেতে শুলেইত' হয় !"—বুকের সেই গভীর দরদটার সাড়া ছিল বুঝি ?—"আমাকে ত' দু'দিন বাদে চ'লে যেতে হবে"—দৃষ্টি উপরের ঐ আকাশের দিকে একবার পলক তুলিল—"কিন্তু আমার ঐ সব কাঙাল ছেলেদের নতুন রাণীমাটি হাত ধ'রে এনে এ মন্দিরে প্রতিষ্ঠা ক'রে যেতে পারলে সুখী হওয়া যেত' !"

সতুর তখন খাওয়া শেষ হইয়াছে। তবে আসন ছাড়িয়া ওঠেনি। মার কথা ক'টা শুনিয়া তার চোখ দুটো ছলছল করিয়াছিল ; আবার, ওকি ?—মুখখানাও তার রাঙা হইয়াছিল বুঝি ! বিরুদ্ধ রসের সমাবেশ বলিয়া রসশাস্ত্র দুষ্‌বেন না ত' ? তা দুষুন গে। মানব মনের যেটা চিরন্তন জটিল রহস্য, সেটা কোন শাস্তরেরই ভ্রূকুটির ভয় রাখে না। মায়ের কথা ক'টায় যে দুটো রস তার ভেতরে সৃষ্টি হইস, সে দুটোকে একসঙ্গে সে ভাষা দেবে কেমন করিয়া ?

"আমার রাণীমা এখন নিশ্চয়ই চ'লে যাবেন না। বাবা চ'লে গেলেন—তখন আমি বিদেশে। আজ আমি ঘরে ফিরে এসে পেয়েছি শুধু তোমাকে। এখন তুমি যদি চ'লে যাও, তবে—তবে তোমার এই

এত বড় পল্লীসংসারে, আমার চাইতে বেশী নিঃসঙ্গ, কাঙাল ত' কারুকৃথেই ক'রে রেখে যাবে না মা।"—সতুর কথাগুলো অবশ্য সহজ গলায় বেরোয়নি। মা আঁচল দিয়ে চোখটা মুছ্লেন। কিছুক্ষণ কিছু বল্লেন না। বল্বেনই বা কি?

গাঁয়ের যত কাঙাল ছেলেদের নতুন রাণীমার কথা চাপা পড়িয়া গেল। সুব্রতর কথাগুলোর পর, এমন কি মায়ের ঘটকালীটাকেও, তখনকার মতন নিবৃত্ত হইতে হইল। মা উপযুক্ত কৃতবিদ্য ছেলের একটি মনের মতন বৌ আনিতে ভেতরে ভেতরে কিছু কম আগ্রহযুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাই নিয়ে বার বার ছেলের কাছে ঘটকালী করায় তাঁর প্রবৃত্তি ছিল না। আত্মীয়স্বজন অনেকে অনেক ভালমন্দ সম্বন্ধ নিয়া আসিত। তিনি সব শুন্তেন। কিন্তু সব কথা সুব্রতর কাণ পর্য্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়া তিনি অনাবশ্যক মনে করিতেন। দারপরিগ্রহ করিতে সুব্রতর কোন মারাত্মক অরুচি বা আপত্তি নেই—এইটুকু জানিয়া রাখিয়া তিনি যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ—যেদিন হবে সেদিন হবে—এই রকম ধারা একটা দৈবনির্ভর এক্ষেত্রে তাঁর ঘটকালী করার প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং, দেশের নতুন রাণীমার শুভাগমন সম্বন্ধে প্রশ্নটার তড়িঘড়ি জবাব পাবার জেদ তাঁর ছিল না।

"ভাল কথা। যা বল্তে তোমায় সকাল বেলায় খোঁজ ক'রেছিলুম। আমাদের বড় বাঁধ আর ঐ অঞ্চলের মহালগুলোয় বানে ধান পাট সব ফসল নষ্ট হ'য়ে গেছে। প্রজাদের ভারি কষ্ট হ'য়েছে। সেখানকার কাছারি থেকে খবর এসেছে—সে সব মহাল থেকে এ কিস্তিতে কিছু আদায় পত্তর হবে না। কা'লকের খবরের কাগজেও দেখ্ছিলুম—কে ও অঞ্চলের শোচনীয় অবস্থার কথা জানিয়ে একখানা চিঠি ছেপেছে।

আমি মনে কর্‌ছি মা—খাজনা আদায়ের পেড়াপিড়ি বন্ধ ত' রাখ্‌তেই হবে, তা ছাড়া, আমরা সমিতি নিয়ে গিয়ে ওখানে একটা সেবাশ্রম, সেবাকেন্দ্র খুল্‌ব। সমিতির জন কয়েক বাছা বাছা ছেলে নিয়ে কা'ল সকালেই আমি বেরিয়ে পড়ি ভাব্‌ছি।—কি বল মা ?"

"ও সব মহালে আদায় পত্তরের চেষ্টা অবশ্যই ছেড়ে দিতে হয়! শুধু তাই কেন ?—প্রজাদের এ অসময়ে তাদের দুঃখমোচনের চেষ্টাও দেখ্‌তে হয় বৈকি! আর, প্রজারা আমাদের লক্ষ্মী প্রজা। কখনও মালিকের পাওনা ফেলে রাখে না তারা। কিন্তু—এই দু'দিন বাড়ী এসেছ ;—বাড়ীতে পা দিয়েই অম্‌নি সমিতি নিয়ে তুমি ওখানে সেবাশ্রম কর্‌তে যাবে ;—সেই বন্যে, অসুখ বিসুখের মধ্যে বে-পরওয়া হয়ে তুমি প'ড়ে থাক্‌বে ;—যদি স্বাস্থ্যটা একবারে ভেঙ্গে নিয়ে এস! তাই বল্‌ছি—নিজে না গিয়ে, কাজের সব বন্দোবস্ত ক'রে দিলে হ'ত না, বাবা ?"

"সে কেমন হয় জান মা ? হরিচরণ কৈবত্তর ছেলের টাইফয়েডে তত্ত্বতল্লাস কর্‌তে তুমি নিজে না গিয়ে সরকার মহাশয়কে কিছু দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া।" দুজনেই একটু হাসিলেন।

"কৈবত্তপাড়ায় গিয়ে একটিবার তত্ত্বতল্লাস নিয়ে আসা ত' বেশী কথা নয়, সতু। তুই যে একেবারে সেই বন্যের ভেতরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে চাচ্ছিস্।"

সত্যিই—একেবারে বন্যের ভেতরে ঝাঁপিয়ে পড়্‌তে না পেলে আজ সতুর চল্‌ছে না! কাজের ছিটে ফোঁটায় তার ভেতরটাকে শান্ত করা আজ তার পক্ষে অসম্ভব।

"একাদশীর পরদিন জলটুকু না খেয়ে, ঐ বয়েসে, ঐ ভাঙ্গা শরীরে, শুধু হরি কৈবত্ত কেন, গাঁয়ের যত দুঃখী আর্ত্তর বাড়ী বাড়ী ঘুরে বেড়ানোও চাট্টিখানি কথা নয়, মা। আমরা দল বেঁধে কাজ কর্‌তে

যাবো—কাজের আমোদটা যতটা উপভোগ কর্‌তে পাবো, কাজের যেটা ক্লান্তি, গ্লানি, কষ্ট, সেটা ততটা টের পাবো না। ও রকমের কাজ দলবেঁধে করার একটা উন্মাদনা উদ্দীপনা আছে মা। কষ্টকে কষ্ট ব'লে মনে হয় না। ভয়ানক অসুবিধেয় প'ড়েও ফূর্ত্তি। পেটে হয়ত' দানা পানি নেই, মাথার ওপর রোদ্দুর বাদলের আচ্ছাদন নেই, চোখে ঘুম নেই, শরীর আলস্ত—তবু প্রাণের হাসির ভাঁড়ারটা কিছুতেই ফুরোয়না মা, সে সব যায়গায়। সে হাসিতে সব ভুলিয়ে দেয়—দুঃখ কষ্ট অসুবিধে যত বড় হ'য়েই সাম্‌নে হাজির হক্‌না কেন, সেটাকে তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দেবার বল সব সময়ই বুকের কলিজেয় যুগিয়ে দেয়। প্রাণ ঢেলে যারা ও কাজ কর্‌তে যায়, তাদের অসুখ' বিসুখ হ'তে শুনেছ? তোমার দরিদ্রনারায়ণ যে সেখানে বহুরূপে বিশ্বরূপে প্রকট! সে দরিদ্রনারায়ণকে বিশ্বরূপে যারা সেবা কর্‌ছে, লক্ষ্মী তাদের তরে আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, গাছপালা, সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি সবই যে মধুসিক্ত, মধুস্রাবী ক'রে রাখেন! সমুদ্রমন্থনে যে বিষকুম্ভটি উঠেছিল, সেটার প্রায় সবটাই মহাদেব খেয়ে ফেলে নীলকণ্ঠ হ'য়েছিলেন। বাকিটুকু জগতে সব্বাই তিল তিল ক'রে বাঁটোয়ারা ক'রে নিয়েছিল। তাই সব কিছুর ভেতরেই দুঃখতাপের একটা মাত্রা আছেই। কিন্তু যারা দরিদ্রনারায়ণের সেবা কর্‌তে চ'লেছে, তারা যা কিছুর সংস্পর্শে আসে, তার ভেতরে বিষের মাত্রা আর ফুটে বেরুতে পারে না—তাদের প্রাণ-ঢালা সেবার ব্যপদেশেই যেন লক্ষ্মী তাঁর অমৃত কুম্ভটি ঢেলে দেন সবতার ভেতরে। সবই মধুময় হ'য়ে ওঠে, আন্তরিক দরদ আর সেবার স্পর্শে তাদের!"

লেক্‌চারটুকু দিতে মাঝে একবার সতুর গলার স্বরটা যেন গাঢ় হ'য়ে এসেছিল। মার চোখেও জল এসেছিল। সতুর এ লেক্‌চারটাও

যায় বেশ লাগিল। তাঁর স্নেহ-সজাগ অন্তরও আর তাঁকে উৎসাহিত করিল না—সুব্রতর সংকল্পের পথে পুনশ্চ কোন রকম একটা বাধা তুলিতে। সতু মাকে না শুধাইয়া কোন কাজ করিত না; কিন্তু সে তার রাণীমাকে চিনিত।

সুব্রত আজ দিন দুই হইল বাড়ী হইতে বড় বাঁধ মহালের কাছারিতে গিয়াছে। সঙ্গে তার জন দশেক সমিতির ছেলে ছিল। কাছারিটা একটা বাঁধের ওপর। ততদূর বন্যা আসিয়া পৌছায় নেই। কিন্তু সেখানে দাঁড়াইয়া চার ধারের দৃশ্য দেখিয়া সে হতভম্ব হইয়া গিয়াছিল। কেবল জল আর জল! বড় বাঁধটার ওপর অনেক প্রাণী আশ্রয় নিয়েছে। • কি শোচনীয় অবস্থা তাদের! হাঁ—ঝাঁপিয়ে পড়ার মতন একটা স্রোত বটে! স্রোত নয় সে, প্লাবন! কতকগুলো নৌকা ঠিক করিয়া দিনরাত খাটিয়া সুব্রত আর তার সঙ্গের লোকজন ক্ষুধার্ত্তদের মুখে আহার যোগাইল, নিরাশ্রয়দেয় মাথার ওপর আচ্ছাদন তুলিয়া দিল, পীড়িতদের আর্ত্তদের চিকিৎসা ও সেবার ব্যবস্থা করিয়া দিল। নিজেদের আহার নিদ্রা, আরাম বিরাম—কোন দিকেই নজর দেবার মতন অবস্থা ছিল না তাদের। সত্যই, সেই বহুরূপী আর্ত্ত-নারায়ণকে অন্তরের সেবা ঢালিয়া দিয়া তারা লক্ষীর হাতের সেই অমৃত-কুম্ভের বিচিত্র পরিবেশনে বসিতে পাইয়াছিল। এত আনন্দ, এতখানি তৃপ্তি, এতটা গৌরব তারা জীবনে কোনদিন আস্বাদ করেনি। ক'দিন নিরন্তর পরিচর্য্যার ফলে সে অঞ্চলের মাথার ওপর বিপদের মেঘ তার করাল ছায়াটা আস্তে আস্তে সরাইয়া লইয়া গেল দেখা গেল। হাঁ, মাতিয়ে রাখ্‌বার মতন একটা কাজের নেশা সুব্রত খুঁজেছিল,—একটা সর্ব্বগ্রাসী বন্যার মুখে সেই রকম ধারা কাজের আহ্বান তার ভেসে এসেছিল বটে!

শুধু সেই এক জায়গাতে ত' নয়, অনেকগুলো "সেণ্টর" খুলিয়া

তাদের কাজ চালাইতে হইয়াছিল। নৌকার ওপরই প্রায় তাদের থাক্‌তে হ'ত। জলে তলিয়ে যাওয়া গ্রাম, মাঠ, বিলের মধ্য দিয়ে তাদের নৌকো সকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি সব সময়ই পা'ল তুলে কল্‌কলিয়ে, ঝপ্‌ঝপ্‌ ক'রে দাঁড় বৈঠা ফেলে, আনাগোনা করত। এমন ভীষণ অথচ সুন্দর সে দৃশ্য, কত দরদভরা অথচ উদ্দীপনাপূর্ণ, তাদের সেই সব নৌকাপথে অফুরন্ত চলা ফেরা!

একএকটা বিলের ওপর দিয়ে ভরা পা'ল তুলে যেতে নৌকো বেচারীর মনে হ'ত—সে বুঝি এক দিগ্‌বিদিগ্‌হারা অকূলে পাগল হ'য়ে সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে! ঝড় তুফোনও সময় সময় উঠ্‌ত বৈকি! সুব্রতর নৌকো তখন, ঐ দূর ডাঙ্গা আশ্রয়টুকুর ওপর যে ক'টা প্রাণী তাদের করুণ ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টি বিলের অথৈ জলের উন্মাদ বিস্তারের পানে পেতে র'য়েছে, তাদেরি ক'টি মুখের গ্রাস ব'য়ে নিয়ে চ'লেছে! বিল যদি আজ সন্ধ্যায় তাকে আপন মত্ততরঙ্গের বাহু দিয়ে বেঁধে তার অতলে নিয়ে যেতে চায়, যাক্‌ সে! ওদের মুখের গ্রাস ক'টি সে সাঁঝের ক্ষেপা জলরাশি ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ঐ ডাঙ্গাটার ধারে পৌছে দেবে না কি? শুধু সুব্রত কেন, তার সহকর্ম্মীদের মনে এই চিন্তাই খেলিত। এ চিন্তা যেখানে খেলে, সেখানে শিলা ভাসে জলে, নৌকোত' নৌকো!

দিন দুচ্চারের মধ্যেই বন্যে কমে গেল। গ্রামের ঘর দুয়োরগুলো—যেগুলো তখনও প্রাণগতিকে দাঁড়িয়ে ছিল—জেগে উঠ্‌ল। সে দৃশ্য আরও করুণ, আরও হৃদয়-বিদারক!

তখন সে শ্মশানগুলোকে নূতন করিয়া গ্রাম তৈয়ারি করিতে তাদের বিস্তর মেহন্নৎ করিতে হইল। টাকা জলের মতন খরচ হইতে লাগিল। প্রজারা অনেকেই সম্বলহীন; কাজেই সুব্রতকে নিজেই সেই খরচের প্রায় সবটাই বহন করিতে হইল। গ্রামগুলোকে নূতন করিয়া

পত্তন করার কালে সুব্রত একটা সৌষ্ঠব, শৃঙ্খলা ও স্বাস্থ্যের আদর্শের পরিকল্পনা করিয়া, সেইটার অনুসরণ করিতে চেষ্টা করিল। প্রাচীন কোন পুঁথিতে সে পড়িয়াছিল—কি ভাবে গ্রাম, পুর, নগর পত্তন করিতে হয়। সে সব পুরাণো "ভিলেজ প্ল্যানিং" এর নক্সা তার খুব ভাল লাগিয়াছিল। জনসাধারণ অবশ্য প্রায়ই অন্ধ গতানুগতিকতায়ই গ'ড়ে গ'ড় দিয়া চলিয়াছে। সেই পুরাতন পল্লীচিত্র আবার নূতন করিয়া ফোটাইয়া তোলার ব্যাপারটা শুধু ব্যয়সাপেক্ষ নয়, অনেক আদেশ-উপদেশ, অনেক সাধ্য-সাধনা-সাপেক্ষ হইয়াছিল। তবে, প্রজারা তার ভারি অনুরক্ত ছিল। বিশেষ, তাদের এই বিপত্তিতে সে যে "পারের কাণ্ডারী মধুসূদন" হইয়াই তাদের মাঝে দেখা দিয়াছিল। ভবিষ্যেতে যাতে বন্যা অমনধারা সর্ব্বনাশী রূপে দেখা দিতে না পারে, বাঁধ, খাল, নালা, প্রভৃতির সংস্কার করিয়া, তার ব্যবস্থা যথাসম্ভব করা হইল। ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ড প্রভৃতির দ্বারস্থ হবার সময় বা ধৈর্য্য তাদের তখন ছিল না।

যাক্—কাজের উপসংহারের দিক্‌টায় দেখা গেল বাইরের দু'একটা মিশন, কমিটি ইত্যাদিও সে অঞ্চলে কাজ করিতে আসিলেন। কাজের অবশ্য শেষ নেই। সুব্রত অতি সমাদরে তাঁদের অভ্যর্থনা করিয়া লইল। নূতন সেবকের দলও অনেক সাহায্য করিলেন। অবশ্য আর্থক সাহায্য করাটা সুব্রতর তহবিলেরই একরকম একচেটিয়া রহিয়া গেল। নূতন সেবক-দলের "সেবা"তেও সুব্রত পারত-পক্ষে কোনও সেবাপরাধ হইতে দিল না।

শেষের দিকে আসিলেন—কয়েকটি মহিলা। সঙ্গে অবশ্য কতিপয় পুরুষ অনুচরও আছেন। জনসাধারণ বা "ম্যাসের" রাজনৈতিক চৈতন্য সম্পাদনই হইল এ পার্টির প্রখ্যাত উদ্দেশ্য। রাজনীতির রক্তচক্ষু অথবা

কম্যুনিজমের রক্তপতাকা দেখিয়া সুব্রত আঁৎকাইয়া ওঠেনি কোন দিন। তবে তার সকল নীতির মূল নীতিটা ছিল আন্তরিকতা, সহৃদয়তা—Earnestness, Sincerity. সে নিজে বড় ভূস্বামী ব'লে কখনও এটা ভোলেনি—প্রকৃত সত্যকার স্বামিত্ব যেটা, সেটা তার নয়, প্রজাদেরই, যারা খেটে খাচ্ছে বা না খেতে পেয়ে মরছে, তাদেরই। সে নিজেকে তাদের প্রতিভূ, পরিচারকভাবে দেখার জন্যই প্রস্তুত হ'য়ে আসছিল। কিন্তু মস্কোবাদের আদর্শটা যাই হোক্, তার ধারাটা, প্রণালীটা তাকে আকর্ষণ করতে পারে নি। বরং এই প্রাচীন দেশের যেটা সত্য ও কল্যাণ সাধনা, তার মাঝখানেই পশ্চিম থেকে প্রত্যাবৃত্ত ক্লান্ত দৃষ্টিটা তার ক্রমেই যেন সুস্থির হ'য়ে বসতে চাইছিল! আর, রাজনীতিক্ষেত্রে হিংসা আর বিদ্বেষের যে রাজপথ যুগ যুগ ধ'রে সকল দেশের, সকল জাতির ইতিহাসের বুক চিরে রক্তারক্তি ক'রে নিজেকে চালিয়ে যাচ্ছে, সে পথটা তার নিজের কেমন যেন ভাল লাগ্‌ত না। তাতে মানুষ সত্যিকার স্বাধীনতা, স্বচ্ছন্দতা, স্বস্তিতে এসে পৌঁছুবে না ব'লেই তার ধারণা হচ্ছিল। যাক্—এ রাস্তাটা ভাল কি ও রাস্তাটা ভাল—এ নিয়ে গায়ে প'ড়ে ঝগড়া করায় তার তেমন উৎসাহ ছিল না। তার একখানা কাগজ বের করার ইচ্ছে হচ্ছিল কিছু দিন থেকে—তাতেই, সে আশা করছিল—তার পক্ষের কথা ক'টি বেশ গুছিয়ে, আর কাকেও ঘা না দিয়ে, সে শুনিয়ে যেতে পারবে।

দলের দু'একজন মহিলা ও পুরুষ যেন "ম্যাস্" মানে দেশের "ইতর" লোকগুলো বুঝে থাকেন—এমন আশঙ্কা করার হেতু সুব্রত এক আঁচড়েই টের পাইয়াছিল। এঁরা এসেছেন তাঁদের সহুরে ড্রয়িং রুম-গুলো থেকে বেরিয়ে, তাঁদের মোটর কুশন থেকে নেবে, অশেষ কষ্ট স্বীকার ক'রে, টুর্ প্রোগ্রামের মেমোরাণ্ডাম্ মিলিয়ে, রিষ্ট ওয়াচের

কাঁটা ধ'রে, ম্যাস্‌কে তাঁদের মহামূল্য করুণা মেপে দিতে—তাঁদের শক্তিময়ী সিম্প্যাথি আর ব্যাকিং দিয়ে, পতিতদের "আপ্‌লিফ্‌টের" একটা উপায় কর্‌তে !

সুব্রত কিন্তু বিরক্ত হইল না, বিদ্রূপ করিল না। একটা তিতিক্ষা ও ন্যায়নিষ্ঠার মহত্ত্ব—charity—তার ভেতর ছিল। আজ যারা ড্রয়িংরুম থেকে বেরিয়েছে, কা'ল কৈ ত' তারা বেরুত না ; আজ মোটর থেকে যারা নেমেছে, কৈ কা'ল ত' তারা নামৃত না। আজ এতটা এগিয়ে এসেছে যারা, কা'ল আবার কতটা এগিয়ে যাবে তারা ! তারাও যে চলার পথে ! নটরাজ নেচেছেন যে তাদেরও অন্তরে ! আগে থাক,' পাছে থাক,' মাঝে থাক'—হে চলার পথের শাশ্বত পান্থ—নর নারী—নমস্কার। সুব্রত সেই শ্মশানের মাঝেও রিষ্টওয়াচ, চায়ের ফ্লাস্ক, আইস্‌ক্রিম—এ সবকে তাই একান্ত অসহনীয় ভাবে আশোভন করিয়া দেখে নাই। চলার পথে সকল সহযাত্রীকেই সে আত্মীয় করিয়া দেখিতে প্রস্তত ছিল। এ দলের মেয়েরাও সুব্রতবাবু লোকটিকে অপছন্দ করে নাই।

একদিন একটা মিটিং হইল—সুব্রতর কাছারির সাম্‌নে প্রশস্ত উঁচু যায়গাটায়। তার পাশের গ্রামগুলো থেকে অনেকে দেখিতে আসিল। চাষীবাসীই বেশী। মেয়েরা সুব্রতকে ধরিয়া বসিল—তাঁকে প্রেসিডেন্ট হইতে হইবে। অগত্যা তাই। মিটিংএর গোড়াতেই দুটি মেয়ে গান করিল। কল্‌কাতার পার্টিরই তারা। বড় মেয়েটি সতের আঠার বছরের হবে। অপরটি এক আধ বছরের কম। গান ভারি সুন্দর লাগিল সকলের—সুব্রতরও। গান যখন হচ্ছিল, তখন তার অন্তরাত্মা দূরের—বহুদূরের—আর একটা গানের "রেডিও" ধরার জন্যে তার "রিসিভার"টা পেতে রেখেছিল না কি ? সেই জানে ! বড় মেয়েটির—

মহিলা বল্‌ব না কি?—চেহারা গড়ন দেখে তার "চলন্তিকা রূপবহ্নিশিখা" মনে হয় নি; কিন্তু ভারি শান্ত, ধীর, মিষ্টি সে মুখখানা। চোখ দুটোর ভেতর দিয়ে ভেতরে তার তরল, টল্‌টলে, হাল্‌কা একটা কিছু আছে মনে হচ্ছিল না। গভীর, স্বচ্ছ, বিশাল একটা কিছুরই ছবি চোখের ক্যামেরা দুটোতে তার প'ড়েছে। সুব্রতর বেশ ভালই লাগিল।

সুব্রতকেও প্রথামত সভাপতির বক্তৃতা শেষকালে করিতে হইল। বক্তৃতা সে করিতে পারিত। তবে, আজ্‌কে কলিকাতার দল যে সব বক্তৃতা করিলেন, তাতে পাড়াগেঁয়ে সেই সব চাষীবাসীদের কৌতূহলোদ্রেক ও বিস্ময় যে পরিমাণে হইয়াছিল, রাজনীতিক অথবা অন্য কোনও "নীতিক" চৈতন্য-সম্পাদন সে পরিমাণে হইল না। সে সব বক্তৃতার ভাষা (বাংলা হইলেও), ধাঁজ, ধরণ সবই আলাদা—সহুরে। বড় বাঁধের কাছারিতে না হইয়া এলবার্টহলে হইলেই সাজন্ত হইত। আর, সে সব বক্তৃতার ভেতরকার ভাব ও চিন্তার চেহারাগুলো ইংরেজী খবরের কাগজের পোষাক পরিয়া আসিয়া সেই সব পাড়াগেঁয়ে মুখ্যু স্থখ্যু চাষীবাসীদের সঙ্গে কুটুম্বিতা পাতাইতে পারে নাই। সুব্রত তার "চেয়ারের" অভিভাষণে বিশেষ করিয়া এই "ইতর" ও "ভদ্রের" আধ্যাত্মিক ব্যবধানটার কথাই বলিল। আমরা "ম্যাস্‌" "ম্যাস্‌" করিয়া চীৎকারে যতই গলা ফাটাইতেছি, সাধারণের সঙ্গে আমাদের এই ফাটটা ততই বড় হইয়া চলিয়াছে! আমাদের সহরে অবস্থিতি, বিলাতী ভাবের শিক্ষা দীক্ষা, ভাবনা চিন্তা, কথাবার্ত্তা, চা'ল চলন—এ সমস্তই আমাদের কাছে ঐ "ইতর"দের "অস্পৃশ্য" করিয়া তুলিতেছে। আমরা নতুন যুগের নতুন অভিজাত—আমাদের "সেট্" আলাদা। চাষীবাসীদের সঙ্গে আমাদের মিলের "পয়েণ্ট" কোথায়, কয়টা? সেই "শোষণ" বা Exploitationএর সম্পর্কটা বাহালই আছে; অধিকন্তু,

একটা মোড়লি, মাতব্বরির সম্পর্ক জোর করিয়া চাপাইয়া দিবার জন্য "আহার নিদ্রা ত্যাগ" করিয়াছি! ছোঁয়াছুঁয়ির অস্পৃশ্যতাটা চাইতে এই ভাবের, চিন্তার, রুচির, অভ্যাসের, ভাষার, চা'ল চলনের অস্পৃশ্যতাটাই মারাত্মক। সিম্প্যাথি বা দরদ ব'লে জিনিষটে এতে একেবারে মারাই পড়ে। এই মারাত্মক আধ্যাত্মিক অস্পৃশ্যতাটা—বাইরের বাছবিচার সত্ত্বেও—বাংলার পল্লীতে ছিল না, অথবা কমই ছিল। এমন, বাইয়ের বাছবিচার, "ছুঁৎমার্গ" চলিয়া যাইতেছে, কিন্তু ভেতরকার সেই মারাত্মক পার্থক্যটা যে বাড়িয়াই চলিয়াছে! ঐ ভেতর পানেই বেশী ক'রে লক্ষ্য রাখ্‌তে হবে আমাদের। এক আধ দিন মিটিং ক'রে "জগন্নাথক্ষেত্র" করলেই ত' হবে না। আমাদের সব্বাইকার অন্তরে অন্তরে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে। তখন, ঐ চাষী, ঐ মজুর সত্যি সত্যি আমার "ভাই" হবে; আমি তার "দাদাঠাকুর" হব। আমার সহুরে ব্যায়রামের আগে তাই ত' ছিলাম আমি!

নারীদেরও সম্বোধন ক'রে দু'চার কথা সে বল্‌ল। হাঁ—তাঁদের জাগতে হবে, কাজে নাব্‌তে হবে বৈকি! তাঁরা কাজে না এলে, কাজে যে সুষমা সৌষ্ঠব আস্‌বে না, শক্তি ও আনন্দ আস্‌বে না, সিদ্ধিও তৃপ্তিও আস্‌বে না! তাঁদের আস্‌তে হবে বৈকি! কিন্তু এও মনে রাখ্‌তে হবে—কাজের হাতে পায়ে রক্ত এসে থাকে, বল এসে থাকে বুক থেকেই; আর সে বুকটা সভাসমিতি নয়, গড়ের মাঠও নয়, রাজপথের প্রোসেশনও নয়। সেটা হ'ল—সেই চিরদিনকার ঘর গৃহস্থালী—যেখানে জননী হ'য়ে, ভার্য্যা হ'য়ে, দুহিতা হ'য়ে, নারী বিশ্বমানবের যেটা বুকের রক্ত, সেইটে তৈরী করছে, সঞ্চয় করছে, শোধন করছে, ব্যয় করছে, পূরণ করছে। নারীত্বের এই সৌম্য, পূত চিরন্তন কল্যাণপ্রতিমা যাতে ক'রে ক্ষুণ্ণ হয়, মলিন হয়, অশোভন হয়, প্রাণহীন হয়, এমন কিছু

নারীর কম্‌লে চলবে না। মিটিং ক'রে ভাইফোঁটা দেবার দরকার হয়েছে, কিন্তু ঘরের ভাইটির পীড়ার মুখে জলটুকু দিতে ভুলে গিয়ে নয়!

তার বক্তৃতাটা সবারই ভাল লাগিয়াছিল—মেয়েদেরও। মিটিং ভাঙিতে সন্ধ্যা হইল। সুব্রত চাষীবাসীদের কিছু না খাওয়াইয়া ছাড়িল না। বাঁধের নীচে মস্ত বড় একটা নামু যায়গা। তখনও জলে ভরিয়াছিল। দেখিলে মনে হয় বিল। দু'একখানা ছোট ডিঙ্গিও তাতে ছিল। তখন আর সব্বাই চলিয়া গেছে। সেই মেয়ে দুটি—গান গেয়েছিল যারা—তখনও বাঁধের ওপর দাঁড়িয়েছিল। সন্ধ্যের পর সেই নিস্তব্ধ বিলের জলরাশির মোহ বুঝি তাদের আটুকে রেখেছিল! সুব্রত তাদের দেখিয়া কাছে আসিল।

"আপনারা এখানে র'য়েছেন! এই দৃশ্যটা বেশ, না?"—সে বলিল।

"ভারি চমৎকার। বালীগঞ্জ লেকে ত' কত রোয়িং ক'রেছি সন্ধ্যের পর, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে এই জলাটার আকর্ষণ তার চাইতে ঢের বেশী, নয় নমিতা?" বড় মেয়েটি অপরটিকে প্রশ্ন করিল।

"এখানেও একটুখানি রোয়িং করবেন না কি?"—সুব্রত বলিল।

"বাঃ, তা হ'লে কি মজাই না হয়!" নমিতা বলিল। নমিতার চোখে সোণার প্যাশনে চশমা ছিল, সে সেটাকে খুলে তার সেণ্টেড সিল্কের রুমালে একবার মুছে নিল।

একখানা ছোট ডিঙ্গি খুলিয়া সুব্রত তাদের নিয়া বিলের ওপর খানিক ঘুরিয়া আসিল। হালটি ধরিয়া রাখিল সে নিজে। তরুণীদের হাতে তরণীর বৈঠা ঝপ ঝপ্ করিয়া জলে পড়িতে লাগিল। অনেক দূর চলিয়া গেছে তারা। জলের কিনারায় ঝিঁঝিঁর আওয়াজ আর শোনা যাচ্ছে না। তবে, কি একটা জলচর পাখী বুঝি করুণ তীক্ষ্ণ

স্বরে ডাক্‌ছিল এক একবার ওপারের তার ঘরে-না-ফিরে-আসা সঙ্গীটিকে। আকাশে চাঁদ নেই। তারা ফুটেছে। দূরে বাঁধের ওপর কাছারি ঘরের বাতি মিট্‌মিট্‌ কর্‌ছিল।

কোথায় তারা তখন? বিলের মধ্যিখানে? আলস্ত হাত দাঁড় আর টান্‌ছে না। সুব্রতর হাতেও হা'ল আর "পানি পাচ্ছে না।" নৌকোর গায় ছোট ছোট ঢেউগুলো অলসভাবে ভেঙ্গে ভেঙ্গে পড় ছিল।

সূচনা নেই, ভূমিকা নেই—হঠাৎ একখান গান গাইল সে—সেই বড় মেয়েটি—নমিতা নয়। কে জানে নামটি তার কি? রবিবাবুরই গান—পুরোণো—

"অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরী ভাসাইয়া * * * সম্মুখে অনন্তরাত্রি, আমরা দুজনে যাত্রী।..."

সুব্রতর বুকের তাজা ক্ষতটার ওপর একটা ব্যাণ্ডেজ সে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল—রাতদিন কাজের ব্যাণ্ডেজ বুঝি সেটা? সেই নিঝুম, নিরালা বিলের অলস হাওয়া একটা গানের ঢেউএর পর ঢেউ এনে ফেলে সে ব্যাণ্ডেজটা একটুখানি সরিয়ে দেয় নি কি? তরুণীরা বুকের সে গোপন ব্যাণ্ডেজ্‌টা দেখ্‌তে পায় নি।

অষ্টম

"মা—আমি এ কোথা র'য়েছি!"

সুব্রত চোখ মেলিয়া চাহিল। সন্ধ্যা হইয়া গেছে। একটা হ্যারিকেন টেবিলের ওপর জ্বলিতেছে। চেনাশুনো জায়গাত' নয়! একখানা লোহার খাটের ওপর সে শুইয়া আছে। কাছে একটা ছোট টেবিলে অষুধ-পত্তর, ব্যাণ্ডেজ বাঁধার সরঞ্জাম। একটা টুলও টেবিলের কাছে র'য়েছে বুঝি।

একটি মেয়ে কাপে ক'রে কি নিয়ে তখুনি ঘরে এল। খদ্দরের সাড়ী পরণে তার। তার বাঁ হাতখানায় দেখ্‌ছি একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সুব্রত চোখ দুটি তুলে তার মুখের পানে চাইল। সেই না?—সেই বন্যের পর বড় বাঁধের কাছারিতে যার সঙ্গে দেখা হ'য়েছিল? সেই বড় মেয়েটি—যে বিলের ওপর সেই সন্ধ্যায় রবিবাবুর সেই গানখানা গেয়েছিল?

"আপনি এখানে? আমি এ কোথা র'য়েছি?"—সুব্রত বিস্ময়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিল।

"নারী-সেবাশ্রম। আপনি এ গরম দুধটুকু খেয়ে ফেলুন দিকি!" ভারি দরদী স্বরটি তার।

সুব্রত তখন অবস্থাটা বুঝিতে পারিল। কা'লকের বৈকালের হাঙ্গামায় আহত হইয়া সে সেবাশ্রমে আসিয়াছে। তার মাথায় এক ঘা লাঠি পড়িয়াছিল। পেছন থেকে কে একটা মেয়ে সে বাড়ি ঠেকাইতে তার হাতখানা তুলিয়াছিল, কিন্তু ঠেকাইতে পারেনি। আঘাতে সে সংজ্ঞাহারা হইয়া পড়ে। তাকে এই সেবাশ্রমে এনেছে। সে পুরোণো

হাঁসপাতালটা ত' নয়। এটা নতুন একটা বুঝি। আর যে মেয়েটা হাত তুলেছিল তার মাথা বাঁচাতে, সেই-ই বা কোত্থেকে তার পেছনে তখন এসে প'ড়েছিল? মেয়েদের ত' দূরে তফাৎ ক'রে রাখা হয়েছিল! আর, হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা তার পূর্ব্বপরিচিতা এই শুশ্রূষাকারিণীই কি তখন, সেই হাঙ্গামার সময়, তার মাথায় বাড়ি ঠেকাতে এগিয়ে গিয়েছিল? তখন সে ত' কৈ লক্ষ্য করতে পারেনি।

তখন দেশে জাতীয় আন্দোলন চলিতেছিল। বিকেলে এক প্রোসেশন্ বাহির হইয়াছিল। মহিলারা মধ্যস্থলে ছিলেন। কি করিয়া হইল জানা যায় নাই, সে মিছিলটা একটা "কম্যুনাল রায়েটে" পরিণত হইয়া যায়। ও অঞ্চলটায় কতকগুলো বদ্‌মাইস, গুণ্ডা ছিল, সকলে জানিত। কিছুদিন হইতে ভেতরে ভেতরে প্ররোচনা, উত্তেজনাও বোধ হয় চলিতেছিল। স্থানীয় নেতারা সকলকে সতর্ক করিয়াও দিয়াছিলেন। মদের দোকানের সাম্‌নে ক'জন গুণ্ডার সঙ্গে জনকতক ভলেন্‌টিয়ারের বচসাই, বোধ হয়, সেই শুক্‌নো বারুদের গাদায় আগুনের প্রথম ফিন্‌কির মতন পড়িয়াছিল। সে অঞ্চলের অধিবাসী পোদ নমঃশূদ্রদের সঙ্গেও মুসলমানদের তেমন গলাগলি সদ্‌ভাব ছিল না। কারণকূট যাই থাকুক না কেন, হাঙ্গামাটা পাকিয়া উঠিল বেশ সেদিন বিকেলে। ভলেন্‌টিয়াররা "করডন" করিয়া মেদেদের তফাতে নিরাপদ্ করিতে চেষ্টা করিল।

সুব্রত আজ মাস কতক কল্যাণপুরের বাড়ী ছেড়ে এসে তাদের সদরে র'য়েছে। সকলে তাকে জেলার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্ট হইতে বলিয়াছিল, সে হয় নাই। তবে, পল্লীসঙ্গঠনের কাজটা সে বিশেষভাবে আপন ঘাড়ে নিয়েছে। তাতেই বুঝি তার কাজের মৌতাতটা জম্‌বে ভাল! কর্ম্মীদের সঙ্গে ক্যাম্পেই সে থাকত।

সব্বাইকার সঙ্গে তুবেলা ডাল আর ভাত খেত, আর শোবার সময় চাটাই পেতে শুতো।

সে একখানা কাগজও বের ক'রেছিল। বর্ত্তমান যুগের যেটা আকাঙ্ক্ষা, যেটা প্রচেষ্টা, সেটাকে নতুন ক'রে অমৃতের অনুপ্রেরণা, অভয়ের দীক্ষা দিতে হবে তারও বুঝি ?—যে অমৃতকে এ দেশের ঋষিরা আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন; যে অভয়কে এ দেশের যেটা ঋতের পন্থা, সেটা অন্বেষণ করিয়াছিল। মানুষকে তার স্বাধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতেই হইবে। ধর্ম্মের নামে, সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার নামে কোন কিছুকেই সে শুভ প্রতিষ্ঠার বাধক হইতে দেওয়া অবশ্য চলে না। বিশ্বমানবের নবযুগ ভগীরথ যে প্রাণের উন্মাদ-ধারা আজ পৃথিবীতে নাবাইয়া আনিতেছেন, সকল জীর্ণ ব্যবস্থার স্পর্দ্ধাই তার মুখে সেই—ঐরাবতের মতনই গড়াইয়া যাইবে! কিন্তু সে উন্মাদ ধারাটাকে কোন্ শঙ্খনিনাদে কল্যাণ বর্ত্ম দেখাইয়া লইতে হইবে আজ? ভগীরথের তপস্যার অভয় হস্ত তাকে পথ দেখাইবে, না পদ্মাসুরের দম্ভের মত্ত আস্ফালন ?

ভারতের তপস্যার মুখে সুব্রত তুলিয়া দিয়াছিল—তার উদ্‌বোধন আবাহন শঙ্খটি। ভারতের সাধনাকে সে বরণ করিয়াছিল—তাদের এই নব যুগের পথ চলার পুরোভাগে পথ দেখাইয়া চলার জন্য। পশ্চিম হইতে অনেক কিছুই লইতে সে প্রস্তুত—এ পথে সকলের সাথী হইয়া চলিতে সে উৎসুক। কিন্তু সে সঙ্কল্প করিয়াছিল—শঙ্খটির মঙ্গলগম্ভীর ধ্বনিটি শুনিয়া, পুরোভাগে ব্রতচারিণীর পুণ্য পদাঙ্কটি অনুসরণ করিয়া, সে এ পথসঙ্কটের দিনে পথটি তার বাছিয়া লইবে!

এইজন্য তার লেখায় বিদ্বেষ ততটা ফুটিত না, যতটা ফুটিত সখ্য ও সৌহার্দ্দ্য; অনাবশ্যক ভাঙ্গনের দিকটায় ততটা জোর পড়িত না, যতটা

পড়িত অত্যাবশ্যক গড়নের দিকে। সে বিশ্বাস করিত—এ দেশের, এ জাতের মজ্জায় এখনও বিপুল একটা প্রাণ আছে; শুধু প্রাণ কেন, শক্তি আছে। শুধু শক্তি কেন, ঋদ্ধি আছে। শুধু ঋদ্ধি কেন, সিদ্ধি আছে, শান্তি আছে। সেই কাটাই আশ্রমের বেদীতলে দেশের বুকের পাঁজরের তলে ঝর্ ঝর্ ঝর্ প্রাণের সাড়া! উৎসের মুখ পাথর চাপা আছে, খুল্‌তে হবে। খুল্‌লে, এ জাতের পরাক্রম অমিত, অভিজান অজেয়। বিদ্বেষ আর প্রতিহিংসার আগুন জ্বেলে আলাদিনের আশ্চর্য্য প্রদীপের সুড়ঙ্গের পাথরটা ফাটাতে হবে, বোধ হয় না। উপনিষদের মন্ত্র, গীতার মন্ত্র—সেই মন্ত্রেই পাথর খুলে যাবে। কিন্তু সে মন্ত্র আজ, "শরীর পতন" ক'রেও, নতুন ক'রে সাধ্‌তে হবে আমাদের। চালাকিতে কাজ হবে না। গোঁয়ারতুমিতেও না।

আপন মতে গোঁড়ামি তার ছিল না, কিন্তু নিষ্ঠা ছিল। সকল মতকে শ্রদ্ধা দিয়া, কাকেও ঘা না দিয়া, স্পষ্ট নির্ভীকভাবে সে আপনার কথা কাগজে বলিয়া যাইত। ঠাট্টা বিদ্রূপ করার লোকের অভাব ছিল না, কোনদিন হয়ও নেই। কেউ বল্‌ত—হিমালয়ের মহাত্মারা সুব্রত বাবুর কাগজে স্পেশাল্ মেসেজ পাঠাতে সুরু ক'রেছেন। কেউ বল্‌ত—নালন্দা তক্ষশীলার বৌদ্ধ বিহারগুলো থেকে সেই ত্রিপিটকের শীলব্রত-গুলো আবার সুব্রতবাবুর হাতে নতুন সংস্করণে বেরুতে আরম্ভ ক'রেছে। কেউ বল্‌ত—"সনাতনিষ্ঠ।" কেউ বল্‌ত—"আর্য্যমির" পাণ্ডা। কেউ ব' বল্‌ত—হিন্দু স্বরাজের নতুন "অহিংস" ভেতো শিবাজী! এসব অপভাষণ এবং অযথাভাষণে সে বড় একটা কাণ দিত না।

তবে, আপন গাত্রত্বক্-রক্ষণপন্থী, নিত্য-বেড়ার-ওপর-বিরাজ-পন্থী, মেষপন্থী, বকপন্থী, বৈড়ালব্রতিক,—এ সব আখ্যা, অতি বড় বিরুদ্ধ

সমালোচকেরাও, তাকে দিত না। তার ত্যাগ, তার নিষ্ঠা, তার কৃচ্ছ্র-পালন, তার উদারতা, তার সাহস, তার অকুতোভয়তা সর্ব্ববাদিস্বীকৃত ছিল। এইজন্য অন্তরে সম্মান করিত সকলেই তাকে—নিজেদের পার্টি বা পলিসির গরজে মুখে যে যাই বলুক্ না কেন।

তার নির্ভীক, তেজের লেখায়, বক্তৃতায়, রাজপুরুষেরা কেহ কেহ হয়ত' ভ্রূকুঞ্চিত করিতেন। কিন্তু কোন দুষ্ট বিষবাষ্প সে সব লেখা, বক্তৃতা হইতে উদ্‌গীরিত হইত না বলিয়া, কারুর, কোন পক্ষেরই, তেমন আক্রোশ বা অন্তর্দ্দাহ ছিল না তার কাগজটা সম্বন্ধে।

সুব্রত দুধটুকু খাইলে পর সেই শুশ্রূষাকারিণী কি একটা অষুধও খেতে দিল। টুলটায় বসিয়া কিছু ফলটলও ছাড়াইতে লাগিল।

"বড্ড দুর্ব্বল বোধ করছেন, নিশ্চয়ই"—সে বলিল।

"সম্ভবতঃ দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছি—শুয়ে প'ড়ে থেকে ঠিক টের পাচ্ছিনে।"

"ডাক্তার ব'লে গেছেন, শুয়েই থাক্‌তে হবে। নড়াচড়া বিশেষ করবেন না। ফলের রসটুকু খান।"

খাওয়া হইলে টেম্‌পারেচারটা সে একবার লইল। নর্‌মাল্। কিন্তু সেদিন সকাল বেলাতেও ভারি গুমোট। সতুর কপাল ঘামিতেছিল। সে আস্তে আস্তে টুলটা কাছে টানিয়া আনিয়া শিয়রের কাছে বসিয়া পাখার বাতাস করিতে লাগিল।

সতুর মনে হচ্ছিল—মাণিকপুরে সেই রাত্রি। আর একজন আহত অবস্থায় সংজ্ঞাহারা পড়িয়াছিলেন। আর এক তরুণী তাঁর শুশ্রূষায় বিনিদ্র রজনী যাপন করিয়াছিল। আজ সে নিজেই সেই অবস্থায় পড়িয়াছে! আজকের এই শুশ্রূষাকারিণীটি কে? বন্যার কাজের সূত্রে হঠাৎ একদিন সে এসে প'ড়েছিল তার চলার পথে!

কা'ল সেই হাঙ্গামার সময় যেন ভুঁই ফুঁড়ে বেরিয়ে এসে তার মাথাটা বাঁচাবার জন্যে নিজের বুক পেতে দিয়েছিল! আজ—এই সেবাশ্রমে, সেই তার একমাত্র সঙ্গিনী—দরদী শুশ্রূষাকারিণী!

কল্‌কাতার কোন সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মহিলা যে, তাতে সন্দেহ নেই। সেই পার্টির সঙ্গে কাজ কর্‌তে না হয় এসেছিল—আজকা'ল মেয়েরাত' ওরকম ধারা কাজে বেরুচ্ছেনই। কিন্তু পার্টির সঙ্গে—সেই চশমা চোখে মেয়েটির সঙ্গে—ওত' কল্‌কাতা ফিরে যায় নি, দেখ্‌ছি। এখানেই র'য়ে গেছে। কোথা? কোন আত্মীয় টাত্মীয় আছেন বোধ হয়। কিন্তু এতদিনত' দেশের কাজে টাউনে বেরুতে তাকে দেখিনি! চেনা মুখ—বেরুলে নিশ্চয়ই জান্‌তে পারতুম। কা'লকেও ত' কৈ লক্ষ্য করিনি!

"আপনার হাতেও একটা ব্যাণ্ডেজ দেখ্‌ছি। বেশী লেগেছে নাকি? গুরুতর একটা কিছু হয়নিত'? আপনি নিজে জখম হ'য়ে এসে আমার শুশ্রূষা কর্‌ছেন! ছেলেরা কেউ আমার কাছে থাক্‌লেও হ'ত ত'!"

সে একটু হাসিয়া বলিল—"না জখম টখম কিছু হয়নি। হাড়ে লাগেনি। চাম্‌ড়া খানিক্‌টে কেটে গেছে, কালসিটে প'ড়েছে বৈ, আর কিছু নয়। এই নতুন সেবাশ্রমটার দেখা শোনা মেয়েটারই নিজেরা কর্‌বেন ঠিক ক'রেছেন। আমি আমাদের প্রেসিডেণ্টকে ব'লে কা'ল থেকে ডিউটিতে লেগে গেছি।"

"এদ্দিন এ টাউনের কোন কাজে আপনাকে আমি দেখেছি ব'লেত' মনে হচ্ছে না! সেই—সেখান থেকে আসার পর বরাবর এখেনেই ছিলেন কি?"

"না, কলকাতাতেই ছিলুম। দিন দুত্তিন হ'ল এখানে এসেছি।"

সতু চুপ করিল। পাখার বাতাস চলিতে লাগিল। ঘরটায় সেই একখানা বেড্। দোতলার ঘর। জান্‌লাগুলো খোলাই ছিল। দেওয়ালে একদিকে মহাত্মাজীর একখানা ফটো। আর একদিকে ঠাকুর পরমহংসের একখানা ছবি। বস্—আর কিছু সাজসরঞ্জাম নেই। ঘরের হাওয়ায় তখনও একটুখানি ধূনো গুগ্‌গুলের গন্ধ লেগে ছিল।

সিঁড়িতে কার যেন ধীরপদক্ষেপ শোনা গেল। সে উঠিয়া গেল—দুয়ারের নিকটে। সেখানে ডিউটি একটি ছোট ছেলে এসে আস্তে আস্তে তাকে কি বলিল। সে ফিরিয়া আসিল সুব্রতর বেডের ধারে।

"আপনার সঙ্গে কারা দেখা কর্‌তে এসেছেন। আস্‌তে বলব ?"

সুব্রত ঘাড় নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

"মা—"

"বাবা—"

সুব্রতর মা এসে বেডের পাশে বস্‌লেন। আহত মস্তকটা কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়েছিল—কিন্তু পাছে, নাড়া চাড়ায় কোন ক্ষেতি হয় ভেবে, তা আর কর্‌লেন না। শুধু হাত দুটি তার আপন হাতের মুটোয় নিলেন। হাত দুটি তাঁর কাঁপ ছিল বুঝি! ভেতরে কত বড় একটা ঝড় ঐ ক'খানা শুক্‌নো পাঁজরের বেড়া দিয়ে আট্‌কে রেখেছেন তিনি!

সুব্রত বুঝিল—বুঝিয়াও হাসিল।

"এখানেও রাণীমার পায়ের ধূলো পড়েছে, আর রোগবালাই, দুঃখ কষ্ট রইবে না, মা। খবর পেয়েই ছুটে এসেছ ? ভয়ের কিচ্ছু নেই। বাড়িটে বড্ড লেগেছিল, কিন্তু গুরুতর একটা কিছু হয় নি। তোমার পায়ের ধূলোর আশীর্ব্বাদে অকল্যাণ কখনো হবে না।"—এই বলিয়া সে হাতখানা বাড়াইয়া দিল—মার পায়ের দিকে। মা

পায়ের ধূলো দিলেন। সে হাতখানা মাথায়, কপালে, বুকে বুলাইল। নিশ্চিন্ত হইল।

শুশ্রূষাকারিণী শিয়রে দাঁড়াইয়া তখনও পাখার বাতাস করিতেছিল। সে এতক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়াছিল মা আর ছেলেটির পানে। এইবার মুখখানা তার অন্য দিকে ফিরাইল। ক্ষণেকের জন্য। আঁচলে মুখখানা একবার মুছিয়াও লইল বুঝি! সেও তবে ঘেমেছে বুঝি! ধীরে ধীরে বলিল—

"মা, আপনি কিচ্ছু ভাব্‌বেন না। ডাক্তার ব'লে গেছেন—ফ্রাক্‌চার হয়নি। ওপরকার ক্ষত। অনেকটা রক্ত বেরিয়েছে, তাই দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছেন। দু'চার দিনেই সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বেন।"

মা মুখ তুলিয়া চাহিলেন—সেই খদ্দরপরাণা শুশ্রূষাকারিণী দেবীপ্রতিমা পানে! জহুরি নৈলে কি আর জহর চেনে? মা বুঝিলেন—কত বড় একটা দরদ ও যত্নের ভেতরে তাঁর সুব্রত—তাঁর একমাত্র সহায় সম্বল, একমাত্র বল ভরসা, একমাত্র আশা ও সুখ সুব্রত—আজ নিতান্ত অসহায় শিশুটির মতন আশ্রয় পেয়েছে! নির্ব্বাক্ রইলেন তিনি।

সে ধীরে ধীরে এসে তাঁর পায়ের ধূলো নিল।

"কি ব'লে আশীর্ব্বাদ করব মা তোমায়!"—তাঁর স্বর বড্ডই গাঢ় হ'য়ে গিয়েছিল।

"এই ব'লে আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার দেশের যত আর্ত্ত ভাই বোন্‌দের পাশে দাঁড়িয়ে সারাজীবন যোগ্য হতে পারি আপনাদের পায়ের ধূলো পাবার!"

তার স্বরটাও বেশ সহজ ছিল না। তার এই তরুণ জীবনের পুণ্য আকুতিটাকে ঐ বর্ষীয়সী নারী—যিনি দরিদ্র

নারায়ণের সেবাকেই জীবনের ব্রত করিয়াছেন—বড়ই সোহাগ করিয়া আপন অন্তরের অন্তরতম অনুমোদনের মাঝে বরণ করিয়া লইলেন।

দেওয়ানজী সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তিনি বসিয়াছিলেন টুলটার ওপর। প্রাচীন মানুষ—সুব্রতর পিতাও তাঁকে জ্যেষ্ঠের মতন সমাদর করিতেন। তিনি বলিলেন—

"আর এ হাঁসপাতালে কেন থাক্‌বে, সুব্রত? চল বাড়ী চল—আমরা তোমাকে নিয়ে যেতে এসেছি। সাবধানে নিয়ে যাবার সব বন্দোবস্ত করা হ'য়েছে। সিভিল সার্জ্জেনকেও সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"তাত' হয় না, জেঠা মশায়। আমি যে আজ ঐ সব ছেলেদের—কর্ম্মীদেরই একজন। তাদের একজন হ'য়েই কাজ ক'রে আসছি। তাদের একজন হ'য়েই আজ আমাকে এ উপসর্গটা পোয়াতে হবে। জমিদারীর কাছারিতে ব'সে আমি একাজে যোগ দিই নি; আর, জমিদার প্রাসাদে গিয়ে এ উপসর্গটুকু আমি সারিয়ে আস্‌তে পার্‌ব না, জেঠামশায়। ব্রত-ভঙ্গ হবে।"

কথাগুলো শুনে শুশ্রূষাকারিণীর মুখখানা গৌরবে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছিল।

"তোমার ভাবটা বোধ হয় বুঝিছি, বাবা। কিন্তু, তোমার যে মাথাটার ওপর এত বড় একটা কাজের বোঝা, সে মাথাটা বাড়ীর যত্নতদ্বিরে হয়ত' খুব শীগ্‌গিরই সবল হ'য়ে এসে আবার বোঝাটা তার তুলে নিতে পার্‌ত। হাঁসপাতালে দেরী হ'য়ে পড়্‌বে—তোমার কাজেরই ক্ষেতি হবে কদ্দিন!"—দেওয়ানজী বলিলেন।

"আপনাদের স্নেহের মন, তাই অমন ক'রে দেখ্‌ছেন। কাজের বোঝাটা বইবার মাথার কথা বল্‌ছিলেন। দশজনের একজন হ'য়ে কাজের মধ্যে এসে না পড়্‌লে, বোঝা বইবার মাথাই হ'ত না; আর,

যারা সব্বাই এ কাজ কর্‌ছে, তারাও আমাকে তাদের মাথা কর্‌ত না। এ কাজের মাথা হবে তারা, যারা, কাজের যারা সব হাত পা, বুক, ঘাড়-গর্দ্দান, তাদের সঙ্গে সবরকমে একাত্মীভূত হ'য়ে থাক্‌বে। তফাৎ থেকে, ওপর থেকে, মাথার কাজটা করা যাবে না, জেঠামশায়। আজ আমি সাম্প্রদায়িক বিরোধ থামাতে গিয়ে লাঠির বাড়ি খেয়ে যদি বাড়ী ফিরে যাই, তবে দেশের চোখে সদিচ্ছাসম্পন্ন জমিদার সুব্রতবাবু হয়ত' থেকে যাব, কিন্তু দেশের আজ যারা সত্যিকার সেবক সেবিকা, তাদের 'সুব্রতদা' আর থাক্‌ব না।"

কথাগুলো তার অকাট্য, তা কেবল মা কেন, দেওয়ানজীও বুঝিলেন। মা ছেলেটিকে অনেকদিন হ'তেই চেনেন।

"ভাল কথা, সতু, বিনয়কে টেলিগ্রাম ক'রে দিয়েছি, আস্‌তে।"

"সে কাজের লোক, তাকে এই সামান্য-টুকুর জন্যে কেন টেনে আন্‌তে গেলে, মা?"

"তুমি কাজে লাগ্‌বার পর সে যে আমাকে প্রতিশ্রুত করিয়ে রেখেছে—কোন কিছু হ'লেই তাকে তখুনি খবর দিতে। এ সব কাজে নানান্ হাঙ্গামা—এত' হামেশা আছেই।—সে লিখেছিল।"

"তুমি একলাটি ঝক্কি সাম্‌লাতে পার্‌বে না, তাই বুঝি সেও এসে বুক পেতে দিতে চায়? বৌদিকে তুমিত' দেখনি মা। যদি একবার দেখ্‌তে!"

"বিনু আর তুই যে আমার একপেটের ছেলের মতন! তোমার একটু কিছু হ'লে, আমার দুশ্চিন্তের কোন কারণ ঘট্‌লে, সেত' বরাবরই ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে এসেছে। আর, কি কর্‌লে কি হয়, তা সে বোঝে সোঝেও ভাল। সে এসে পড়্‌লে আমি বল পাব। বৌমাকে সঙ্গে আন্‌তে বোধ হয় পার্‌বে না?"

"বোধ হয় না। বৌদি দরকার হ'লে সুভদ্রার মতন বিন্দার 'বিজ্‌নেসের' রথটা চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এখন তাদের কাজের যে মরসুম। খরিদ বিক্রীর আসল ঝক্কিটেই এই সময়। বিন্দা বৌদিকে ওখানে রেখে এলে রথচক্রটা একান্ত অচল হবে না।"

দেওয়ানজী অগত্যা তখন সেই হাঁসপাতালেই সিভিল সার্জ্জেনকে কল্ দিয়া আনিয়া চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষার সবিশেষ বন্দোবস্ত করার প্রস্তাব করিলেন। সুব্রত সে প্রস্তাবও "ভিটো" করিল।" সব্বাইকার যে গতি, তারও সেই গতি। নিজের জন্যে "ভিন্ন ডহর" সে হইতে দিবে না। সঙ্গে মেলা ফলটল, বিছানা পত্তর ওঁরা এনেছিলেন। সেগুলো হাঁসপাতালের সাধারণ ষ্টোরে জমা হইল। শুধু তাই নয়। সুব্রতর হুকুম হইল—হাঁসপাতালের ব্যয়ভারটা তাদের জমিদারি কাছারি যেন নেয়। নতুন নতুন বেড্‌টেড যাতে হ'তে পারে, সে রকম ব্যবস্থাও হইল।

অনেকক্ষণ বসিয়া, সুব্রতর গায়ে হাত বুলাইয়া, মা দেওয়ানজীকে লইয়া সেদিনকার মতন উঠিলেন।

"গাঁয়েও যে ঢের কাজ মা! গরীব দুঃখীদের রাণীমা তাদের ছেড়ে এসে থাক্‌লে তাদেরি বা চল্‌বে কেন?"—সুব্রত এই ব'লে মাকে ফিরে যেতে জেদ কর্‌ল। গাঁয়ে গাঁয়ে গঠনমূলক কাজ প্রকৃতভাবে চালাইতে ব্রতী করিয়াছিল, সুব্রত তাদের গ্রামের পল্লীমঙ্গল সমিতিটাকে। কাজ খুব ভালই চলিতেছিল। দেওয়ানজী এসে তত্বতল্লাস নিয়ে যাবেন, ঠিক হইল।

মা উঠিয়া যাবার সময় সেই শুশ্রূষাকারিণী মেয়েটিকে মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। চিবুকখানা ধ'রে আদর কর্‌লেন। দরজার বাইরে গিয়ে, পরিচয়টা জিজ্ঞাসা করিলেন।

"মাতৃসেবিকা এই পরিচয়টুকুর অধিক আর পরিচয় নিয়ে কি করবেন, মা ?" দুজনেই একটু হাসিলেন।

নির্ঝঞ্ঝাটেই দিন দুই কাটিয়া গেল হাঁসপাতালে। সেই প্রায় দিন রাতই সব দেখা শোনা করিত। কি চমৎকার শুশ্রূষার ব্যবস্থা, প্রণালী, ভঙ্গী! পল্লীসংগঠন-সংসদের দু' একজন কর্ম্মচারী মাঝে এক আধ্‌বার আসিয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন। কোন কোন বিষয়ে সুব্রতর পরামর্শও লইয়া গিয়াছিলেন। বাকি সব সময়ই নিরিবিলি। খবরের কাগজ, দু'একখানা বই, তার হাতের ধারে টেবিলে আবশ্যকমত হাজির হইত। ছোট ছেলে ভলেন্‌টিয়ার দু'একটি এসে বহির্জগতের সঙ্গে সেই কক্ষটায় সংযোগটা আবশ্যকমত বাহাল রাখিয়া যাইত। শুশ্রূষাকারিণী বোধ হয় পাশের কোন একটা ঘরেই থাকিতেন। আহতের প্রয়োজন, সুখশান্তির ধ্যানেই যেন নিরতা থাকিতেন। মুখ ফুটিয়া কিছু চাহিবার অবকাশ আসিত না। কি একটা রেডিও মেসেজ, কি একটা টেলিপ্যাথিতে, সবই আগে হইতে সে বুঝিতে পারিত!

রাত্তিরে ভারি গরম। সুব্রতর হয়ত ঘুম ভেঙ্গে গেল। কত রাত্তির তখন? শিয়রের দিকে চেয়ে দেখে—টুলে ব'সে সে আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিচ্ছে। তারি মুখের পানে তাকিয়ে ছিল বুঝি? তার দিকে চাইতেই সে চোখ দুটো নীচু করত। আর, মুখখানা একটুখানি—কি বল্‌ব?—রাঙার মতন হ'ত না কি?

"আপনার যে খুব কষ্ট হচ্ছে। কত আর বাতাস করবেন? দিন নেই রাত নেই—এত শুশ্রূষা করলে ত' আপনিই নিজে শুশ্রূষার দরকারে গিয়ে পড়্‌বেন। আমিত' প্রায় সেরেই উঠিছি।"

"না, আমার কষ্ট হয় না। আপনারা দেশের ভালর জন্যে প্রাণ পেতে দেবেন, আর, দু'চারদিন, দরকার হ'লে, আপনাদের দুঃখদরদে সেবা

শুশ্রূষা করার একটুখানি আঁচ্ লাগ্‌তে না লাগ্‌তে আমরা ননীর পুতুলের মতন গ'লে যাব?"

সুব্রত বুঝিল—তার ভেতরে সত্য সত্যই নটরাজ নেচেছেন! ফেরবার জন্যে নয়, থম্‌কে দাঁড়াবার জন্যে নয়, চলার জন্যেই এ নারী চলার পথে নেবেছে। চলার পথটি সুন্দর হোক্, শিব হোক, সত্য হোক্! পথ চলতে চল্‌তেই তাকে আজ সে সাথীরূপে পেয়েছে। তার ঘরের পরিচয় নেওয়া বা জানা মোটেই জরুরি নয়। ঘরত' পাছে ফেলেই চ'লেছে—পাছের দিকে এখন তাকিয়ে কি হবে? সুব্রতর তাকে পরিচয় টরিচয় জিজ্ঞাসা করা হ'ল না।

সব দিক্ দিয়ে খুব ভাল লাগত এই মেয়েটিকে তাঁর। তার তরুণ জীবনের যা কিছু শক্তি, যা কিছু আশা, যা কিছু আনন্দ, যা কিছু সবই—ঘটটিতে তার সে আজ ভ'রে নিয়ে এসেছে দেশ-মাতৃকার মহাপূজার বোধনের নিমিত্ত! কল্যাণশক্তিরূপিণী নারীর কক্ষে ঐ মঙ্গল ঘটে আজ যদি ভারতের, জগতের ইষ্ট-শক্তি পূজার বোধন না হয়, তবে, জানিনা, আর কিসে হবে! শুধু আমাদের, পুরুষদের, বুকের রক্তেও তা হবে না।

কিন্তু শুধু দেশসেবিকা শুশ্রূষাকারিণীরূপেই সে কি আজ তার শিয়রটিতে দিনরাত ব'সে রয়েছে? কে জানে! নারী-হৃদয়ের অতলে থৈ নেবার চেষ্টা ক'রে কাজ নেই। সুব্রতও বোধ হয় সে চেষ্টাটা করে নি।

এই প্রথম হ'লে সুব্রত "লভে" প'ড়ে যেত' কি না, বলা যায় না। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধের মতন পুষ্পধন্বারও একটা আপ্‌রুচি ও খোস খেয়াল আছে। তবে, কথাটা এই—লভের টিকে একবার নিলে বছর কতক নতুন করে ল'ভে পড়বার ভয় বোধ করি থাকে না। ক'বছর "ইমিউন"

থাকা যায়, তা টিকেদারের টিকের তেজ বা শৌর্য্য বীর্য্যের ওপর যতটা নির্ভর করে, তার চাইতে বেশী নির্ভর করে, যে টিকে নিয়েছে, তার প্রকৃতির, কনস্‌টিটিউসনের ওপর। কারুর দুমাস ছমাস গড়ায় না। কারুর দু'চার বছর চ'লে যায় ঐ এক টিকেয়। সে সময়কার বাংলাটিকে মারাত্মকও হ'ত, কিন্তু টে কসই ছিল। আজকাল বিলেতী টিকের আয়ুষ্কাল স্বল্প। যাই হোক্—শুশ্রূষাকারিণীর প্রেমে সুব্রত সেই হাঁস-পাতালের বেডে পড়িয়া থাকিয়াই পড়িয়া যায় নি, এপক্ষে সকলে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তবে, সত্যিই খুব ভাল লাগিয়াছিল তাকে তার।

আর, তাঁর কুলের পরিচয়টাই যখন আমরা পাইনি, তখন, আপাততঃ তার এই শীলের পরিচয়টা পেয়েই আমাদের সন্তুষ্ট থাক্‌তে হচ্ছে। আর বেশী তলিয়ে যেয়ে কাজ নেই।

সন্ধ্যার পর রোজই দু'একখানা গান গাইয়া সুব্রতর চিত্তবিনোদন করিত সে। সুব্রত তার নিজের কাগজ, বইটই তাকে পড়িতে দিয়াছিল। বেশ সুন্দর সাড়া পাওয়া গিয়াছিল তার ভেতর হইতে। চলার পথে মনের মত সাথীটি বটে। আলোচনার ভেতর দিয়া তার ভেতরে নিজের মিলটাই সুব্রত যে দেখিত, এমন নয়। তার মনে হইত—ঐ নারী তার চলার পথে কোন এক মহাসিন্ধুর সাড়া পেয়েছে। সিন্ধুর বেলায় গিয়ে যতক্ষণ না দাঁড়াচ্ছে সে, ততক্ষণ তার স্বস্তি নেই। সাধারণ পঙ্কিল খানা ডোবা কেন, কোন কল্পলোক, গন্ধর্ব্বলোকের অচ্ছোদ সরোবর তটেও, কুটীর-টুটীর বেঁধে তার থেকে যাওয়া বোধ হয় চল্‌বে না।

একটা মজা সুব্রত লক্ষ্য করিত—এই শুশ্রূষাকারিণী তরুণীর স্নেহ হৃদয়ের নিবিড় আবেষ্টনের মধ্যে থেকে তার সুচরিতা-অনুভূতিটে খুবই

সম্ভোগ হ'ত, কিন্তু, কি জানি কেন, উগ্র হ'য়ে, নিষ্ঠুর হ'য়ে, সেটা তাকে পীড়িত করত না। শুধু মাথার ব্যাণ্ডেজটা কেন, বুকের গোপন ব্যাণ্ডেজটাও তার বেশ মোলায়েম হ'য়ে লেগে থাক্‌তো—সে সেবাকক্ষের আলো, হাওয়া, আঁধার, সব কিছুতেই, কিসের একটা যেন অতি কোমল সোহাগ আর সান্ত্বনার স্নিগ্ধপ্রলেপ দেওয়া থাকৃত' ব'লে!

দিন দুই পরেই বিনয় এসে হাজির। তখন বিকেলবেলা। সুব্রত-এক কাপ্‌ গান্ধী চা খাচ্ছে। খাটখানায় তার ব'সে। সে তখন ঘরটিতে ছিল না।

"এই যে বিনদা—টনক ন'ড়ে গেছে? কাজ কম্ম ফেলে ছুটে এসেছ? বৌদি কেমন আছে বল।"

"ভাল। মায়ের 'এস্, ও, এস্' (এসহে এস?) তোমার বৌদির হাতে যাই পড়ল, অমনি আমাকে কারখানার আস্তাবল থেকে খুলে রেসের ঘোড়া ক'রে পাঠিয়ে দিলে। তার তাগিদে না ছুটে উপায় ছিল?"

"আমার কিছু হ'লে তোমার নিজের তাগিদটেও কোন দিন কম দেখিনি ত' বিনদা!"

—সুব্রত একটু আর্দ্রস্বরে বলিল। "ভাল—রেসের ঘোড়ার 'জকিটিকে' দেখ্‌ছিনে ত'?" হাসিয়া আবার সে বলিল।

"রেস্‌কোর্সের গোড়াতেই বেশ ক'রে চাবুক ক'ষে ছেড়ে দিয়েছে। ঘোড়া নিজের জকি নিজে হ'য়েই ছোট্‌বার পথ পায় নি।"

"পথ পায় নি! তাই বুঝি জিত্‌তে পারনি? তোমার আগে সেই দেখ্‌ছি বেতারে এসে প'ড়েছে!"

বেতারে নয়—তারে! তার আগের দিন সুষমার এক তার এসে-ছিল কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা ক'রে। আর, আজ—এই একটু আগে—

তার একখানা চিঠিও সুব্রত পেয়েছে। চাবুকের চিহ্নটা আর সে দেখিতে চাহিল না। চাবুকের লেখাটা—পিঠে না, আর কোথাও?

"এই দেখ চিঠি পেয়েছি। সত্যিইত'—বৌদিরই আমার জিত। চিঠিও যে মেলে, তুমিও সেই মেলে। তোমার আগে চিঠিটে এল কেমন ক'রে' বিনদা?

"সেই কথাই ত কইতে হবে এখন। আমি তিনটের গাড়ীতে এখানে নেমেই দু'একজন উকীলের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাই। তারপর যাই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কুঠীতে। সেখান থেকে এই আস্‌ছি। তোমার কল্যাণপুরের দাওয়ানজী ষ্টেশনে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রেছিলেন। তিনি বরাবর সঙ্গে ছিলেন। এখানে আর এলেন না, বাড়ী গেলেন। মাকে খবর দিতে।"

"কি গুপ্ত পরামর্শ আঁটছ তোমরা বল দিকিন। দাওয়ানজী বুড় মানুষ—বড্ড স্নেহও করেন। তিনি কতকটা ঘাব্‌ড়ে গেছেন বোধ হয়। তাঁকে নিয়ে ম্যাজিষ্ট্রেটের কুঠীতে যাওয়া—কেন বলত?"

"মাপ ক'রো সুব্রত—তোমার 'প্রিন্সিপল্‌স্' আমি জানি। তবু ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে গিছলুম। তোমার সম্বন্ধে 'এটিচিউড'টা ঠিক ওদের কি তাই জান্‌তে। তুমি খাঁটি কাজ ক'রে যাচ্ছ, তোমার ওসব বিষয়ে হয়ত' আগ্রহ বা উদ্বেগ নেই। আমাদের একটুখানি আছে। দেখলুম—ম্যাজিষ্ট্রেট্‌টি বেশ ফেয়ার মাইণ্ডেড জেণ্টল্‌ম্যান্। তোমার ওপর শ্রদ্ধা আছে। বল্লেন—সুব্রতবাবু যে আন্দোলনটায় যোগ দিয়েছেন, সেটা আপাততঃ নির্দোষ হ'লেও, পরিণামে হয়ত' এমন আকারে দাঁড়াবে, যেটাকে, দমন করতে গবর্ণমেণ্টকে বাধ্য হ'তে হবে—নৈলে যে গবর্ণমেণ্টের অস্তিত্বই থাকে না। কিন্তু এটা আমরা স্বীকার করি—সুব্রতবাবুর নিজের পথটা ক্লিন্ এণ্ড

ওপেন্। তিনি কন্‌স্‌ট্রাক্‌টিভ কাজটা নিয়েই বেশীর ভাগ আছেন। তাঁর সত্যিকার দেশের ওপর দরদ আছে, দেশের জন্যে ত্যাগও তাঁর আছে। প্রত্যেক ইংরেজ অন্তরে অন্তরে সেটার সমাদর করেই। যদিও বর্ত্তমান আন্দোলনে তাঁদের রাস্তাটা কোন কোন দিকে ভুল বা রিস্কি ব'লেই গভর্ণমেণ্ট আর আমাদের ধারণা। পুলিশ ও গভর্ণমেণ্ট অফিসিয়ালদের প্রতি বিদ্বেষ নাকি তোমার প্রভাবেই এ অঞ্চলটায় তেমন মাথা তুলতে পারে নি। কম্যুন্যাল্ রায়েট্ও এদ্দিন হ'তে পারে নি, প্রধানতঃ তোমারি চেষ্টায়।"

"ভাল সার্টিফিকেট আদায় ক'রে এনেছ ত'! দেখা যাক্, কোন্ কাজে লাগে। সত্যি বিনদা, আমাদের বিলেতী কাপড়ের দোকানে, মদ গাঁজার দোকানে দোকানে পিকেটিং ক'রে বেড়াতে হয় নি। আমরা স্বদেশী প্রচারের জন্যে অন্য রাস্তা ধ'রেছি। আমরা লোকের দুয়োরে দুয়োরে গিয়ে, তাদের সকল রকম সুখদুঃখের ভাগী হয়ে, আস্তে আস্তে তাদের মনটা দখল করতে চেয়েছি। তখন যা বুঝিয়েছি, তাই বুঝেছে তারা। জনসাধারণকে—যাদিকে কুলিমজুর বল, তাদিকেও—যতটা পারি ভাই বোন ক'রে নেবার চেষ্টা করেছি। যে মজুরের বাড়ী দিনের পর দিন গিয়ে তার সব কিছুর তত্ত্বতল্লাস নিয়েছি, দরকার হ'লে নার্স ক'রেছি, অষুধ পথ্যি যুগিয়েছি, সকল অভাব মোচন ক'রেছি,—যার পরিবারকে গিয়ে মা ব'লে ডেকেছি, যার ছেলেপিলেদের কোলে পিঠে নিয়ে আদর করেছি—সে আমাদের কথা ঠেলতে পারেনি, যখন তার রোজগারের ক'গণ্ডা পয়সা শুঁড়ির দোকানে দিয়ে আসতে তাকে আমরা বারণ ক'রেছি। সে চোখে জল ফেলতে ফেলতে ব'লেছে—আল্লার কিরা বাবুজী, আর সরাপ খাব না। "ম্যাস"এর হার্টটাকে "রিচ" করা চাই বিনুদা। ভয় দেখিয়ে, জুলুম জবরদস্তি ক'রে কদ্দিন ঠেকানো যায়?

ঠেকালে সেটা টেকেই বা কদ্দিন? আর আসল কথা, যাকে ভয় দেখিয়ে শাসন ক'রে আজ ঠেকালাম, সে আজ থেকে আমার বন্ধু, আমার অনুগত, আমার সহায় হল না নিশ্চয়।"

"ম্যাজিষ্ট্রেটও সে কথা স্বীকার করেন। তারা তোমার কাজের প্রণালীটে বোধঃহয় বুঝ্‌তে পারে না। আমার কাট্‌নি কারখানায় কুলি-মজুরদের বুঝিয়ে সুজিয়ে নেশা ভাঙ ছাড়িয়িছি; খদ্দরও চল্‌ছে। তবে পরিবর্ত্তনটা বোধ হয় অনেকটা ওপর ওপর, সাময়িক। সত্যিকার ভেতরকার পরিবর্ত্তন যা একটু আধটু হ'য়েছে ও অঞ্চলে, তা তোমার বৌদির মহিমায়। তারও কাজের ধারা অনেকটা তোমারি মতন।

"মেয়েদের কাজেরত ঐটেই আসোল ধারা। কর্কশ কিছু, পরুষ কিছু, রূঢ় কিছু থাক্‌লে সে ধারা বাধাই পাবে। তারা মা হ'য়ে, বোন্‌টি হ'য়ে, মেয়েটি হ'য়ে যেখানে যেখানে যাবে, সেখানে অন্তরের যেটা সুন্দর সেটা সাড়া দেবেই, ভেতরকার যেটা কল্যাণশক্তি সেটা জাগবেই, সেখানে সত্যিকার শুভ পরিবর্ত্তনের সূচনা হবেই। বৌদির আমার এ নতুন মহিমার কাহিনী শুনে সত্যিই খুব আনন্দ হ'ল বিনদা।"

"ভাল কথা—পাব্‌লিক প্রোসিকিউটার্ আব ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা ক'রে আরও একটা জান্‌তে পারলুম। সেটা জানাও আমার উদ্দেশ্য ছিল। এদ্দিন তোমার গায়ে হাত দেয় নি তারা, কিন্তু এবার তোমাকে প্রোসিকিউট্ কর্‌বে তারা স্থির ক'রেছে। কোন্ সেক্‌শনে তা শুনিনি।

"তোমার নাম, প্রতিপত্তি, এ অঞ্চলে অসাধারণ; তার ওপর তোমার ক্লিন্ আর ওপেন্ ফাইট্—এর জন্যে শ্রদ্ধা কর্‌ত ব'লেই, বোধ

হয়, এদ্দিন কিছু বলেনি। কিন্তু যে প্রাইম্ মুভার—তাকে আর উপেক্ষা কর্‌লে চল্‌ছে না তাদের। তোমাকে ফিল্ড্ থেকে সরানো দরকার হ'য়ে প'ড়েছে। এটা অবশ্যি আমার অনুমান—তবে, বোধ হয়, অনুমানটা মিথ্যে নয়। আর, ধর্‌তেই যদি হয়, সেক্‌শন টেক্‌শন্‌ত' র'য়েইছে।

"হ্যাঁ। ১৪৪ ধারা ত' র'য়েছে। সেই যেদিন প্রোসেশন আমরা নিয়ে গিছ্‌লুম, সেই দিনই প্রোসেশনের মাঝেই, ১৪৪ ধারা জারি ক'রেছিল ওরা আমার ওপরে। জাতীয় আন্দোলন ত' এখন আইন অমান্য ক'র্‌ছে না। তবু, সেদিন ক্যমুনাল রায়েটের ভেতর থেকে হঠাৎ, স'রে আসা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। সাধ্যমত সেটা থামাবার চেষ্টা কর্‌তে হ'য়েছিল।"

একটি ছোক্‌রা ভলেণ্টিয়ার আসিয়া খবর দিল—বাহিরে এক পুলিশ কর্ম্মচারী দাঁড়াইয়া। পুলিশ কর্ম্মচারী আসিল। সুব্রতকে নমস্কার করিয়া কি একখানা কাগজ বাহির করিল। বিনয় সেটা লইল—সুব্রতকে এরেষ্ট করার ওয়ারেণ্ট। শুধু ১৪৪ ধারার লঙ্ঘন সে করিয়াছিল বলিয়া নয়, আরও একটা কি সেক্‌শনে তাকে এরেষ্ট করা হইতেছে। ৫০০ ই, পি, সি। ডিফামেশান্ (মানহানি) বুঝি? সুব্রত বুঝিল না—এ সেক্‌শন্‌টা যোড়া হইল কেমন করিয়া। পুলিশ কর্ম্মচারীটিও কিছু বলিতে পারিল না।

"ইনিত' সেদিনকার রায়েটে জখম হয়ে হাঁসপাতালে শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়ে আছেন। এখন এঁর সম্বন্ধে আপনারা কি কর্ত্তে চান?"—বিনয় জিজ্ঞাসা করিল।

"যদি এর মধ্যে একটু ভাল বোধ করেন ত' দিন সাতেক পরে পুলিশে অথবা কোর্টে সারেনডার কর্‌লেই চলবে। ওঁর মুখের কথাই

যথেষ্ট। অন্য জামিন টামিনের দরকার নেই।—এইটে জানিয়ে দেবার হুকুম আমার আছে।"—পুলিশ কর্ম্মচারীটি চলিল।

"আচ্ছা, তাই হবে। নমস্কার!"—সুব্রত বলিল।

"নমস্কার"।—নমস্কার জানাইয়া পুলিশ কর্ম্মচারীটি চলিয়া গেল।

"ডিফামেশন্‌টা এল কোত্থেকে? তোমার কাগজে কিছু বেরোয় টেরোয় নিত'?"

"জ্ঞাতসারে ত' নয়। খবর নিচ্ছি।"

যে ছোক্‌রাটি তখন সেখানে ডিউটিতে ছিল, তার হাতে একখানা স্লিপ্‌ দিয়া সুব্রত তাকে পাঠাইল তার কাগজের আফিসে, সব্‌ এডিটারকে ডাকিতে। তাকে মাসখানেকের ফাইলও আনিতে বলা হইল।

ফাইল উল্টাইয়া দেখা গেল—যেদিন সুব্রতর মাথায় বাড়ি পড়ে, ঠিক তার পরের দিনের ইস্যুতে একটা প্যারা বেরিয়েছে—যাতে এমন ইঙ্গিত আছে—রাজপুরুষদের কেউ কেউ নাকি কম্যুনাল রায়ট্‌ বাধিয়ে দেবার চেষ্টা ভেতরে ভেতরে না করুন, তাতে কতকটা উদাসীন ছিলেন। হাঙ্গামা বাধ্‌লেও অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেদিকে নাকি লাল পাগ্‌ড়ী দেখা যায় নাই। পুলিশ নাকি তখন ক্লাবে টেনিস, হকি খেল্‌ছিল।...

অভিযোগটা প্রচ্ছন্ন হ'লেও গুরুতর বটে! সুব্রত সব্‌ এডিটরকে জিজ্ঞাসা করিল—"এ অভিযোগটা সত্য, মহিমবাবু? কার লেখা এ প্যারাটা? আপনি দেখে দেন নি? ভাল ক'রে খোঁজ নিয়ে, সত্য মিথ্যা জেনে, তবে এটা ছাপা হ'য়েছিল কি?"

সে বেচারী উত্তর আর কি দেবে? প্যারাটা তার লেখা নয়। আর কোন্‌ সব্‌ এডিটারের। সে সেদিন থেকে "ইন্‌চার্জ্জ" আছে বটে,

কিন্তু নানা কারণে, সব দিকে তেমন নজর রাখিতে পারে নাই। এডিটোরিয়াল্ আর্টিকল্ দু'একটা রোজ সে নিজেই লিখ্ছে। আর আর লেখা সে তেমন চেক্ করিতে পারে নাই। লজ্জিত হইয়া বলিল—

"রিগ্রে জানিয়ে আর একটা প্যারা কাল্কেই বের ক'রে দেব কি?"

"না! কথায় কথায় লুটিয়ে পড়্লে কাগজের সম্ভ্রম থাকে না, মহিমবাবু। এখ্খুনি কাগজে কিচ্ছু বের করার দরকার নেই। আমি সতি মিথ্যে খোঁজ নেবার ব্যবস্থা কর্ছি। যদি দেখি, কথাটা সত্যি—তা হ'লে আলাদা কথা। যদি দেখি মিথ্যে—রিট্রাক্ট্ কর্তে হবে, দস্তর মত এমেণ্ডস্ও কর্তে হবে। গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে কোন মিথ্যে, নোংরা, হাল্কা চালে আমরা জিত্তে চাইনে, মহিমবাবু। তাতে আমরাই খাটো হ'য়ে পড়্ব। লেখাটেখার ওপর নজর রাখ্বেন। আর, অবশ্যি, এ প্যারাটার জন্যে সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমি নিজের ঘাড়েই নিচ্ছি। আসুন—নমস্কার।"

সব্ এডিটারটি চলিয়া গেল।

"এ আবার নতুন হেঙ্গামা দেখ্ছি, বিনুদা। জেলে যেতে ভয় করিনে। কিন্তু আমার কাগজ যদি অন্যায় ক'রে কারুবুকে ঘা দিয়ে থাকে! সেটা ককখনও হ'তে দিই নি। আমি কাগজ নিয়ে মিথ্যে প্রোপাগ্যাণ্ডা কর্ব, বিনুদা! প্রতিপক্ষের ওপরও অন্যায় আক্রমণের ঘা আমাকে দশগুণ ঘা দিয়ে যায় যে!"—সুব্রতকে বেশ একটু দুঃখিত দেখা গেল।

"আচ্ছা, তোমাদের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দেখা ক'রে একটা নিরপেক্ষ থরো এন্কোয়ারি যাতে শীগগির হয়, তাই কর্ছি,

সতু, তুমি মনটা খারাপ ক'রো না।"—বিনয় এই বলিয়া উঠিল।

দিন সাতেক পরে। সুব্রতর মাথার ব্যাণ্ডেজটা তখনও খোলা হয় নি, তবে ক্ষতটা প্রায় সারিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তখনও সে দুর্ব্বল। চলা ফেরা করিতে কষ্ট হয়। আজ তার মোকদ্দমার দিন।

কোর্টে গিয়া কাঠগড়ায় সে দাঁড়াইল। কোর্টে লোকজন অনেক জমিয়াছে। অনেকগুলি মামলাও। "সে" কিন্তু তার ভেতরে নেই। ম্যাজিষ্ট্রেট্ কেস্‌টা নিজের ফাইলে রাখেন নি। একজন ডেপুটির ফাইলে দিয়েছেন। খাস কামরার পর্‌দাটা আর্‌দালি সরাইয়া ধরিল। হাকিম বাহির হইলেন।

এ কি!—হাকিম আসামীর দিকে চাহিয়া একটু যেন বিস্মিত হইলেন। আসামীও হাকিমের পানে চাহিয়া একটু যেন চম্‌কাইয়া উঠিলেন। মিঃ সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি যে! সমরেন্দ্র সেই মাণিকপুরে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল—সুব্রতকে একবার তার কর্ম্মস্থলে যেয়ে দিন কতক থেকে আস্‌তে। সে নিমন্ত্রণ আজ সুব্রত রক্ষা করিতে আসিয়াছে! মাত্র দু'দিন হইল সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি সেখানে বদ্‌লি হইয়া আসিয়াছেন। কাজেই, তারা পরস্পরকে সেখানে আশা করে নি।

পাব্‌লিক প্রোসিকিউটার গভর্ণমেণ্ট পক্ষে কেস্ আরম্ভ করিলেন। ৫০০ ই, পি, সি (মানহানি) কেস্‌টার বাদী ছিল পুলিশ সাহেব স্বয়ং। সেই কেস্‌টাই আগে হইল। সুব্রত আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য উকিল টুকিল দেন নি। মানহানির মামলায় সে গোড়াতেই একটা "ষ্টেট্‌মেণ্ট" করিল।

কাগজের প্যারাটা তার অনুপস্থিতি কালে লেখা হ'লেও, তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার নিজের। সে পরে বিশেষ অনুসন্ধান ক'রে জেনেছে, প্যারাটায় কোন কোন রাজপুরুষের, বিশেষ পুলিশ সাহেবের নামে, যে অভিযোগের ইঙ্গিত আছে, সে অভিযোগটা ভিত্তিহীন। এখানকার রাজপুরুষরা তাঁদের দিকের কাজ "ক্লিন্" এবং "ফেয়ার" ভাবেই ক'রে আস্ছেন। তাঁদের কোনও কাজ "আণ্ডার হ্যাণ্ড" হ'য়েছে ব'লে অনুযোগ অভিযোগ করার তার নেই। গভর্ণমেণ্টের সকল নীতি জাতীয় পক্ষ, অথবা জাতীয় পক্ষের সকল নীতি গভর্ণমেণ্ট, অবশ্য সমর্থন করেন না। কিন্তু অন্ততঃ এ জেলার কোন পক্ষই সম্ভবতঃ অপর পক্ষের সঙ্গে কার্‌বার কর্‌তে গিয়ে সম্ভ্রম নষ্ট ক'রে নি, মর্য্যাদা নষ্ট করে নি। যখন প্রমাণ পেয়েছি—আমার কাগজের ও লেখাটায় সত্যিই একটা অন্যায় অভিযোগ আনা হ'য়েছে, তখন, একটুও দ্বিধা না ক'রেই, ও লেখাটা আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি। আর অসতর্ক অভিযোগ আনার জন্যে দুঃখ প্রকাশও কর্‌ছি। পক্ষান্তরে, অভিযোগটার মূলে যদি সত্য থাকৃত,' তবে, ফল যাই হোক্ না কেন, আমার খুটো ছেড়ে এক চুলও স'রে যেতুম না।"

পাব্‌লিক প্রোসিকিউটার কোর্টের অনুমতি লইয়া মানহানির কেস্‌টা তুলিয়া লইলেন। সুব্রতবাবুর সুখ্যাতি করিতেও কসুর করিলেন না। রায়েটের সময় হিন্দুদের হাত থেকে মোছলমানদের ক'একটিকে বাঁচাতে গিয়েই ত' তিনি তাঁর মাথাটা ফাটিয়ে আসেন!

তার সম্বন্ধে ১৪৪ ধারা মামলায় সুব্রত কিছু বলিল না। আত্মপক্ষ সমর্থনও করিল না। সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার—জাতীয় পক্ষ তখন আইন অমান্য করিতে বলেন নি। তার বুকের গোপন ব্যথাটায়

আগিদই বোধ হয় সব চাইতে বড় হ'য়েছিল—তাই সে খুঁজ্‌ছিল বুঝি দিন কতক পালিয়ে থাক্‌বার একটা নিভৃত গুহা! কে জানে!

একটা সর্ত্ত (undertaking) করিয়া তাকে ছাড়িয়া দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, পাব্‌লিক প্রোসিকিউটার। ডেপুটিও অনুরোধ করিলেন। সুব্রত রাজি হইল না। তার দুর্ব্বল শরীর দেখিয়া ডেপুটি দিন পনেরর জন্য তার কেস্‌টা মুলতুবি রাখিতে চাহিলেন। তাকে বেলে খালাস দিতেও প্রস্তুত হইল। কিন্তু সুব্রতর জেদ—এ সব তাতেও কাজ হইল না।

অগত্যা, ছ'মাসের জেল। সেদিনই প্রিসন্‌ভ্যানে চড়িল সে।

বিনয় সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের হুকুম লইয়া জেলের ভেতর পর্য্যন্ত এসেছিল।

"মা যে বড্ড ভাব্‌বেন, সতু। তোমার শরীরটে বড্ড দুর্ব্বল। তার ওপর জেলখানায়! মাকে কি বল্‌ব, খুঁজে পাচ্ছি নে।"

"কিচ্ছু বল্‌তে হবে না বিন্‌দা। মা তাঁর সতুকে ঠিক চেনেন। আর, ব'লো—যদি কিছু বল্‌তেই হয়—তাঁর পায়ের ধূলোয় বিশ্বাস আমি হারাই নি। কোনদিন যেন না হারাই!"

সেল্‌টা তার দেখিয়া, আবশ্যক দু'একখানা কম্বল, বই টইর ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, বিনয় বাহিরে আসিল।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। বিনয় ক'টা ধূপকাঠি দিয়ে গেছ্‌লো। তাই একটা সেলে জেলে দেওয়া হ'য়েছে। সুব্রত কম্বল পেতে চুপ্‌টি ক'রে ব'সে। এসিটাণ্ট জেলর এসে খবর দিল—এক মহিলা তার' সঙ্গে সাক্ষাৎ কররতে এসেছেন।

মহিলা সেলের ভিতর ঢুকিলেন। গায়ে, মাথায় সিঁথির পরে, একখানা মোটা খদ্দরের চাদর।

সেই—সে—হাঁসপাতালে তার শুশ্রূষাকারিণী!

"আপনি এসেছেন? জেলে ঢোক্‌বার আগে একটিবার আপনাকে দেখ্‌তে পাবার ইচ্ছে কিছুতেই দমন করতে পারছিলুম না যেন। কোর্টে ত' আপনাকে দেখলুম না।"

"না, ওখানে যাই নি। অন্য একটু কাজ ছিল।"—কি একখানা কাগজ সে বের কর্‌ল।

"কি ওখানা?"

"আপনি 'এ' ক্লাস প্রিজ্‌নর্‌ হবেন, আর আপাততঃ ইউরোপিয়ান্‌ ওয়ার্ডে হাঁসপাতালে স্পেশাল ডায়েটে থাক্‌বেন—তারই অনুমতি পত্র।"

"আপনার হাতে?"

"হাঁ, আমিই এনেছি। জেলরকে দিয়ে যাব।" অনুমতিপত্রে মিঃ সমরেন্দ্র চাট্যার্জ্জির সই।

"মাপ কর্‌বেন দেবি! আমি 'সি' ক্লাসেই থাক্‌ব।"

"আপনার শরীর ত' সুস্থ হয় নি এখনও। খাওয়া, দাওয়া, শোয়া বসার একটুখানি বিশেষ ব্যবস্থা না হ'লে—"গলাটা তার কেমন ধরা ধরা!

"কিচ্ছু চিন্তা নেই। আপনাকে কি ব'লে কৃতজ্ঞতা জানাবো দেবি!—"

সে নীরবে উঠিয়া গেল।

নবম

কলিকাতায় বড় একটা জেলখানা। তেতলার একটা সেলে সুব্রত আজ কিছুদিন হইল আসিয়াছে। মফঃস্বলের জেল হইতে ট্রানস্‌ফার্ হইয়া। সে ব্লকটা পোলিটিকাল প্রিজ্‌নরদের জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল।

তার বিনাশ্রম কারাদণ্ড হইয়াছিল। "এ" ক্লাশে সে যাইতে অনিচ্ছুক হইয়াছিল, তবু এখানে তার ঘরটা মন্দ নয়। একখানা লোহার খাটিয়া, একখানা টেবিল ও চেয়ার, খানকতক বই, কাগজ কলম—এ সব ছিল। বিছানা পত্র সাদাসিধা, কিন্তু পরিষ্কার পারচ্ছন্ন। একটা বড় জানালা ছিল। ছাদে ওঠার গোল সিঁড়িটাও তারা ব্যবহার করিতে পাইত। তাদের ওয়ার্ডের ভেতর তাদের গতিবিধিও অনেকটা অবাধই ছিল।

সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট এবং জেলর তার সঙ্গে বেশ অমায়িক ব্যবহারই করিতেন। জেলে আসিয়া দল পাকাইয়া সেখানেও সিভিল বা আন্‌-সিভিল ডিস্‌ওবিডিয়েন্স দ্বারা শাসন-যন্ত্রটা অচল করার চেষ্টা সে বাঞ্ছনীয় মনে করিত না। গোল পাকাইবার "অছিলা" খুঁজিতে সে মোটেই ব্যস্ত থাকিত না। মানুষের ধর্ম্মের যেগুলো মূল নীতি, আর আত্মমর্য্যাদার যেগুলো মূল দাবী—সেগুলো অবশ্য কোথাও সে পদদলিত হইতে দিত না। কিন্তু সেই সর্ত্ত—সেই একমাত্র সর্ত্ত—নিজের সঙ্গে করিয়া লইয়া সে জেলের ডিসিপ্লিন্ বা শাসনটাকে মানিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল। আর, সত্য কথা বলিতে গেলে, সে ভাবিত—জেলের সেল্‌গুলোকে রাজনৈতিক কর্ম্মীদের "যম নিয়ম" অভ্যাসের—ভিতরটা ও বাইরটা শুদ্ধির—সাধন-কক্ষ। বাইরের কর্ম্মের আবর্ত্তে ও কোলাহলে শক্তি অর্জ্জন ও ব্যয় দুইই

হইয়া থাকে, সন্দেহ নেই। দু'দশ দিন নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া শক্তির আয়ব্যয়ের একটা হিসাব নিকাশ লওয়ার প্রয়োজন আছে, তার মনে হইত। কল্যাণশক্তি—যেটাকে গীতা দৈবী সম্পৎ বলিয়া গেছেন—সেটা সত্য সত্যই কতটা পাকা খাতায় ওঠাইবার মতন অর্জ্জন করা হইয়াছে, তা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হয়। কাজের হাটে বাজারে যা কিছু কুড়াইয়াছি, তার মধ্যে ঝুঁটা, মেকিও বিস্তর থাকা সম্ভব। অভিমান থেকে, হিংসা থেকে, স্বার্থবুদ্ধি থেকে, মূঢ়তা বা অজ্ঞতা থেকে যে সব কর্ম্ম বেরিয়েছে, তারা দৈবী শক্তির ভাগটা বাড়ায় নি, আসুরী শক্তির ভাগটাই বাড়িয়েছে। দিন কতক বেশ স্থির হইয়া বসিয়া, গভীরভাবে "ডায়ওগ্‌নসিস্" করিয়া দেখা উচিত। একেই বলে আত্মশুদ্ধি। কর্ম্মের ক্ষেত্রে এর চাইতে বড় আবশ্যক আর কিছু নেই। আত্মার ভেতরকার উৎসগুলো যে পরিমাণে বিশুদ্ধ, কর্ম্মের মূল প্রেরণাগুলো যে পরিমাণে শুভ, কর্ম্মের ছোট বড় প্রণালীগুলো সেই পরিমাণে অমৃতধারা বইয়া আনিয়া দিবে কর্ম্মীর নিজের জীবনে, আর তার কর্ম্মক্ষেত্রের সকল স্তরে স্তরে। উৎসগুলো দূষিত হইলে, অমৃত নয়, বিষই সেগুলো থেকে বাহির হইয়া আসে। উৎসগুলো "সাফ" করার দিকে মনোযোগ নেই বলিয়া পৃথিবীর পোলিটিকাল্ ময়দানটা কৃপণরসসঞ্চারে শুধু ঊষর হইতেছে এমন নয়, দূষিত অধঃস্রোতে বিষ-গুল্মতে ভরিয়া যাইতেছে। ভারতবর্ষে কাজের ধারা ছিল অন্যরূপ। গোড়ার শোধনটার দিকে নজর বেশী দেওয়া হইত। ব্রহ্মচারী না হইয়া কেহ গৃহী, কর্ম্মী হইতে পারিত না। আজ ভারতেরও রাজনৈতিক, সমাজনৈতিক মাটিতে শুধু আগাছা নয়, বিষগুল্মও গজাইতেছে বিস্তর। অনেক দিন থেকেই। আগেও আগাছা, বিষগুল্ম টুল্ম দিল। এমন ভারত জমিন ভাল করিয়া আবাদ আমরা হাজার বছর ধরিয়া করিতে পারি নি।

পারিলে, সোণাই ফলিত। গোলামি আর কাঙ্গালামির আগাছা কুগাছায় এমন করিয়া সব ছাইয়া ফেলিত না। আজ মেয়েপুরুষে কোদাল ধরিয়াছেন। আশার কথা বৈকি! সাবেক আগাছা কুগাছাগুলো পুরাণো হইলেও হয়ত' শিকড় তত তলায় চালায় নি—দেশের বুকের পাঁজরগুলো তেমন আঁকৃড়ে জড়িয়ে ধরে নি। সাফাই হইতে দেরী হবে না। দেখিতে দেখিতে কাজ কত না এগিয়ে গিয়েছে, যাচ্ছে! কিন্তু সাবধান হওয়ারও দরকার আছে, নেই কি? পশ্চিমের হাওয়ায় নতুন নতুন ফসলের বীজ উড়িয়া আসিয়া প্রাচ্যখণ্ডে নানান্ দেশে পড়িতেছে। সঙ্গে সঙ্গে বেশ গজাইতেছেও। কি গাছ, কি ফসল ও-গুলো? পশ্চিমের নমুনা দেখে ত' মনে ভরসা হয় না! ওদেশের ঐ বড় বড় ওক্, বার্চ্চ গাছগুলো কি ফলাতে সুরু করিয়াছে আজ? এ দেশের পুরোণো বট অশ্বত্থ উপড়ে ফেলে তাই সব বসাতে চাচ্ছ? ও দেশের গাছগুলো এক একবার উপড়াবার চেষ্টা হচ্ছে ও দেশে, আর বুকের নাড়ীগুলো ছিঁড়ে সব রক্তারক্তি হ'য়ে যাচ্ছে! এই সেদিন—ঝড় নেই, বাতাস নেই—একটা মহা দাবানল জ্বলে ও দেশটা পুড়ে ছারখার হ'য়ে গেল। ছাই গাদা এখনও সরানো হয় নি—কিন্তু তার ভেতরে থেকেই আবার করাল কাম-কান্তারটা করালতর হ'য়ে গজিয়ে উঠেছে! সবাই সন্ত্রস্ত—বিশ্বমানব সন্ত্রস্ত—এই কখন আবার আগুন লেগে যায়! কুড়ুলে ক'রে কাটতে গেলে—একটার যায়গায় দশটা গজিয়ে ওঠে রক্তবীজের ঝাড়। উপ্‌ড়ুতে গেলে বুকের নাড়ী ছিঁড়ে যায়। সমস্যা বড় কঠিন।

সুব্রতর তাই মনে হ'ত—এদেশের মাটিটা রাতারাতি ক'হাত ক'রে চেঁছে ফেলে দিয়ে পশ্চিমের মাটিতে সেটাকে ভর্ত্তি ক'রে ফেলে সুবিধে হবে না। দেশে সাফাই চলুক—সাহসের সঙ্গে, ধীরতার সঙ্গেও।

জমিতে কোদাল দিয়ে নতুন সার দেওয়া হোক—পরিশ্রম ক'রে, বেশ বিচার ক'রেও। কিন্তু এদেশের মাটি জল, বাতাসের যেটা প্রকৃতি —ভিতরে ও বাহিরে—যেটাকে অস্বীকার ক'রে কিছু করতে গেলেই গোল বেধে যাবে।

আর, এদেশের প্রকৃতির আসল ধারাটা হ'ল—গোড়ার খোঁজ নেওয়া, গোড়াটাকে যতটা পারা যায় খাঁটি রাখা। আত্মস্থ না হ'লে গোড়ার খোঁজ মিলবে না, গোড়াটাকে খাঁটি ক'রে ধরা যাবে না—উপনিষদ্‌ইত' শুনিয়ে গেছেন।

দেশের কাজ কর্‌তে যেয়ে "আত্মস্থ" হওয়ার দরকার সুব্রত বুঝিয়াছিল। আর, যে আত্মা "বেঙের প্রস্রাবের" গর্ত্তটুকু নয়, সত্যপ্রত্যয়ের একটা সাগর। ভগবান্ বল, পরমাত্মা বল, আদ্যাশক্তি বল—আর যাই বল। এইটের সঙ্গে সংযোগের মুখগুলো খোলা রাখ্‌তেই হবে। নৈলে, দেশের কাজেই বল আর নিজের কাজেই বল, জীবনের যা কিছু রস, সেটা সেঁজে ভট্‌ভ'টে হ'য়ে উঠ্‌বে। নিজের ভেতরে—অভিমান আর আস্ফালন যাই বলুক না কেন—ঐ বেঙের প্রস্রাবের গর্ত্তটুকুই ক'রে রাখ্‌ব আমরা। গর্ত্তটা শোধন করার জন্যে, সেটাকে বড় করার জন্যে, শোভন ও প্রচুরভাবে ব্যবহার্য্য করার জন্যে, ঐ সাগরের সঙ্গে তার নালাটা খুলে রাখা দরকার।

জেলে আসিয়া সুব্রত এইটা বুঝিয়াছিল। জেলটাকে সে তাই হুজুগ হাঙ্গামা পাকাইবার ঠাঁই মনে ক'রে নি। সে আসিয়াছিল, আত্মস্থ হইতে। উপনিষদগুলো ভাল করিয়া পড়িবে সে। আর, কিছু কিছু ভক্তিশাস্ত্র। বাংলার বৈষ্ণব কবিদের লেখা সে নূতন করিয়া পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে।

কিন্তু—মুস্কিল ছিল তার। কাজের আবর্ত্তে পড়িয়া একটা গোপন

দরদ সে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিত। কিন্তু এখানে? উপনিষদে আলো দেখিতে পাইত, কিন্তু কি জানি কেন, সে শান্ত, শুভ্র আলোকেও তার ভেতরকার একটা নিভৃত নিরালা পুরীর বাতায়নগুলো সে অনর্গল করিতে পারিত না, বা চাহিত না। বৈষ্ণব পদাবলীতে রস সে পাইত, কিন্তু তার ভেতরে নিগূঢ় প্রীতি-রসের ঘটটি সেই অপূর্ব্ব রসঘন-কালিন্দীতে সে একেবারে ঢালিয়া দিতেও পারিত না, ভরিয়া লইতেও পারিত না! কেমন যেন আন্‌মনা অধীর হইয়া সে বুঝি কূলেই দাঁড়াইয়া রহিত—কি করিবে সে! শুধু পড়াশুনো ক'রে তার স্বস্তি হ'ত না।

একটা কিছু লিখবে সে ঠিক ক'রেছিল। লিখতে সুরুও ক'রেছিল। কবিতা নয়, গল্প নয়—ভারতের এই নবজাগরণের দিনে ভাব্‌বার কথা। সেই বিবেকানন্দও যে লিখে গেছেন—ভাব্‌বার কথা। দেশ ভেবে দেখ্‌ছে কি? ভেবে দেখ্‌বার মতন মেজাজ তার আছে কি? যাক্—লেখায় অনেকটা সময় সে দিত। কিন্তু—কিন্তু দেশের জন্যে ভাব্‌তে ব'সেও তার অন্তরের সেই গভীর কিন্তু মৃদু দরদটাকে সে ভুল্‌তে পার্‌ত না—কিছুতেই না। ভারি মুস্কিলই বটে!

অন্য রাজনৈতিক বন্দীদের সঙ্গে সে যে না মিশিত, এমন নয়। কিন্তু সেখানেও পোলিটিকাল দলাদলি, রেষারেষি, নানান্ "ক্লিক্" করিয়া পোলিটিকাল প্ল্যানিং আর ডিজাইনিং—এ সব তার ভাললাগিত না। তারাও অনেকে তাকে প্রায় দূর হইতেই "দণ্ডবৎ" করিত। বেশী ভেবে ভেবে দেশের সাবেক মাথাটা অকর্ম্মণ্যই হ'য়ে গেছে—দিনকতক ভাবনা চিন্তে ছেড়ে নির্ভাবনা হওয়াই ভাল—এই ছিল অধিকাংশের হালফ্যাসানি শাস্ত্রবিধি। ভাবনা চিন্তে ছেড়ে দেওয়ার মামলাটা কিন্তু কোনদিনই সহজ নয়। যোগীরা শুন্‌তে পাই—"উন্মনী" সাধন করতেন। ফলে, জেলের ভেতরও নানান্ রকম ফের-ফিকির মতলব-

বাজ দু'চারিটি পোলিটিকাল মাথা যে না বিচরণ করিত, এমন নয়। কাকেও হয়ত' "একঘ'রে" করার ফন্দি চল্‌ছে। কোন কোন ক্লিকের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ। "ভাওলেন্স" জিনিষটে পারার মতন সহজে হজম হয় না বোধ হয়। সভা সমিতিতে বক্তৃতা করিয়া, প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়া, অনেকে "ভাওলেন্স" প্রকাশ্যে গলাধঃকরণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু হজম হয় নাই। সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। ভাবনায় চিন্তায়, কথায় বার্ত্তায়, পরস্পরের সঙ্গে, সহকর্ম্মীদের সঙ্গে ব্যবহারেও, পারাটাকে অতি কদর্য্যভাবে ফুটিয়া উঠিতে দেখা যাইত এক এক সময়। "রাজনীতিক গুণ্ডাটি" "অহিংসনীতির পাণ্ডার" চামড়ার তলে—বেশী নীচে নয়—কখন কখন হয়ত' থাকিয়াই যান। অভিমানে, খেয়ালে, পলিসি বা প্রেস্‌টিজে আঁচড়টি লাগামাত্র তিনি ফোঁস করিয়া একট হইয়া পড়েন। এঁদের সাফাই যাই হোক্—সুব্রতর ওদিকে আকর্ষণ ছিল না।

জেলের ভেতরে "বারুদ" ছড়াইয়া রাখার আগ্রহ দু' এক ক্ষেত্রে দেখা যাইত। কর্ত্তৃপক্ষের কোন সত্য মিথ্যা ব্যবহারের একটা ফিন্‌কি পড়ার অপেক্ষায় যেন পড়িয়া আছে। তখন, দিব্যি একটা "সেন্‌সেশন্" হবে—জেলের বাইরে সকলে জেলের দিকে কাণ খাড়া করবে। দেশ তবেইত তার নেতাদের ভুল্‌তে পার্‌ল না! ভুল্‌তে দেওয়া কি যায়? ভুল্‌লে বাঁচব কি নিয়ে? কেউ কেউ—অবশ্য অনেকেই নয়—এইরকম ধারা একটা সেন্‌সেসনের "প্রিডিসপোজিসন" নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন জেলের ভেতর। শিকারী কুকুর যেমন ধারা গেমের ঘ্রাণ নিয়ে বেড়ায়; লড়াইএর ঘোড়া যেমন ধারা বারুদের গন্ধ হাওয়ায় শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। এঁদের খদ্দরে পাঞ্জাবীর আস্তিন গুটোনোই থাকৃত। কখন কি বেধে যায়! মনটা বোধ হয় শয়নে স্বপনে নিশিজাগরণে

"নারদ নারদ" জপিত। ফাইট্ ইজ্ লাইফ্—নয় কি? দেশভক্তের দুর্জ্জয় অভিমান অনেকেরই ভেতর! সুব্রত এবম্বিধ অভিমানের আওতায় নিজেকে বসিতে দাঁড়াইতে দিত না—তবে, চলার পথে, সকলকেই অন্তরের প্রীতি আর শ্রদ্ধা বিলাইতে তার কৃপণতা ছিল না।

যাক্—এ সব কথা। সুব্রত কালেভদ্রে সুপ্রিয়কে চিঠি লিখিত, জবাবও পাইত। তাতে সুচরিতাদের খবর কিছু কিছু থাকিত। তারা প্রায়ই তার নামটাম করে। সুচরিতাদের বেথুনে আর সুপ্রিয়দের প্রেসিডেন্সিতে কোন এক উপলক্ষ্যে কলেজ ষ্ট্রাইক্ নিয়ে দিন কতক পিকেটিং টিকেটিং চ'লেছিল। সে সব ব্যাপারে সুচরিতা ও সুপ্রিয় একেবারে নির্লিপ্ত বোধ করি থাকিতে পারে নি। এ সব খবর সে পাইত, যখন সে জেলে আসে নি, তখন। জেলে আসার পর আর চিঠিপত্তর পায় নি।

আর সেই শুশ্রূষাকারিণী নারী! তাদের জেলার সদর জেলে সেই একদিন দেখা হ'য়েছিল। তার পর? তার পর, যে দিন সে কলিকাতার জেলে ট্রান্সফার্ হ'য়ে আস্‌বে, তার আগের দিনও সে একবার এসেছিল। শরীরটে তার সেরেছে কিনা, দেখ্‌তে। সেদিন অনেকক্ষণ ধ'রে তাদের কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল—যার ভেতর দিয়ে বুঝ্‌তে পারা গিয়েছিল, তাদের দুজনের ভেতরের নক্‌সা দুখানা কত কাছাকাছি মিল্‌তে চ'লেছে। সুব্রতর লেখাগুলো সে সব প'ড়েছিল। তার ওপর, ঐ ভাবের আরও অনেক লেখা। এমন কি, উপনিষৎ পর্য্যন্ত। সে সব খাতেই তার চিন্তাগুলো যেন সব চাইতে স্বচ্ছন্দগতি ব'য়ে যাচ্ছিল। সে আমরণ কুমারী থেকেই দেশ সেবা করবে কিনা, সেটা অবশ্য সুব্রত তাকে জিজ্ঞাসা করে নি। কিন্তু সে যে চলার পথে শুধু নেবে পড়ে নি, খুবই এগিয়েই চল্‌ছে, তা সুব্রতর বুঝ্‌তে বাকি থাকে

নি। আর, তার চলার পথটি যে সর্ব্বতোভাবে শোভন হবে, শুভ হবে—এতেও সুব্রতর সংশয় ছিল না।

আর—আর, ব্যক্তিগত ভাবে তার ওপরেও তার,—সেই তরুণীর—বেশ একটুখানি দরদ সে বুঝ্‌তে পেরেছিল। সেটা কি ভাইএর ওপর বোনের দরদ, না তার ওপর আর কিছু? তা সে জানে না! হয়ত' তা নিয়ে নিজেকে তেমন ব্যতিব্যস্তও সে করে নি। দেশসেবক ভাইটির ওপর দেশসেবিকা বোন দরদ, মমতা দেখাবে, এ ত' খুবই স্বাভাবিক! কিন্তু তবু যেন—তাতে কি একটা ভারি মিষ্টি রকমারির হেঁয়ালি মাখানো ছিল ব'লে এক একবার সুব্রতর মনে হ'ত!

সে নিজে? তাকে বোনের মতন ক'রেই দেখেছে। 'আর, তাকে খুবই তার ভাল লেগেছে। তার পাশে পাশে যদি সে চলার পথে হাঁটবার সুযোগ পায়, তবে সে সুযোগ তার পক্ষে সব চাইতে বড় সৌভাগ্য হবে। কিন্তু ভালবাসা? সুচরিতা ছাড়া আর কাকেও ঠিক ভালবেসেছে ব'লে ত' তার মনে হয় নি।

কিন্তু যাকে ভাল বেসেছে সে, তাকে পাবার আশা তার কতটুকু? তার অন্তরের সমাচার সে ত' পাই নি! আর, ঘটনার আবর্ত্তে প'ড়ে সে তাদের চলার পথ থেকে ক্রমেই দূরে স'রে যাচ্ছে না কি? তার মত জেলখানার রাজটীকা কপালে নিয়ে ও অঞ্চলে বর যাত্রা করা আদৌ সম্ভবপর হবে কি? তখনি ত' চা'ল চলনে অনেকটা ব্যবধান ছিল। কিন্তু আজ—আজ সে ব্যবধান সে ইচ্ছে ক'রেই অনেক বড় ক'রে ফেলে নি কি?

যে সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি উপলক্ষ্য হ'য়ে তাকে শ্রীঘরে পাঠিয়েছে, সেই সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জিই কি উপলক্ষ্য হবে না তাকে চির কুমারের দেশে ডিপোর্টেশন করায়? সমরেন্দ্রর কাছ থেকে ওয়ারেণ্ট বের হবার

অপেক্ষা ক'রে ব'সে থাকবে সে ? ততদিন, মনে মনে, সেই তেপান্তরের মাঠের ওপিঠে রাজকন্যের দেশে সে বরযাত্রা ক'রেই চল্‌তে থাক্‌বে ? যতদিন এরেষ্টের পরওয়ানাটা জারি না হয় ?

তার চাইতে—বরযাত্রা ক'রে না বেরুলেই ভাল হয়। বাস্‌লামই বা ভাল ? ভাল [illegible]স্‌লেই কি বিয়ে কর্‌বার জন্যে পাগল হ'তে হয় ? সেও বিয়ে কর্‌[illegible]।—দেশের কাজ নিয়ে, দরিদ্রনারায়ণের সেবা নিয়ে, আর তার লেখাটেখা নিয়ে থাক্‌বে। তার কল্যাণপুরের রাণীমা তাকে আশীর্ব্বাদ করুন—আর ভগবান্ বোঝাটা বইবার বল তার বুকে দিন্ !

কাজের মৌতাত যদ্দিন বেশ জ'মে ছিল, ততদিন বোঝাটা একরকম ক'রে ব'য়ে নেয়া যাচ্ছিল। কিন্তু আজ কলিকাতার জেলের তেতলার সেলে ব'সে সে যে কাজের মৌতাত জমাবার উপায় খুঁজে পাচ্ছে না। বোঝাটা বওয়া শক্ত হ'য়ে উঠ্‌ছে যে ! অথচ, সেই আশাতেই ত' সে, সাধ ক'রে, কারাবরণ ক'রেছিল।

জেলে এসে ওরা তাই বুঝি "সেন্‌সেসন্" এর জন্যে হাঁফিয়ে ওঠে ! তাদেরও মৌতাত চাই। সব্বারই চাই। কেবল, রকমফের। মনের মতন মৌতাতটি না হ'লে কারুরই চলে না। কাকেও ভূতে কিলোয়, কারুর বুকে খিল ধরে !

কারুর জন্যে নিদেন "খুড়োর গঙ্গাযাত্রার" আয়োজন কর্‌তে হয় ; কারুর জন্যে বা কোনরকম একটা আধ্যাত্মিক মকরধ্বজ। সুব্রতর জন্যে কোনরূপ সিদ্ধ মকরধ্বজের ব্যবস্থা হইয়া ওঠেনি, বোধ হয়।

দিন একরকমে কাটিয়া যাইতেছে। বুকের খিলধরাটার জন্য রোজ রোজ কোন অর্জ্জুন ঘৃত আর মকরধ্বজ সেবনের ব্যবস্থা হইয়া ওঠে নাই বটে ; কিন্তু জেলখানার সেলের ভেতর বসিয়া সে এমন একটা কাজ করিয়া ফেলিল, যাতে তার গোপন-ব্যথাভরা বুকটার ওপর হইতে

একটা মৈনাকের বোঝা নামিয়া গেল, এমন সে বোধ করিতে পারিয়াছিল। ঘটনাটা এমন বেশী একটা কিছু নয়। সুব্রত কলিকাতার জেলে বদ্‌লি হইয়া আসার পর মা তার দেওয়ানজীকে সঙ্গে করিয়া তাদের থিয়েটার রোডের বাড়ীতে আসিয়া দিন কতক রহিলেন। ছটা মাস সেখানেই থাকিয়া যান, মার ইচ্ছা। কিন্তু প্রথম যেদিন তিনি গেলেন জেলে সতুর সঙ্গে দেখা করিতে, সেদিন সতু বলিল—

"মা, তুমি বাড়ী ছেড়ে এখানে এসে থাক্‌লেত' চল্‌বে না; তোমার আর আর ছেলেমেয়েদের দেখবে কে? আমিত' বেশ আছি দেখতেই পাচ্ছ। শরীরে বলটলও পেয়েছি। পড়াশুনো, লেখাটেখা নিয়ে দিন গুলো একরকম কাটাচ্ছি। কিন্তু তোমার সেই কল্যাণপুরের শত শত ছেলে মেয়ে আজ তাদের রাণীমাকে না দেখে আঁধার দেখছে যে! গ্রামে গ্রামে পল্লীমঙ্গল সমিতির ছেলেরা আজ তাদের সতুদাকে পাচ্ছে না, কিন্তু মাকে তাদের নিজেদের ভেতরেই পেতে চায় যে তারা। দিনান্তে তোমার দুয়ারে 'মা' বলে এসে না দাঁড়ালে, তারা বল পাবে, ভরসা পাবে, আশ্বাস পাবে, আশীর্ব্বাদ পাবে, কোত্থেকে? অন্নপূর্ণা হ'য়ে, সর্ব্বমঙ্গলা হ'য়ে, বিজয়া অপরাজিতা হ'য়ে, কে আজ তাদের যাত্রার যেটা সফলতা, সার্থকতা, তার দিকে তাদের নিয়ে যাবে? কল্যাণপুরের রাণীমাকেই আজ কল্যাণী হ'য়ে সকলকে হাতখানা ধ'রে কল্যাণের দিকে নিতে হবে যে! তোমার সেখানে সাক্ষাৎ প্রকট থাকা চাই মা।"

মাকে সতুর কথা মানিতে হইল। ঠিক হইল তিনি দুদিন বাদেই বাড়ী চলিয়া যাইবেন। কিন্তু শুধু মাকে তার সেবাব্রতের মহামণ্ডপে বসাইয়া সে আজ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিতেছে না। মণ্ডপের বেদীতে

আজ সত্য সত্যই দেশের যারা দরিদ্র-নারায়ণ, তাদের প্রত্যক্ষ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা না করিতে পাইলে, তার বুকের বোঝা বুঝি নামিবে না। হাঁ— সত্যই তার আজ যে প্রত্যক্ষ তেত্রিশ কোটি দেবতা! দৈন্য-দুঃখ-পীড়িত ভারতবাসী—বিশ্ব মানব!

"মা তুমিও আছ, দেওয়ানজী জেঠামশায়ও আছেন। একটা কথা কিছুদিন থেকে ভাব্‌ছি। আগেও এক একবার মনে আস্‌ত— কিন্তু বড়বাঁধের সেই বন্যের ভেতর গিয়ে প'ড়ে, অনুভূতিটে সজাগ হ'য়ে উঠেছে। সেই নিঃসহায় প্রজাদের দেখে—যারা একটা বন্যে টন্যে হ'লে, তার মুখে, তারা আর তাদের ক্ষুদ কুঁড়ো যা আছে, সব কুটোর মত ভেসে যায়! অথবা, তারাই ভেসে যায়, ক্ষুদ কুঁড়ো ক'টি তাদের তলিয়ে যায়! আমি তাদের ভূস্বামী, রাজা। আমি নিজেই বেরিয়েছিলুম তাদের সব বন্যের মুখ থেকে, দুর্ভিক্ষ মহামারীর গ্রাস থেকে, বাঁচাতে। কিছু কিছু বাঁচাতেও হয়ত' পেরেছিলুম। তারাও কৃতজ্ঞ হ'ল—ভাব্‌ল, মনিব তাদের বাপ মায়ের কাজ ক'রেছেন! কিন্তু সেই প্রকাণ্ড শ্মশানের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমার কি মনে হ'ত জান, মা? মনে হ'ত—আমি তাদের মনিব, তাদের বাপ মা হবার, সাজ্‌বার কে? তাদের পরিচারক, তাদের ভাই, আর—যদি তারা চায়ত'—তাদের প্রতিভূ হওয়া ছাড়া প্রভু হব, মালিক হব আমি কি সত্য বিধানের বলে? সত্যিই মা, তাদের যত সব দুঃখ কষ্ট, তাদের অসহায়তা, দুর্ব্বলতা একটা অন্যায়ের মৈনাক পর্ব্বত হ'য়ে যেন আমার বুকে চেপে বস্‌ত! তোমায় আর বেশী ক'রে কি বল্‌ব মা! তোমায় সতু হাঁই তুল্‌লেইত' তুমি সব বুঝতে পার! এখন, ঠিক ক'রেছি কি জান? আমার সব সম্পত্তি আমি দেবোত্তর ক'রে দেব—লক্ষ্মীনারায়ণজীউর নামে। কিন্তু অতঃপর লক্ষ্মীনারায়ণজী তোমার সেই চির-দরদের প্রত্যক্ষ দরিদ্রনারায়ণরূপে

প্রকট থাক্‌বেন। প্রজাদের টাকা তাদেরই থাক্‌বে—তাদের জন্যেই তার শেষ কপর্দ্দকটি পর্য্যন্ত ব্যয় হ্‌বে।”

সতু হাঁইটি তুলিলে তিনি সব বুঝিতেন সত্য। আজও বুঝিলেন। বুঝিয়াও তিনি কম বিস্মিত হইলেন না কিন্তু। কি যেন কি একটা বড় রকমের সাড়া তিনি নিজের ভেতরেও শুনিতে পাইলেন। তিনি সত্যই পুলকিত হইলেন। মা বটে! মুখে কিছু বলিলেন না। সতু তাঁর পায়ের ধূলা লইল। তিনি সগৌরবে, সস্নেহে মাথাটি তার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া হাত বুলাইতে লাগিলেন।

“সুব্রত, তুমি যা ঠিক কর, তা করই। ভাল ছাড়া, মন্দ কর্‌তে কখনও দেখিনি। আজও প্রতিবাদ কর্‌ব না। দেবোত্তর কর্‌বে, ভাল কথা। কিন্তু কল্যাণপুরের প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশের যারা ভাবী বংশধর, তাদের জন্যে কি উপযুক্ত ব্যবস্থা তুমি কর্‌তে চাচ্ছ, সেটা জান্‌তে চাই।”—দেওয়ানজী বলিলেন।

“ভাবী বংশধরেরা মানুষের মতন খেটে মানুষ হবে—এইটেই সব চাইতে উপযুক্ত ব্যবস্থা ব’লে আমার মনে হ’য়েছে, জেঠামশায়।”

“আর দশজনের মতন?”

“হাঁ, ঠিক আর দশজনের মতন। চলার পথে বিশেষ কিছু একটা পাথেয় তাদের জন্যে ব্যবস্থা ক’রে যেতে পার্‌ব না।”

“কল্যাণপুরের বর্ত্তমান মালিক যিনি?”

“মালিক নয়, সেবক, জেঠামশায়। সেও আপনার পায়ের ওপর দাঁড়াতে সক্ষম, আর তাই সে দাঁড়াবে। আমার জন্যেও কোনও উপসত্ত্ব নির্দ্দিষ্ট হবে না।”

“ট্রাষ্টি কাদের কর্‌বে ভাবছ?”

"মাকে ওসব বৈষয়িক ঝক্কির ভেতর টেনে না আনাই ভাল। তিনি ত' সব তাতে মাথার ওপর থাক্‌বেনই।

ট্রাষ্টি থাক্‌বেন—আপনি, বিনদা আর আমি। সম্পত্তি আপনি যেমন ম্যানেজ কর্‌ছেন, তেম্‌নিই কর্‌বেন। উপসত্ব কি ভাবে ব্যয় হবে না হবে, সেটা ঠিক ক'রে নেব আমরা পরামর্শ ক'রে। কাগজপত্তর সেই ভাবে তৈয়ের ক'রে ফেল্‌তে হবে। বিন্‌দাকে খবর দিন। সে এলে, পরামর্শ ক'রে আমাদের এটর্ণিকে দিয়ে কাগজ-পত্তর তৈরি করতে হবে। শুভস্য শীঘ্রম্। বুঝলেন, জেঠামশায় ?"

"আমি ত যেমন আছি, তেমনি রইলুম। বিনয় আর তোমার জন্যে 'অছি' হ'য়ে সব দেখাশুনো কর্‌বার একটা ন্যায্য পারিশ্রমিক ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, মনে হয়।"

"কেন উচিত ছিল, জেঠামশায় ? বিন্‌দা আর আমার কি ভাড়াটে সেবক না হ'লে চল্‌বে না ?"

এর ওপর আর কথা চলে না।

"লেখাপড়া হবার আগেই কাজটা স্বরু হ'য়ে যাক্, মা। বন্যেয় এবার ভারি কষ্ট হ'য়েছে তোমার ঐ সব ছেলে মেয়েদের। দুর্ভিক্ষ, মড়ক লেগে গেছে, শুনেছি। ব্যাঙ্কে যা টাকাকড়ি আছে, খরচ কর্‌তে লাগ, মা। কল্‌কাতার বাড়ীখানাও বেচে ফেল—লাখখানেক টাকা দাম হবে। এখন, প্রজারা নিতান্ত বিপন্ন, অক্ষম। তাদের দুঃখ কোন রকমে আমাদের দূর ক'র্ত্তেই হবে। কিন্তু আমার ইচ্ছে কি জান ?—তারা যাতে সব বিষয়ে নিজেদের পায়ের ওপর খাড়া হ'য়ে দাঁড়াতে পারে, সেই রকম শিক্ষে, সেই রকম সংস্কার, সেই রকম স্থবিধে তাদের দেওয়া। তাতে সময় লাগ্‌বে।"

"বৌমার—তোমার রাণীমার—নিজের মহালটা কি হবে?"—দেওয়ানজী জিজ্ঞাসা করিলেন। রাণীমার নিজস্ব একটা সম্পত্তিও ছিল।

"সেটা যার যা ইচ্ছে।"

মা গম্ভীরভাবে একটু কি ভাবিলেন। বলিলেন—

"সেটা আপাততঃ আমারি থাকুল, সতু।"

"কেন মা, ভয় হচ্ছে—তোমার সোহাগের সতুকে পাছে গিয়ে পথে টুক্‌নি হাতে দাঁড়াতে হয়?"— সুব্রত একটু হাসিয়া বলিল।

"আমার সতু যেখানে গিয়ে দাঁড়াক্, সে দাঁড়িয়েই থাক্‌বে—ব'সে পড়বে না, গড়িয়ে পড়বে না"—মা সগৌরবে বলিলেন। "কিন্তু আমার দরিদ্রনারায়ণের যে নতুন সেবিকাটি আস্‌বেন—আমার গরীব ছেলে-মেয়েদের নতুন রাণীমা—তাঁকে শুধু হাতে বরণ ক'রে নিতে কিছুতেই পারব না, বাবা। ঐটে থাকুল, তাঁর যৌতুক।"

দেওয়ানজী একটু হাসিলেন। সতু একটু গম্ভীর হইল।

দিন দুচ্চার বাদে আসিল বিনয়। এবার "জকি"টিও ছিলেন। সুব্রত সুষমা বৌদিকে পাইয়া ভারি খুসী হইল। বিনয় দেওয়ানজীর পত্রে মোটামুটি সব শুনিয়াছিল।

"একেবারে লেনিনের চেলা হ'তে চল্লে, সতু।"—বিনয় বলিল।

"লেনিলের নয়, বিনদা। এ দেশেরই মনু, পরাশর—এঁদের।

লেনিনের স্বপ্ন যাই হোক্, রাস্তা আলাদা। এদেশের সাবেক চলার পথ আলাদা। একেবারে—গোড়ায়—বেদেই দেখ্‌বে—কৃষকেরাই ভূমির মূল মালিক। রাজারা তাদের রক্ষা করবার জন্যে, 'রঞ্জন' করার জন্যে, যৎকিঞ্চিৎ বেতন পেতেন মাত্র। সম্পত্তি অর্জ্জনে

ব্যক্তিকে ঠেকিয়ে রাখতে চান নি এ দেশের ব্যবস্থাপকেরা। ঠেকালে বোধ হয় ব্যক্তির পূরো বিকাশটা ঠিক হয় না, ব'লে। ব্যক্তিত্বের মূলে কতকগুলো বড় বড় প্রেরণা,চেষ্টার গরজ, কাজের তাগিদ দেওয়া আছে; সেগুলোও বোধ হয় আড়ষ্ট হ'য়ে যায়,ব্যক্তিকে বেশ খানিকটে লম্বা দড়িতে বেঁধে চ'রে খেতে না দিলে। এদেশের ব্যবহারিক প্রজ্ঞান—ব্যক্তিকে, কোনও বাইরের দড়ি দিয়ে বাঁধতে তেমন চান নি। দেবত্ব—ইন্দ্রত্ব—ব্রহ্মত্ব পর্য্যন্ত রাস্তা তার র'য়েছে খোলা। কিন্তু এটা বেশ ক'রে তাঁরা ভেবে গিয়েছেন যে—অভিমান আর আত্মম্ভরিতাই হ'ল ব্যক্তিত্বের সর্ব্বনেশে নেশা, আর মারাত্মক বাঁধন। সেই নেশাতে মেতে সে অপরের ঘাঁড়ে চেপে বসে, তার টুঁটি চেপে ধরে। আর, যে দড়িতে সে অপরকে আপনার লেজুড়ে বেঁধে রাখতে চায়, সেই দড়িটাই হয় শেষকালে তার আপন গলার ফাঁসি। তাই, সমাজে ব্যক্তির চলার রাস্তাটা শেষ পর্য্যন্ত খুলে রাখাই ভাল। কিন্তু তাকে এমনভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে সে তার যথাসর্ব্বস্ব, নিজের নয়, সব্বাইকার মনে করতে পারে; আর, সব্বাইকার সেবাতে—ভগবদ্‌বুদ্ধিতে সেবাতে—নিজেকে ঢেলে দিয়েই নিজের সর্ব্বোত্তম চরিতার্থটা হ'ল ভাবতে পারে। এর জন্যে একটা সত্যিকার তাগিদ—'স্যাঙ্কসন'—তার জীবনে সজীব ক'রে রাখা চাই।

সেকালে দেখি—কোনও গৃহস্থের পক্ষে ধন উপার্জ্জনে বাধা ছিল না—কিন্তু সে ধন দিয়ে তাকে রোজ রোজ পঞ্চমহাযজ্ঞ—মানুষ আর পশুপক্ষীদেরও সেবা যাদের ভেতর—করতেই হ'ত—তিনটে ঋণ পরিশোধ করতেই হ'ত—নৈলে তার জীবন ঐহিক পারত্রিক সব দিক্ দিয়েই ব্যর্থ সে মনে করতে বাধ্য হ'ত। এই সর্ব্বভূত-হিতে রত হবার জন্যে গোড়ায় ছিল সংযমের, আর বড় একটা আদর্শ ধ্যান করবার,

যে শিক্ষা—সেই ব্রহ্মচর্য্য। বুড় বয়সে আবার বানপ্রস্থ আর সন্ন্যাস—সেখানে তপস্যা, আত্মানুসন্ধান আর পরোপকারই ছিল একমাত্র কাজ। এ ব্যবস্থাটা ভাল নয়? সমগ্র সমাজ, সমস্ত সভ্যতা সাধনা—এরই স্থাপনগুলো সজীব ক'রে রাখ্‌লেই ভাল হয় না? এদেশে সেগুলো আর সজীব নেই। সজীব ক'রে নিতে হবে। কার্লমার্ক্‌স, এঞ্জেলস্‌, লেনিন ইত্যাদির স্বপ্নটা নিশ্চয়ই বড় গোছের। কিন্তু সেটা কি ভাবে বাস্তব কর্‌তে হবে, তার উপায় খুঁজতে মস্কোর রেড্‌রিভোলিউশনের দিকে না ছুটে, গোড়ায় এদেশেরই নৈমিষারণ্য টৈমিষারণ্যগুলো একবার খুঁজে পেতে দেখা ভাল। ওসব বাতিল বকেয়া সাব্যস্ত কর্‌লে চল্‌বে না। সত্যিকার ভাল জিনিষও বাতিল হবার মতন হয়, নানা কারণে, বিনুদা।"

বক্তৃতাটুকুর পর সুব্রত বিনয় ও তার বৌদির সঙ্গে ভবিষ্যৎ কাজের ধারা নিয়ে খানিক আলোচনা করিল। গ্রামগুলোকে নতুন ক'রে গ'ড়ে তুলতে হবে—পল্লীবাসীরা সব বিষয়ে আত্মনির্ভর হ'য়ে তাদের যত কিছু প্রয়োজন নিজেরাই সমাধা ক'রে নিতে পারে—সেই শিক্ষে তাদের দিতে হবে। গ্রামে গ্রামে সমিতির এক একটা "মিশন" পাঠানো চাই—তারা গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে জঙ্গল কাটবে—খানা ডোবা ভরতি কর্‌বে, পুকুর ঝালাই কর্‌বে, রাস্তাঘাট ঠিক কর্‌বে—ছেলেমেয়েদের পাঠশালা কর্‌বে—গ্রামে "ধর্ম্মগোলা" বসাবে, হরিসভা, মেলা মচ্ছব প্রভৃতি স্থাপন কর্‌বে, সেই সাবেক পঞ্চায়তের প্রতিষ্ঠা কর্‌বে। শিক্ষা, কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, আমোদ প্রমোদ, স্বায়ত্ত শাসন—এ সবই তাদের কাজ হবে। শুধু নিজেরাই কাজ করলেত' হবে না, গ্রামবাসীদেরও কাজে টেনে নিতে হবে। পল্লীকে চাম্‌চে দিয়ে খাইয়ে দিলেই হবে না। যদ্দিন ধাত্‌ ছাড়ার মতন, তদ্দিন দাও। তারপর, তাকে আপন

হাতে খেতে পর্‌তে শিখ্‌তে হবে। এককথায় পল্লীচেতনা, পল্লী-আত্মাকে সকল দিক্ দিয়ে ফুটিয়ে তুল্‌তে হবে।

সুব্রতর বুকের বোঝাটা অবশ্য পাতলা হইয়া গেল। কিন্তু সেই গোপন দরদটা?

সন্ধ্যার পর বিনয় গেল এটর্ণির বাড়ী। সুষমা একলাই জেলে দেখা করিতে আসিল।

"সত্যি বৌদি, তুমিও কাজে নেবে গেছ শুনে যে কি আহ্লাদই হ'য়েছিল!"

"সবই তোমারি মাহাত্ম্য, ঠাকুরপো। তুমি যে হোমের আগুন জ্বেলেছ, তার দুটো একটা ফিন্‌কি ওদিকেও গিয়ে পড়্‌বে না?" একটু হাসিয়া পরে আবার বলিল—"সেই মাণিকপুরে তোমার হার্ট্‌টা ডিরেল হ'য়ে গেছে কিন্তু ঠাকুরপো।"

"তাতে গাড়ী ক্যাপসাইজ হ'য়ে প'ড়ে নিত' বৌদি।"

"পড়েনি, কিন্তু শক্‌টা বেজায় হ'য়েছিল—গাড়ীর ভেতর সব ওলট্‌ পালট্‌ হ'য়ে গিছলোত'।"

সুব্রত এবার কিছু বলিল না, একটা ব্যথিত দৃষ্টি মেলে বৌদির মুখের পানে চাহিল। খানিক পরে বলিল—"তোমার এক্‌স্‌রে সাইট্‌ হ'য়েছে, বৌদি!"

"ক্লেয়ার্‌ভয়ান্স যাকে বলে?"

"হাঁ, তাই।"

"সত্যি সত্যি মিলে গেছে ত', ঠাকুরপো? ভালবেসে ফেলেছ,তুমি।"

সুব্রত মুখখানা নীচু করিয়া রহিল।

"তোমার কাছে কি লুকোব, বৌদি—বোধ হয়, তাই।"—ধীরে ধীরে বলিল।

"বোধ হয় ?"

"দেখ দেখি, তোমার ক্লেয়ারভয়্যান্স কি বলে ?"

"বোধ হয় টোধ হয় নেই, ভাই। আমার গৌরী বোনটি দেখছি নিজেই তাঁর পূজোর সাজিটি সাজিয়ে নিয়ে এদিকে এসে প'ড়েছেন।"

"ভুল ক'রে এদিকে একবার এসেছিলেন বোধ হয়। অন্য পথে চ'লে গেছেন। পূজোটা তাঁর বোধ হয় করতে হবে আর কোথাও।"

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর থেকে তার গুমরিয়া উঠিল।

দশম

আরও কিছুদিন কাটিয়া গেছে। তখনও জেলে। তার প্রকাণ্ড বিষয় আশয়ের একটা সদ্‌গতি করিতে পাইয়া সে সত্য সত্যই স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়াছিল। সুষমা বৌদির "এক্‌স্‌রে সাইটে" তার বুকের গোপন ব্যথাটা ধরা পড়াতেও তার মোটের ওপর মন্দ ঠেকে নাই। ব্যথা সমব্যথী দুইটা হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িলে গাঢ়তাটা তার কমে বৈ কি! গোপন ব্যথাও একান্ত গোপনে গুম্‌রে মরে। তার ভাগাভাগি হয় না। কিন্তু দরদী কাণে কাণাকাণি করিতে পাইলেও, তার অন্তর গুম্‌রানিটা বোধ হয় খানিকটা কমিয়া যায়! ভাদ্দরের দুপুরের গুমোটে দখিণের জানলাটা খুলে একটখানি ঝির্‌ঝিরে বাতাস বুকে লাগলো যেন!

জেলের জীবনটা তার ঠিক রুটিনবন্দীভাবে কাটিতে পারিল না। সে অবশ্য দিন দিন নিজের সেল্‌টাকে, আর, যখন কেউ থাকিত না তখন, ছাদটাকেও বেশী ভালবাসিয়া ফেলিতেছিল। মেলামেশা খুব কমিয়ে দিয়েছিল। একটখানি সহৃদয়তামাখা হাসি, আর একটা আন্তরিক অভিবাদনেই, তার আর আর রাজবন্দীদের সঙ্গে সৌজন্যরক্ষা এবং আলাপ পর্য্যাপ্ত হইত। জেলের জীবনের যে সব অধঃস্রোত, সে-গুলোর সমাচার সে বড় একটা রাখিত না।

একদিন সেলটিতে তার বসিয়া আছে সে! জানলাটা খোলা। সন্ধ্যার আর বড় দেরি নাই। হঠাৎ একটা গোলমাল শোনা গেল— আর সঙ্গে সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া এক ঘণ্টার শব্দ। একেই কি বলে পাগ্‌লা ঘন্টি? ব্যাপারখানা কি?

জানলার গরাদে মুখ দিয়া বাহিরে চাহিয়া দেখিল, খানিক দূরে সাধারণ কতকগুলো কয়েদীদের সঙ্গে ওয়ার্ডারদের এক খণ্ডযুদ্ধ বাধিয়া গেছে। রাজনৈতিক অতিথিবর্গ তখন সন্ধ্যার "এক্‌সারসাইজ" শেষ করিয়া জটলা করিয়া নিজ নিজ "কুলায়ে" ফিরিতে ছিলেন। তাঁরাও দেখা গেল অকুস্থলের দিকে দৌড়িলেন! সুব্রতও ধীরে ধীরে বাহির হইল।

তখন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট, জেলর, সার্জেণ্ট, সশস্ত্র পুলিশ "রণক্ষেত্রে" উপনীত হইয়াছেন। সাধারণ কয়েদীরা তখনও ভঙ্গ দেয় নি।

কোন রাজনীতিক মিশনারী তলায় তলায় যে তাদের প্ররোচিত করিয়াছিল, তার প্রমাণভাব। আর দরকারই বা কি তার? দেশের হাওয়াটাই দিন দিন হচ্ছিল এমন যে, জোরে একটা নিঃশ্বেস টান্‌লে দশ বোতল মদ পেটে সেঁদিয়ে যায়!

নীতি বা ধর্ম্মের বা সমাজের আইন হয়ত' কোন দিনই তারা মানে নি। সেগুলো তবু বিদেশীর আইন নয়।

যাক্—দেখা গেল, কয়েদীরা "মহাত্মাজীকি জয়" "দেশবন্ধুজীকি জয়" ইত্যাদি জয়ধ্বনিতে আকাশ ফাটাইতে ছিল।

সাধারণ কয়েদীদের এই বিদ্রোহটার পেছনে কোন রকম একটা রাজনৈতিক ইসারা আস্‌কারা ছিল কিনা, জানা নেই। তবে তাদের "গান্ধীজীকি জয়" ইত্যাদি "ওয়ার্ ক্রাই" শুনিয়া রাজনৈতিক দলের জন কতক "ছোক্‌রার" নিউট্রাল্ থাকা বোধ হয় অসম্ভব হইল। তাঁরাও ঘটনাস্থলে যাইয়া সে নিনাদে যোগ দিলেন। সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট দু' একবার ওয়ার্‌নিং দিলেন—কয়েদীদের আত্মসমর্পণ করিতে, আর রাজনৈতিকদের স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে। ওয়ার্‌নিংএ সকলে কাণ দেয় নি। তখন, অবশ্য অন্য ব্যবস্থা হইল। তাতে ফলও ধরিল।

কিন্তু ও কি?—রাজনৈতিক দলের একটি ছোক্‌রাও আঘাত পাইয়াছে বুঝি! বিচিত্র নয় সে গোলমালে। সুপারিন্‌টেনডেণ্ট তাঁদের সব্বাইকে আপন আপন সেলে ফিরিতে অনুরোধ করিলেন।

একি! ছোক্‌রাটি কে? সুপ্রিয় যে!

সুব্রত তাকে দুটি বাহু দিয়া জড়াইয়া লইয়া চলিল। তার আপন কক্ষেই।

আগের দিন রাত্রির চালানে সে এসেছে। সুব্রতর চোখে সেদিন সে পড়েনি। আর, সেও ঠিক জান্‌ত না যে, সুব্রতদা সেই জেলেই আছেন।

কলেজের পিকিটিং ব্যাপারে সে ধৃত হইয়াছে। তিন মাস জেল।

ভাল ব্যাপার বটে! একটা জখম টখম না হ'লে বুঝি তাদের চলার পথে দেখা শোনা হবার যোটি নেই। সেই মাণিকপুরে মৃত্যুঞ্জয় বাবুর আকস্মিক আঘাতের ফলে তাদের সব্বাইকার সাথে মিলন। নিজে আহত হ'য়ে দেশে হাঁসপাতালে থাকার সময় সেই শুশ্রূষাকারিণী (কথাটাকে "নার্স" তরজমা সুব্রত কোন দিন ক'রে নেয়নি, আমরাও করব না) তরুণীর সঙ্গে দেখা। আর, আজ এই গোলমালে আহত সুপ্রিয়র সঙ্গে কলিকাতার জেলে দেখা। তার চলার পথে এমনি ক'রে রক্তলেখা দিয়েই এক একটা নতুন মোড় ফেরার সঙ্কেতগুলো চিহ্নিত হ'তে থাক্‌বে নাকি!

সুপ্রিয় সুচরিতার ভাই। তাকে কাছে পেয়ে সুব্রতর বেশ খানিকটে স্বস্তি বোধ হ'ল। একই রক্ত ব'য়ে যাচ্ছে যে সুপ্রিয় সুচরিতার ভেতর!

অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল তাদের। মৃত্যুঞ্জয় বাবু সারিয়াছেন; কিন্তু একে

সেই ইন্‌সোম্‌নিয়া, তারপর আবার সেই আঘাত। ফলে তাঁর মাথাটা যেন কেমন দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। জীবনের কোন কাজের ওপর দৃঢ় মুষ্টি আর যেন তাঁর নেই! মায়ের শরীরটাও অপটু। সুচরিতা আই, এস্‌, সি পরীক্ষায় বসে নি। তারা পরীক্ষা ষ্ট্রাইক্ করিয়াছিল। শুধু তাই নয়—ষ্ট্রাইকে্‌র এক ব্যাপারে একদিন সে এরেষ্টও হইয়াছিল। কিন্তু কি জানি কেন, ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে তাদের প্রিজন্‌ভ্যানের খাঁচাটি খুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। লক্ আপের "তীর্থে" তেরাত্রি নয়, মোটে একটি রাত্রি তাদের বাস করিতে হইয়াছিল। মুড়ি মুড়কি চিবাইয়া, আর অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা ছড়াইয়া। সে দক্ষিণ কলিকাতা অঞ্চলে দিন কতক স্বদেশী কাজও করিয়াছিল। তারপর, এক জাতীয় রাখীবন্ধন সভায় সে একদিন গিয়াছিল। পুলিশ সে অনুষ্ঠানে বাধা দেয় নি। কিন্তু পর্জ্জন্যদেব কঠোর পরীক্ষা নিয়েছিলেন। জল ঝড় শিলাবৃষ্টি! ভারতের নিখিল জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়ের সৌহার্দ্দ ও মিলনের একটা সুন্দর প্রতীক চিত্র শিল্পী এঁকে দিয়েছিল। একটা গান গেয়ে সেই প্রতীক আলেখ্যখানা উন্মোচন করার ভার ছিল সুচরিতার ওপর। সে আলেখ্যখানার নিম্নে দাঁড়িয়ে সবে গানটি তার সুরু ক'রেছে—এমন সময় লেগে গেল অন্তরীক্ষচারী দেবতাদের পুষ্পলাজ বৃষ্টি! পুষ্পলাজ বৃষ্টি ব'লে বৃষ্টি! খোদ হিমালয়ের ধ্যান ভেঙ্গেছে বুঝি! তাঁর শুভ্র বিপুল জটারাশি ঝেড়ে উঠে প'ড়েছেন না কি! তাঁর জটাজূটের ভেতর এত সাদা ধব্‌ধবে শালগ্রাম বাসা বেঁধে ছিলেন!

সভাটা নেহাৎ মানকরের কদ্‌মা ছিল না, দু'ফোঁটা প'ড়েছে কি না প'ড়েছে, গ'লে গেল না। জন কতক সেবক এসে সুচরিতার মাথার ওপর ছাতা ধরতে গেল। সে তা সরিয়ে দিলে। শাশ্বত আকাশের

তলেই তারা যে আজ দাঁড়াইয়াছে। কোন কৃত্রিম, ভঙ্গুর ব্যবধান আজ তারা সহ্য করবে না!

একটা শুভ্র শালগ্রাম শিলা এসে তার মাথার সিঁতিতে পড়ল বুঝি! শাশ্বত আকাশের শুভ্র আশীর্ব্বাদ! সঙ্গে সঙ্গে রক্ত গড়িয়ে পড়ল। হাতটা তার রক্ত লাঞ্ছিত হয় নি—এ অহিংস পুণ্য যজ্ঞে হোতা হোত্রীদের হস্ত রক্তলাঞ্ছিত হ'তে দেয়া হবে না! সেই জাতীয় মিলন-আলেখ্যখানার মূলে ফোঁটা কতক রক্ত পড়িল। অর্ঘ্য বটে!

মুহুর্মুহু "বন্দে মাতরম্" হইল। সেদিনকার দৃশ্য ক্যামেরা ম্যান্ হয়ত' কোন ফাঁকে তুলিয়া লইয়া থাকিবে।

উৎসব স্ত' সমাধা হইয়া গেল। সুচরিতা আহত হইয়া, জলে ভিজিয়া জাব হইয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিল। সেই রাতেই অসুখে পড়িল। ভুগিলও দিন কতক। তার পর, দুর্ব্বল শরীরে সে জব্বলপুর চলিয়া গেছে—পিতা মাতার কাছে। তাঁরা যাবার জন্যে "টেলি" করিয়াছিলেন।

ভালরে ভাল! এখানেও রক্ত লেখা! তার সুচরিতাকেও রক্ত লেখা এঁকে যেতে হচ্ছে চলার পথে! বলা বাহুল্য, সুপ্রিয় যে ক'টা দিনের ইতিহাস তাকে শোনাইল, যে ক'টা দিন, তার জীবনের গোপন ডাইরিতে রক্ত রেখা দিয়ে লেখা হ'লেও, চিরদিন জ্বল্ জ্বল্ করবে! নটরাজ নাচ্‌তে বাকি রাখ্‌লেন না আর কোথাও! তাঁর নাচের আসরে বুকের রক্ত দিয়েই কি এলুন দিয়ে রাখ্‌তে হয়? নৈলে, তাঁর চরণে রত্নমঞ্জীর বুঝি বাজে না!

এই আজকের রাখী বন্ধন উৎসবের রক্ত রেখা টুকুই কি তাদের দুজনের ভেতর রাঙা রাখী বেঁধে দেবে? কে জানে।

সুপ্রিয় পরশু এরেষ্ট হবার আগে তার এক চিঠি পেয়েছিল। শরীর

তার সেরে উঠ্ছে। তবে, বাবাকে তার ছেড়ে আস্‌বার যো নেই! বাবা কেমন যেন অসহায় শিশুটির মতন হ'য়ে প'ড়েছেন। সকল কাজের ভেতর সুচরিতাকে না হলে তাঁর চ'লে না। সুচরিতাও—বাবাকে আর মাকে সদা-সর্ব্বদা সেবা আর সোহাগ দিয়ে ঘিরে রাখ্‌বার যে একটা দরদ, যে একটা আনন্দ, তাতেই নিজেকে উৎসর্গ ক'রে বিলিয়ে দিয়েছে। আর তার পলিটিক্‌স টলিটিক্‌স নেই।

না থাকুক্—তাতে তার নারীত্বের মর্য্যাদা বাড়্‌বে বই কম্‌বে না—সুব্রত মনে মনে রায় দিল।

জেলের আবহাওয়াটা কেমন যেন "তড়িৎভরা" হইয়া উঠিয়াছে সেই হাঙ্গামের পর হইতে। ছোক্‌রাদের কারুর কারুর ঔদ্ধত্য দিন দিন কর্ত্তৃপক্ষকে একটু বেশী বেশী খোঁচা দিতে আরম্ভ করিয়াছে। কর্ত্তৃপক্ষ বরাবর সৌজন্য দেখাইতে আগ্রহযুক্তই ছিলেন। কিন্তু সেই ঘটনার পর হইতে, তাঁরাও দিন দিন "শক্ত" হইতে লাগিলেন হয়ত'। কন্‌ডেনসারের একটা চাকতিতে এক রকম তড়িৎ যত বোঝাই হবে, অন্য চাকতিটাতেও বিপরীত তড়িৎ ততই বোঝাই হ'য়ে চল্‌বে। নিয়মই এই। ভাওলেন্সের ভাবই হোক, আর নন্‌ভাওলেন্সের ভাবই হোক। একদিকে ভাওলেন্সের ভাবটা যত বাড়াব, অন্যদিকে, ননভাওলেন্স নয়, কাউণ্টার ভাওলেন্সের, ভাবটাও তত বেড়ে চলবে।

কর্ত্তৃপক্ষ হয়ত' সন্দেহ করিয়াছিলেন—সাধারণ কয়েদীদের হাঙ্গামার তলে তলে পোলিটিকালদের কারুর কারুর "ওস্‌কানি" ছিল। তাঁরা ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধানও করিতেছিলেন। খবরের কাগজের লেখা লেখি, কাউন্সিলে তর্কাতর্কিও, তাঁদের চুপ করিয়া থাকিতে দিতেছিল না। ওপরওয়ালাদের সঙ্গে তাঁদের লেখালেখিও চলিতেছিল। এক

দিন দেখা গেল, এক উচ্চপদস্থ রাজপুরুষ সরজমিনে তদন্ত করিয়া গেলেন। পোলিটিকালদের সঙ্গেও দু'চার কথা কহিয়া গেলেন। সুব্রতর সেলে একবার তাঁরা আসিলেন। সুব্রত অবশ্য ঐ সব "ওস্কানি" থিওরিতে বিশ্বাস করে না। তবে, সে বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না, কাজেই, কোন কিছু জোর করিয়া বলা তার পক্ষে সম্ভব নয়।

"আপনি কি একট খোঁজ নেবেন, ডকটর ব্যানার্জ্জি"—রাজপুরুষ বলিলেন।

"মাপ করবেন"—সুব্রত উত্তরটা শেষ করল না।

"আপনি কি সিচুয়েশন্‌টা আনফরচুনেট্ মনে করেন না ?"

"শুধু আন্‌ফরচুনেট্‌কেন, আশঙ্কাপ্রদ। আমরা এখানে হয়ত' একটা মাইনের ওপর সব দাঁড়িয়ে আছি।"

"কি ক'রে সিচুয়েশন্‌টা 'ইজ' করা যায়, সেপক্ষে আমাদের সঙ্গে কো-অপারেট কর্‌বেন না আপনি ?"

"নিশ্চয়ই, সসম্মানে যতটা কর্‌তে পারা যায়।"

"আপনার ফেলো প্রিজ নার্‌দের একটুখানি ওয়ার্ণ করে দেবেন না—তাঁরা আগুন নিয়ে খেলা কর্‌ছেন।"

"শুধু তাঁদের কেন, জেলের কর্ত্তৃপক্ষেকেও ওয়ার্ণ ক'রে দেওয়া উচিত মনে হয়—তাঁরা আগুনে বাতাস দিয়ে না ফেলেন। সহসা কোন ড্রাস্‌টিক্ মেজার্ নিতে গিয়ে ফ্যাসাদ ডেকে আনা ঠিক হবে না !"

"থ্যাঙ্ক্‌স্ !"—রাজপুরুষ ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন না। সহজ সুরেই বলিলেন—"জেলের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের ঘাড়ের ওপর মাথাটা হারান নি, হারাবেনও না। তবে, অনবরত যদি একটা ফ্লাউটিং অফ অথরিটি চলে, তবে কর্ত্তৃপক্ষ তাঁদের দায়িত্বে অবশ্য ইস্তফা দেবেন না।"

সুব্রত আর কিছু বল্‌ল না।

"আচ্ছা।"—বলিয়া করমর্দ্দন করিয়া রাজপুরুষ বাইরে গেলেন। তার ব্যক্তিগত কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, সে খোঁজটাও তাঁরা নিতে ভোলেন নি। অসুবিধে তার কিছু ছিল না।

একদিন সমস্তদিন ধরিয়া খুব বর্ষা হয়ে গেল। সুব্রত জানালাটার ধারে তার খাতা খুলে ব'সেছিল। কিন্তু লেখা বড় একটা এগুচ্ছিল না। ঘোলাটে আকাশ, আর অবিশ্রান্ত রিনি ঝিনি বর্ষার ধারা, আর থেকে থেকে জ'লো দমকা বাতাস—তাকে আনমনা ক'রে দিচ্ছিল! সেদিনটা একটিবারও রোদ্দুর ওঠে নি। লেখার খাতা থুয়ে একখানা "পদাবলী" সে লইয়া পড়িতে বসিল। "মাহ ভাদর, ঘোর বাদর, শূন্য মন্দির মোর!"—সত্যিইত! চোখদুটো তার আকাশের মতই ঘোলাটে হ'য়ে গেছে; অনেকক্ষণ আর পড়া টড়া হ'ল না; পদাবলী কোলের ওপর প'ড়েই থাক্‌ল। "আমারি বঁধুয়া আন্ ঘরে যায়, আমারি আঙ্গিনা দিয়া!"—হাঁ—তারি তরুণ জীবনের আঙ্গিনাখান কার যেন চরণ-নূপুরের মধুস্পর্শে একদিন শিহরিত হ'য়ে উঠেছিল যে! একটিবার—মাত্র একটিবার—মুখখানি তার তুলেও ছিল সে! কিন্তু, দাঁড়ায় নি ত'! চ'লে গেল! আন্ বাড়ী, আন ঘর? কে জানে!

পদাবলী সে উঠাইয়া রাখিল।

সন্ধ্যের কিছু আগে বর্ষা ধ'রে গেছে। আকাশের গায় কালো কালো মেঘ তখন অবসন্ন হ'য়ে পড়ে আছে। সাঁঝের দেউটির রক্তরাগটুকুও যে ফুটে বেরুবে, তার ফাঁকটুকু নেই। ছাদের ওপর সুপ্রিয় আর সে বেড়াচ্ছিল। সুপ্রিয়র সঙ্গে খানিক হাসি তামাসা ক'রে তার সমস্ত দিনকার বিষাদ-ঘোর সে বুঝি পাতলা ক'রে নিচ্ছিল।

"অই মোটা গালপাট্টাওয়ালা লোকটি কে হে? রোজই সকাল সন্ধ্যে দেখি ঐ ছোট্ট লোটাটা নিয়ে মাঠটুকু পেরিয়ে যায়!"

"পোলিটিকাল আর ইউরোপীয়ান্ ওয়ার্ডের ষ্টোর কিপর্। খোট্টা আদ্‌মী। কশ্চিৎ চোবে তেওয়ারী।"

"ষ্টোরটা কাঙ্গারুর মতন পেটে ক'রেই নিয়ে বেড়ান উনি? ভুঁড়ি বটে! হাত খানা একেবারে ষাট্ সত্তর ডিগ্রী সটান ক'রে নেয়ে তেল দিতে হয়, প্রভুর! ব্রহ্মার মন্দাগ্নি বুঝি? সকাল সন্ধ্যে বক্‌রি হুধের টাট্‌কা পাঁচন সেবন করেন না কি? সেই জন্যে লোটা হস্তে পরিক্রমা!"

"তা নয়, সুব্রতদা। ও যাচ্ছে 'প্রভিকাউন্সিলে'। ভারি জবর মোশন্।"

"ঐ লোটাটি মাত্র সম্বল, কম্বলও একখানা নেইত'! মহাত্মাও শুনেছি খানকতক কম্বল নেবেন রাউণ্ডটেবিলে যাবার সময়।"

"ঐ লোটা একাই একশ'। লোটার বার্ত্তা একদিন জব্বলপুরে নিয়েছিলুম। পাহাড় অঞ্চলে এক নৈমিষারণ্যে পূজারীবেশী এক সূত-কথকের শ্রীমুখে। বরুণদেব সে অঞ্চলটা কি কারণে বয়কট্ ক'রে রেখে-ছেন। জল অগ্নিমূল্য! পূজারী মিশির ঠাকুর ঐ রকমের এক লোটা হস্তে নিসর্গ ভ্রমণ সেরে আস্‌তেন। আমরা একদিন দেখেত' অবাক্। কোন্ এক অপূর্ব্ব সিদ্ধি-প্রসাদাৎ সে লোটাটা বোধ হয় সর্ব্বকর্ম্ম-সমাধা-কারিণী বর পেয়েছে। মিহির মহারাজ আমাদের নির্ব্বাক বিস্ময় দেখে বল্‌লেন—বাবুজী, ইসি লোটাসে সব কাম হো চুক্‌তা হ্যায়। পানি ভি পিতে হেঁ, ডাল্‌ভি পাকাতে হেঁ, ভাঙ্‌ভি বানাতে হেঁ, টাট্টিভি যাতে হেঁ, শিউকা শিরপর পানিভি চড়াতে হেঁ। শুনে আমরা বল্লুম—হে সর্ব্বকামপ্রদে লোটে, নমস্কার।" দু'জনেই খুব এক চোট্ হাসিল। মনটা অনেক হালকা হইয়া গেল। সমস্তদিন মেঘলার পর সুব্রতর মনে এই একটুখানি ঝিকিমিকি রোদ্দর আমা-দের ত' মন্দ লাগ্‌ল না।

সুপ্রিয় নীচে নামিয়া গেছে। সুব্রত তখনও ছাদে পায়চারি করিতে-ছিল। ঐ যে দূরে পাঁচীরের ওপিটে ব্লকটা, ওটা কাদের? মেয়েদের বুঝি? কোন দিন খোঁজ নেয়নি। আন্দাজ করিল। ভারি একটা মিষ্টি বাঁশীর আওয়াজ হাওয়ায় ভেসে এল কোথেকে? ঐ মেয়ে ব্লক-টার দিক থেকেইত' মনে হচ্ছে! মলিন সন্ধ্যায় স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখা যাচ্ছিল না, আর, সেলের মধ্যে অনবরত থেকে থেকে, সুব্রতর হয়ত' সামান্য একটুখানি সর্ট সাইট হবার মতন হ'য়েও থাক্‌বে। ঐ ব্লকটার ছাদের পরে কে একটি মেয়ে একলাই ব'সে র'য়েছে না? নীল এক-খানা শাড়ী তার পরণে। চেহারা গড়ন টড়ন কিছু দেখা যাচ্ছিল না। না যাক্—বাঁশীর সুরটা কিন্তু তার ভারি মিষ্টি, ভারি উদাস, ভারি করুণ!

গানের সুরটা তার চেনা চেনা, কবে শুনছে সে? পদটদগুলোত' কৈ মনে পড়ছে না। অথচ, একটা অচেনা চেনার, অথবা চেনা অচে-নার অস্বস্তিতে তাকে অধীর করিয়া তুলিল। সে চুপটি করিয়া সেদিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। দূর বাঁশীর আওয়াজে বনের হরিণ বুঝি এম্‌নি ক'রে থম্‌কে দাঁড়ায়! আবার তার চলার পথে ভাগ্যশিকারী নূতন একটা গোপন ফাঁদ পাতিয়া রাখে নাইত'? সত্যিই—কেমন যেন একটা অবুঝ আকর্ষণ সে অনুভব করিতেছিল।

এক-দুই-তিন! একবার সেই কাট্‌নি থেকে আস্‌তে বোম্বে মেলে। আর একবার সেই দেশের হস্‌পিটালে। আরও একবার এই জেলের ছাদে! হে নিপুণ শিকারী! ফাঁদ পাতায় তোমার অশেষ, অপূর্ব্ব, আশ্চর্য্য রকমারি! কিন্তু—কিন্তু সেই একবারেইত' শিকারটি তোমার গেঁথেছ; তবে, দুবার, তিনবার, বার বার এ কেমন ধারা তোমার শিকার বেচারীকে খেলিয়ে নিয়ে বেড়ান'! গেঁথে একবারেই খাঁচায় তুল্‌লে তোমার খেলার আমোদ জমে না বুঝি!

মেয়ে জেলের ছাদে সন্ধ্যার সময় নীল-কাপড়পরা একটি মেয়ে দেখ্‌ল, আর আমাদের সতু অমনি যাদু হ'য়ে গেল—এমন মনে করার অবশ্য কারণ নেই। বাশীর সুরে বুঝি কি একটা অজানা মিনতি ছিল, হাতে ধ'রে সাধা ছিল—'ওগো দাঁড়াও, যেও না" ব'লে। বাঁশীর সুরত' হাওয়ায় আবার মিলিয়ে গেল। প্রতিধ্বনি—অনুরণনটা—তার তখনও কিন্তু সুব্রতর মনের কোণে কোণে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, কেউ তাকে কি চিন্‌তে পেরেছে, ধর্‌তে পেরেছে—তাই যেন যাচাই ক'রে ক'রে! না, ধর্‌তে কেউত' পারে নি তাকে !

তার পরদিন সুব্রত আবার ছাদে গেল। সেই এক অবুঝ আকর্ষণে। একলাই গেল। সেদিন বাঁশী আর বাজে নি। নীল কাপড়-পরা মেয়েটি কিন্তু দাঁড়িয়েছিল—ছাদের চিলের ঘরের দু'য়োরটি ধ'রে। এদিকেই তাকিয়ে। কি দেখ্‌ছিল সে? পূব আকাশে একখানা মেঘ জ'লো বাতাসে তার কাজল পা'লটা ফুলিয়ে এদিকেই ছুটে আস্‌ছিল। ঐ দূরে দেওদার ঝাউএর বাগানে তার বাদলতরী বুঝি ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝরণার সহস্র ধার ব'য়ে নিয়ে এসেছে ছড়িয়ে দিতে! সুব্রতর গায়েও দু'চার ফোঁটা পড়িল। সে নামিয়া গেল। দাঁড়াইল গিয়া তার জানলার গরাদে ধরিয়া। সেত' তখনও সরে নি। বাদলের ঝর্‌ণাধারায় সে তার সাঁঝের স্নানটা সেরে নেবে বুঝি ?

দুদিন যায়—চারদিন যায়—দশদিন যায়। রোজই সন্ধ্যায় তাকে ছাদে দেখা যায়। বাঁশীটি তার আর বাজে নাই। পূর্ব্বরাগ নয়, শুধু নিরামিষ কৌতূহলটুকুও নয়—কি একটা অব্যক্ত মিষ্টি আকর্ষণে সুব্রতও রোজ রোজ সে সময় ছাদে যেত। একলাটি যাবার সুযোগ খুঁজ্‌ত। যাবার জন্যে মনটা তার উস্‌খুস্ কর্‌ত।

এটা তার কাছে একটা নতুন রহস্য। চপল সে, ছেব্‌লা সে কোন দিনই নয়। মেয়ে ওয়ার্ডের ছাদে মেয়ে উঠ্‌বে, বেড়াবে, তাতে আশ্চর্য্য কিচ্ছু নেই। আর, বেড়ালেই তার মন ঘুঁড়িখানা অম্‌নি গোপ্তা খেয়ে তার পায়ে গিয়ে লুটিয়ে পড়্‌বে,এতদূর আস্‌মানে অসামাল সেটা নিশ্চয়ই হ'য়ে ছিল না। তবু নিত্যি নিত্যি আগ্রহ নিয়ে সে ছাদে আস্‌ত, আর একটা উৎকণ্ঠার সঙ্গেই ওদিক্‌ পানে সে তাকিয়ে থাক্‌ত। সে নিজেকে বারবার প্রশ্ন ক'রে ছিল—কাণ্ডকারখানাটা কিহে, বাপু? নূতন ক'রে "লভে" পড়া, অথবা তার নূতন সম্ভাবনা হওয়া, মোটেই নয়। সে পক্ষে তার সংশয় ছিল না।

তবে?—বোধ হয় সেই প্রথম দিনের বাঁশীটার স্বরের ভেতর দিয়ে একটা কি গোপন বন্দোবস্ত হ'য়ে গিয়েছিল—রোজ রোজ সন্ধ্যার আগে তাকে ছাদে হাজির কর্‌বার। সে স্বরটা সে ধর্‌তে পারে নি, কিন্তু স্বরটা বুঝি তাকে ধ'রেছে! নতুন একটা নেশা এটাকে ভাব্‌লে কিন্তু ভুল হবে।

দিন যাচ্ছে। একদিন একখানা চিঠি এল—অবশ্য "সেনসর্‌ড"। শিরোনামার লেখাটা বেশ; কিন্তু জানা নয় ত'। পোষ্ট মার্ক—বোঝা গেল না। কাজেই, কোত্থেকে আস্‌ছে বোঝা গেল না। খুলে দেখ্‌ল। তার চিঠি—সেই শুশ্রূষাকারিণীর। সেই প্রথম। খুব সংক্ষিপ্ত। তার শরীরটে ভাল ক'রে সেরেছে কি না, জান্‌তে চেয়েছে। কোথা আছে সে, যে তাকে জানাবে? তার জেলার সেবাকেন্দ্রগুলোতে কাজ বেশ ভালই চল্‌ছে। বিনয়বাবু ভারি সুন্দর সব ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছেন। বিনয়কে চেনে সে? বিনয়ের ব্যবস্থার কতকটা আভাষও সে চিঠিতে দিয়েছে—তা' দেখে সুব্রতর খুব আহ্লাদ হ'ল। বিনয়ের মাথা থেকে যা' বেরুবে, তাত' নিখুত হবেই। আর, শেষকালে, সুচরিতার

কথা।—সুচরিতাকে সে তবে জানে?—সুচরিতা অসুখ ক'রে জব্বলপুর গিয়েছিল, সেরে উঠেছে। সুচরিতার কোন কথা ত' কৈ তার সঙ্গে কোনদিন হয় নি। সে তবে সুচরিতার খবর তাকে দিতে এল কেন? তার নিজের খবর কিছু নেই বল্‌লেই হয়। অন্ততঃ এমন কিছু নেই, যা'তে তাকে ধর্‌তে ছুঁতে পারা যায়। নীচে "সেবিকা" ব'লে সই। পরিচয়টা এখনও গোপন র'য়েই গেল!

সেবাশ্রমের সেই দরদী সেবিকা বোন্‌টির জন্যে বড্ড মন কেমন করিতে লাগিল তার। সময় সময় করিতও। কোথা সে—কে সে? চিঠিখানার "কপালে" একটা স্নেহের চুম্বন আঁকিয়া দিয়া সে সেখানা তুলিয়া রাখিল।

জেলের সেলে লোহার খাটিয়ায় শুইয়া এক একদিন রাত্রির স্বপ্নে সে বুঝি সেই দেশের হস্‌পিটালের খাটিয়াটায় ফিরিয়া যাইত। সেই সুন্দর নিরিবিলি ঘরখানা। সব সময় ধূপ গুগ্‌গুলের একটা মিষ্টি গন্ধ। দেওয়ালে মহাত্মার আর ঠাকুরের ছবি। ভারি গুমোট্‌—সে ঘুমিয়ে বড্ড বুঝি ঘেমেছে। আর, ঘুমের ঘোরে কার নাম ধ'রে সে বুঝি দু'একবার ডেকেছেও। কে যেন তার শিয়রে ব'সে পাখার বাতাস কর্‌ছে। পাখার বাতাসে ঘাম গেল না। তখন, অতি সন্তর্পণে, ঘুমটি তার না ভাঙ্গে এমনিভাবে, মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে আঁচলটি দিয়ে তার ঘামটা মুছিয়ে নিচ্ছে। কত যেন ভয়ে ভয়ে! চুলগুলো বেয়াড়া হ'য়ে চোখের ওপর তার প'ড়েছিল বুঝি? তাই অতি ধীরে ধীরে সেগুলো সে আঙ্গুল দিয়ে তার সরিয়ে ঠিক ক'রে দিচ্ছে। নিঃশ্বেসটা তার একটু-খানি বেশী লম্বা হ'য়েছিল বুঝি? সতুর অধরোষ্ঠের ওপর সেটা তার কোমল উষ্ণ স্পর্শটুকু দিয়েছিল! সতুর ঘুমটি ভেঙে যেত' নাত' তাতে'!

স্বপ্নের ঘোরে আরও দেখ্‌ত নাকি—সে কত বড় একটা প্রাণঢালা সেবা নিয়ে সেই হস্‌পিটালে তার শিয়রে বিনিদ্র রজনী যাপন করছে? বুকটা তার সেই কুড়িয়ে পাওয়া স্নেহের বোন্‌টিকে সোহাগ করার জন্যে ফুলে ফুলে উঠ্‌ত না কি? দুর্ব্বল বাহু দুটি তার, তার মাথাটা আপন বুকের কাছে টেনে নিতে চাইত, কপালে তার দুটো একটা যূথভ্রষ্ট অলকগুচ্ছ আদর ক'রে গুছিয়ে দিতে যেত, আর—আর সেই অলকদামের অবকাশে একটা মৃদু চুম্বনরেখাও বুঝিবা মুদ্রিত ক'রে দিতে ঠোঁটটা তার উৎসুক হ'ত! কিন্তু সে মুখখানা রাঙা ক'রে, আস্তে আস্তে তার হাত দুটো নাবিয়ে নিয়ে আবার বিছানায় শুইয়ে দিত, আর ধীরে ধীরে উঠে পড়্‌ত। বল্‌ত—"সুব্রতবাবু, আপনার দুধটুকু ষ্টোভে গরম ক'রে নিয়ে আসি।" স্নেহময়ী সে, সোহাগময়ী সে, রহস্যময়ী সে!

সেবাশ্রমে এমন ঘটনা সত্য সত্যই অবশ্যই কোনদিন ঘটে নি। সুব্রত এক একদিন স্বপ্ন দেখিত বই নয়! এখানে জেলের খাটিয়ায় শুয়েও দেখ্‌ত।

আবার চলার পথে কবে তার সাথে মিল্‌বে সে? সেটা তার যে একটা মস্ত বড় কামনা, মস্ত বড় আশা! চিঠি রত্তি পেয়ে সমস্যার কোনও কূল সে পেল না।

একদিন এক মজার কাণ্ড ঘটিল। একদিন সেই জেলের হাঁস-পাতালেই স্বপ্নটা সে দেখিল।

তখন জেলে ইনফ্লুয়েঞ্জা হচ্ছিল। একদিন সন্ধ্যায় বেশ গা হাত পা বেদনা ক'রে সুপ্রিয়র জ্বর হ'ল। জ্বরটা বেশী নয়। মাথা কাম্‌ড়ানি খুব ছিল। সুব্রত তার সেলে গিয়ে তার গা হাত পা মাথা টিপে দিল। সুপ্রিয় দিন দুইয়ের ভেতরেই সেরে উঠল। হস্‌পিটালে সে যায় নি। কিন্তু সুব্রত নিজে পড়্‌ল। জ্বরটা বেশী বেশী—মাথার যন্ত্রণা, সর্দ্দিকাসি

বেশই কষ্টদায়ক হ'ল। জেলর হস্‌পিটালে পাঠালেন। দোতলার এক-খানা ঘর। একটাই বেড। বেশ নিরিবিলি। ডাক্তার সেদিন সন্ধ্যায় মাথার যন্ত্রণা কমাবার আর ঘুমটুম হবার একটা ঔষধ দিয়েছেন। জ্বরটা কম নয়—১০৪ ডিগ্রী হবে। সুব্রত যেন কতকটা বেঘোরের মতন হ'য়ে তার বেডে শুয়েছিল। ঠিক ঘুমও না, জাগাও না। মাঝামাঝি একটা অবস্থা।

একবার মনে হ'ল তার—সেই স্বপ্নটা সে দেখ্‌ছে। স্বপ্ন, কিন্তু—বেজায় স্পষ্ট। কে তার খাটটিতে ব'সে তার কপালে ওডিকোলনের জলপটি দিয়ে ধীরে ধীরে বাতাস কর্‌ছে। এক একবার হাতখানা দিয়ে তার কপালের রগটা আস্তে আস্তে টিপে দিচ্ছে। কি কোমল অঙ্গুলির স্পর্শ তার! তার যন্ত্রণা যেন অর্দ্ধেকেরও কম হ'য়ে গিয়েছে! এইবার সত্যিই বুঝি তার ঘুম পাচ্ছে? ঘুমে জড়ানো চোখ দুটো একবার মেলে চাইতে সে চেষ্টা করল! কে সেই শুশ্রূষা-কারিণী? বড়ই চেনা যে মুখখানা? পরণে একখানা নীল সাড়ী। নীল সাড়ী সেত' কই পরত না! চাহনিতে তার সেই প্রাণঢালা দরদ! চোখের কোণটায়—একেবারে কোণটায়—একটুখানি হাসিও ছিল না কি? কে জানে কি মধুর হেঁয়ালির হাসি সে রত্তি! সুব্রতর মাথার চুলের ভেতর আস্তে আস্তে তার সেই চাঁপার কলির মত আঙ্গুলগুলো খেলে বেড়াতে লাগ্‌ল। ওডিকোলনের একটা পটি বদ্‌লে আর একটা সে কপালে বসিয়ে দিচ্ছে বুঝি? মুখখানা তার খুব কাছে [illegible]—এত কাছে যে, সতুর আধ্‌খোলা চোখদুটো সে মুখখানার চোখের তারা দুটোই শুধু দেখ্‌তে পাচ্ছিল। আঁখিতারা নয়, সোহাগের দুটো অমৃত প্রস্রবণ—আবিলতা নেই, চপলতা নেই, ফেনিলতা, ছদ্মতা নেই তাতে!

সতুর চোখ বুজিয়া আসিল। আর কিছু দেখিল না সে।

সকালে হাঁসপাতালের বেডে ঘুম যখন তার ভাঙ্গিল, তখন খোলা জানালা দিয়ে শরতের নূতন প্রভাত কোন্‌খান থেকে হেনা, রজনী-গন্ধার শেষ বাসটুকু বহন ক'রে এনে, তাই মাখানো ঢল্‌ঢ'লে অরুণরাগে তাকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। বেশ ভাল ঠেক্‌ল তার। জ্বর বোধ হয় আর নেই। যন্ত্রণা টন্ত্রণাও নেই। বিছানায় সে উঠে বস্‌ল।

হাঁসপাতালে সেদিনটা আর তার পরের দিনটাও সে থাকিল। আর জ্বর হয়নি। বেশ ভালই ছিল সে। রাত্তিরে ঘুমিয়ে পড়ার সময়—কি একটা মধুর স্বপ্নের যেন সে প্রতীক্ষা করৃত। সে আজ্‌কেও আর আস্‌বে না ?

আর সে স্বপ্ন এল না। সকালে ঘুম থেকে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস সতু ফেল্‌ত। দুদিন বাদে নিজের সেলে সে ফিরে গেল। স্বপ্নের কথা তার মনে মনেই থাক্‌ল। সুপ্রিয়কেও কিছু বল্‌ল না। বল্‌বে আর কি ? ব্যায়রামের ঘোরে কবে কি স্বপ্ন দেখেছে—আজগবি একটা স্বপ্ন—তা নিয়ে ঢাক পেটাবার আর কি আছে ?

ছাদে সে বেড়াত' আবার। কিন্তু সে নীলবসনা রাজবন্দিনীটিকে আর কৈ দেখ্‌তে সে পায় নি।

———

একাদশ

অনুষ্ঠানের ত্রুটি কিছু হইল না। মায় একটা হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্ পর্য্যন্ত।

সেই হাঙ্গামার পর থেকে জেলের কর্ত্তৃপক্ষদের সঙ্গে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্পর্কটা আর "মধুর" ছিল না। কর্ত্তৃপক্ষ বোধ হয় এপক্ষে অনেক কিছু ফোঁস্‌লানি, ওস্‌কানির গন্ধ পাইতেছিলেন; কাজেই, এতদিন তাঁদের মেজাজের ওপর সৌজন্য শিষ্টাচারের, এমনকি সহানুভূতির, যে মোলায়েম কভারিংটা ছিল, সেটা ছিঁড়িয়া যাইয়া, তার ভেতরে লাল ফিতে বাঁধা অফিসিয়ালি ফাইলগুলোই দিন দিন বাহির হইয়া পড়িতেছিল। ষড়যন্ত্রের বা ওস্‌কানির প্রমাণ আমরা পাই নাই। তবে, এটা ঠিক যে, রাজনৈতিক বন্দীদের পক্ষ থেকেও কেউ কেউ সেই মোলায়েম কভারিংটে টানিয়া টুনিয়া ছিঁড়িয়া ফেলায় কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁদের দিক্ থেকে ব্যবহার আচরণগুলো ক্রমেই একটা অনম্র মেজাজের যে অসৌজন্য, তার দিকেই ঘেঁসিয়া আসিয়াছিল।

দেশব্যাপী আন্দোলনে কোন একটা ব্যাপারই তুচ্ছ নয়; কোন একজন কর্ম্মীই সামান্য নয়, নগণ্য নয়। তার পেছনে দেশের নবজাগ্রত সমগ্র মুমুক্ষু, মুক্তিকামী শক্তিটাই রহিয়াছে। নয় কি? সেই বিরাট্ শক্তিতেই শক্তিশালী আন্দোলনের যে কোন একটা ব্যাপার, শক্তিমান্ যে কোন একজন সামান্য কর্ম্মী। শাসকদের পক্ষেও তাই। গাঁয়ের ঐ ছেঁড়া নীল-কুর্ত্তা-পরা চৌকীদার—ওত' সামান্য নয়। তার ঐ চাপরাশটার পেছনে রহিয়াছে প্রবলপ্রতাপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সমস্ত পুঞ্জীভূত, শৃঙ্খলাবদ্ধ শক্তি। নেই কি? সে শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিলে,

ও কি ? তালপাতার সেপাই বৈত নয় ! গণশক্তি ও রাজশক্তি—এ দুয়েরই "বিশ্বরূপ" চোখের সাম্‌নে রাখা কর্ত্তব্য ।

সুব্রত এই ভাবেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিল । ষড়যন্ত্র, ওস্‌কানি, এসব সেত' আদৌ পছন্দ করিত না । জেলের ভেতর উচ্ছৃঙ্খলতা, ঔদ্ধত্যও না । আগেই ব'লেছি—জেলের সেল্‌ ছিল তার পক্ষে একটা যেন তপোগুহা । আত্মশুদ্ধির, সংযমের, শক্তিসঞ্চয়ের অভ্যাস এখানে করিতে হইবে । সকলের 'বিলসফি' অবশ্য একই নয় । আমরা সুব্রতর পক্ষের কথাটাই বল্‌ছি । কথাটা ফেলার নয় । আসল কথা, সুব্রত ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে মুখ্যতঃ "রাজনৈতিক" ভাবে দেখিতেই রাজি ছিল না । এটা ভারতের প্রায়শ্চিত্ত, আত্মশুদ্ধি, আত্ম-প্রত্যয়ের আন্দোলন । সুব্রতর ধারণায়—ভারতের স্বারাজ্যের জন্য "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ।"

"আন্দোলন" কথাটাও তার ভাল লাগ্‌ত না—বিলিতি 'এজিটেশনের' তরজমা বুঝি !

পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রশক্তির অথবা অথরিটির মর্য্যাদা অযথা ক্ষুণ্ন হ'ক—সুব্রত এটা কামনা করিত না । রাষ্ট্র যে আকারই ধারণ করুক না কেন, গণতন্ত্রই হোক্‌ আর রাজতন্ত্রই হোক্‌, রাষ্ট্রশক্তি একটা চাই-ই চাই ; আর, সেটা তার স্বমর্য্যাদায়, স্বে মহিম্নি প্রতিষ্ঠিতও থাকা চাই । রাষ্ট্র এঞ্জিনের চাকাটাকা বদ্‌লাবে বদ্‌লাও, একেবার "ওভারহল্‌"ও করতে পার সেটাকে, দরকার হ'লে । কিন্তু তার "মোটর পাউয়ার্‌"—তার কর্ম্মশক্তির যেটা মূল উৎস গণমানসের অভ্যাস ও সংস্কারগুলোর তলে দেওয়া আছে,—সেটা নিঃস্ব, প্রক্ষিপ্ত বিক্ষিপ্ত হ'তে দিও না । কা'ল বুরোক্রাসির হাত থেকে ক্ষমতা, সম্পূর্ণভাবে না হোক্‌ অনেকটা, জাতীয় প্রতিনিধিদের হাতে হয়ত' যাবে । তখন রাষ্ট্রশক্তির

যেটা রাজদণ্ড, সেটা জাতীয় মন্ত্রিসভাই হাতে তুলে নেবেন। কিন্তু তুলে নিতে গিয়ে যদি দেখেন, সেটা যাত্রা দলের ভীমের গদা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে,—তা নিয়ে আস্ফালন করা চলে, শাসন করা চলে না— গণ-মানসে একটা আমোদ, একটা কৌতুক সে সৃষ্টি করে, একটা শ্রদ্ধা, একটা সম্ভ্রম সৃষ্টি করে না, তবে, বুঝ্‌তে হবে, মন্ত্রিসভা আসরে সেজে এসেছেন মাত্র। খানিকটে আস্ফালনের পর গদাটি তাঁর নামিয়ে রেখে আসরে ব'সেই কল্‌কের ধোঁয়া নাক মুখ ভ'রে বের কর্‌বেন! সত্যকার রাষ্ট্রশক্তি গণমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত, অঙ্গীকৃত, সমাদৃত, পরিষেবিত— তাঁরও চাই। এই জন্য, যে ক্রিয়ার মূলে হচ্ছে অসংযম, উচ্ছৃঙ্খলতা, স্রেফ্‌ বেপরওয়া অবাধ্যতা, সে ক্রিয়ার কর্ম্ম শুভ হবে না ব'লে সুব্রতর ধারণা ছিল। আর, সে ক্রিয়ার কর্ত্তাও সে নিজে হবে না। এই জন্য— তার বিবেচনায়—জাতীয় আন্দোলন হবে জাতীয় তপস্যা।

অসন্তোষের ফলে জেলে একটা জেনারেল হাঙ্গার ষ্ট্রাইক হ'য়েছিল। মাত্র তিনদিনের। সুব্রতও তাতে যোগ দিয়েছিল। হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্‌টা একটা হুজুগ বা আব্‌দারের জিনিষ সুব্রত মনে করিত না। এসব সম্বন্ধে মহাত্মার "ইয়ং ইণ্ডিয়ার" লেখাগুলো সুব্রত পড়িত— সহবন্দীদেরও পড়িতে দিত। কেউ পড়িত, কেউ পড়িত না। মহাত্মাকে "জেনারেল"এর প্রাপ্য অভিবাদনটা দিতে অনেকেই হয়ত' প্রস্তুত ছিল। কিন্তু গুরুর প্রণামীটে দিতে সকলে প্রস্তুত ছিল না। মহাত্মার "ফিলসফিতে" ভক্তির বাহুল্য সকলের ছিল না। দু'চার জনের অভক্তি, অনেকের অর্দ্ধভক্তি সিকিভক্তি, কারুর কারুর বা "অতিভক্তি"ও লক্ষিত হইত। যেটাকে কেবল, শুদ্ধ ভক্তি বলে, সেটা ছিল ক'জনের? অনেকে মহাত্মার মাহাত্ম্যটাকে "এক্‌সপ্লয়েট্‌" করাটাই সমীচীন মনে কর্‌তেন। দেশকে তোলবার জন্যে সব কিছুই

"একৃসপ্লয়েট্" করা চলে বোধ হয়!—তিলকের বিশাল হৃদয়, প্রগাঢ় আস্তিক্য, ভাস্বর জ্ঞান—এ সব যাঁদের নেই, তাঁরাও তিলকের পাঁতি আওড়ান—পলিটিক্স্ সাধুদের জন্যে নয়। সুব্রতর কিন্তু মনে হ'ত—পলিটিক্স্ করার যোগ্যতম পাত্র হচ্ছেন যাঁরা সাধু, তাঁরাই। শুধু বাইরে সর্ব্বত্যাগী ব'লে নয়; অভিমানত্যাগী, রিপুজয়ী, আত্মজয়ী, বিশ্বভূত হিতে রত ব'লে। সাধু ছাড়া আর যে কেউ পলিটিক্সে হাত দেবেন, তিনিই পলিটিক্স নোংরা ক'রে ফেল্বেন। যা গুল্বেন, তাই গেঁজে ভটৃভটে হ'য়ে উঠ্বে। যা ঘাটিয়ে চাগিয়ে তুল্বেন, তাই উঠে ঘাড়ে চেপে বস্বে। সেই সিন্ধাবাদ বণিকের ঘাড়ে বুড়ো শয়তানটার মত।

ফলে, জেনারেল ষ্ট্রাইকের অবসান তিন দিনেই হইল বটে, কিন্তু সকলে হাঙ্গারা-ষ্ট্রাইক্ ভঙ্গ করিল না। যে দু'চার ভঙ্গ করিল না, তাদের মধ্যে সুপ্রিয় একজন।

সুব্রত অনেক বুঝাইল। কিন্তু সুপ্রিয়র জেদ ভাঙ্গিল না। একটা খুন চেপে যাবার মতন অবস্থা এতেও হয় না কি? বিশ্বনরে অবস্থিত যে অগ্নি, তিনি ক'টি যুবকের জঠরে উপবাসী থাকিয়া সারা দেশের লোকের বুকের রক্তের দিকে যেন তার লেলিহান জিহ্বা-গুলো মেলিয়া দিতেছেন! কারুর প্রাণে স্বস্তি নেই। আর জেলে সেই রাজ-নৈতিক বন্দীদেরত' কথাই নেই। তাঁরা খেয়েও উপোস কর্ছিলেন, ঘুমিয়েও সব সময় জেগে রইতেন! পুরাণে দেখি, এক একজন কুম্ভক করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিল, আর বিশ্বের স্থাবর জঙ্গম সব যেন দমবন্ধ হইয়া হাঁপাইয়া উঠিতেছে; কেউ পঞ্চাগ্নি করিল, আর নিখিল বিশ্বপ্রাণী অন্তরে অন্তরে বিষম সন্তপ্ত হইয়া উঠিতেছে। সব্বাই গিয়ে দেবতাদের কাছে দরবার কর্ছে; দেবতারা আবার তাদের যাঁরা

মাতব্বর তাদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। সত্যিই—নিখিল প্রাণিসমাজ একটা বিরাট্ স্নায়ুযন্ত্রেরই মত। কোন একটা কেন্দ্রে উত্তেজনা ঘট্‌লে সমস্ত যন্ত্রটাই তাতে অল্পবিস্তর চঞ্চল হয়, বিব্রত হয়। হয়ত' সবাই বুঝতেও পারে না—ঠিক কি ক'রে কি হচ্ছে।

সুব্রত ক'দিন সুপ্রিয়র পাশে ব'সে যে অভ্যন্তরীণ উষ্মাটা অনুভব কর্‌ল, সে রকম সে জীবনে কখনও করে নি।

দিন পনের কাটিয়া গেছে। সুপ্রিয় দুর্ব্বল, কিন্তু প্রফুল্ল। তাকে বোঝাতে গেলে কিছু আর বলে না। একটু একটু হাসে। ভারি করুণ সে হাসি, কিন্তু ভারি জেদের।

একদিন জেলর এক প্রবীণ ভদ্রলোককে সঙ্গে করিয়া সুপ্রিয়র সেলে আসিলেন। সুব্রতর অপরিচিত। কোট্ প্যাণ্টালুন্ পরণে। মাথায় হ্যাট্ নয়, একটা টুপি। হাতে একটা মোটা সিগার। সুপ্রিয় বিছানায় বালিশ হেল্যান দিয়া বসিয়া ছিল। প্রণাম করিল হাত যোড় করিয়া।

"এই যে সুপ্রিয়, একেবারে নিজেকে খুন ক'রে ফেলেছে যে!"—ভদ্র লোকটি চেয়ারে বসিয়া বলিলেন। জেলর কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল।

সুপ্রিয় সে কথার উত্তরে অল্প একটু হাসিল মাত্র। কিন্তু বলিল "জেঠামশায়, ভাল আছেন? আপনার শরীরটে ত' ভাল ছিল না। জেঠাইমা, সমর দা এঁরা সব ভাল আছেন?"

ইনি মিঃ সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জির পিতা মিঃ জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি সি, আই, ই।

"সমর আর তার মা ভাল আছেন। আমার এক রকম কেটে যাচ্ছে। কিন্তু তোমার এ হাঙ্গার ষ্ট্রাইকে যে আঁতে ঘা লাগছে সুপ্রিয়,

সব্বাইকার !"—ছোট বেলা থেকে সুপ্রিয়কে দেখছেন। বোধ হয় একটু স্নেহও করেন।

"শুনে দুঃখিত হলুম, জেঠামশায়। কিন্তু অন্য উপায় ছিল না।"

"রাগ ক'রোনা সুপ্রিয়, তোমাদের এ পাগ্‌লামি আমি ত' বুঝি নে। নিজেকে না খেয়ে শুকিয়ে মেরে ফেলে, বাপ মার, আমাদের সবাইকার কষ্ট দেবে, দেশে একটা সেন্‌সেশন সৃষ্টি কর্‌বে, কিন্তু তাতে কাজ কি তোমাদের এগুলো ?"

"ফলাফলের হিসেব ক'রেত' এটা করিনি, জেঠামশায় ! আমাদের বিবেচনায় অন্যায় ব'লে যেটা মনে হ'য়েছে, তার অন্যরকম প্রতীকার যখন ক'র্ত্তে পারিনি, তখন এই রকমেই তার প্রতিবাদ জানাতে হচ্ছে। আর, মহাত্মাজী যে অহিংসা দিয়ে হিংসা জয় কর্‌বার বাণী প্রচার কর্‌ছেন, সেই অহিংসারও যেটা সর্ব্বোত্তম রূপ, যেটা সর্ব্ববিজয়িনী শক্তি, সেটা, আমাদের মনে হয়, ফুটে বেরোয়, এরকম ধারা নিষ্ঠার সঙ্গে, আনন্দের সঙ্গে, তিল তিল ক'রে নিজের দেহের রক্তে একটা দ্বৈমাসিক, ত্রৈমাসিক হোম ক'রে।"

"তোমাদের ও সব কথা মাথায় ঢোকে না আমাদের, সুপ্রিয়। গভর্ণমেণ্ট কিছু বিব্রত হয়, দেশ খানিকটে একসাইটেড হয় অবশ্যি তোমাদের এই সব দ্বৈমাসিক ত্রৈমাসিক হোমে। ন্যায় অন্যায়ের কথা বলছ ? আলাদা আলাদা ভিউজ। তুমি যেগুলো অন্যায় বলে প্রতিবাদ কর্‌ছ, গভর্ণমেণ্ট সেগুলো অন্যায় ব'লে স্বীকার হয়ত করেন না। না খেয়ে ম'রে কি তাঁদের স্বীকার করাবে ? মর্‌লে তাঁরা বিব্রত হবেন, দুঃখিতও হবেন—যতীন দাসের বেলা যেমন হ'য়েছিলেন। কিন্তু তাতে দিন রাত হয় না, রাতও দিন হয় না। ভাইস্‌রয় ত' রাউণ্ডটেবলে সব্বাইকে ডাক্‌ছেনই। এ সব ব্যাপারের আগেও ডেকেছিলেন।

বোঝাপড়া করার জন্যে। তাঁদের ভুল সেখানে গিয়ে তাঁদের দেখিয়ে দাও, বুঝিয়ে দাও। বুঝ্‌বেন বৈকি। তোমরা যে অন্য রাস্তা ধর্‌লে।"

"পলিটিক্‌সের যেখানটায় এসে পড়া গেল, সেটা বড্ডই ডিবেটেবল্‌ গ্রাউণ্ড, জেঠামশায়। আমরা যদি বলি, মহাত্মা ঠিক রাস্তাই ধ'রেছিলেন, আপনারা কিছুতেই সেটা মান্‌বেন না। বড় কথা থাক্‌। এই যে জেলে আমাদের হাঙ্গার ষ্ট্রাইক্‌টে, এটা কি মনে করেন একটা হাল্‌কা কারণ থেকেই ঘ'টেছে ? আমাদের কমিটির সেক্রেটারি ত' এই র'য়েছেন —ওঁর কাছে শুন্‌তে পারেন।"—সুপ্রিয় সুব্রতকে লক্ষ্য করিয়া শেষের কথা ক'টি বলিল। মিঃ চ্যাটার্জ্জি সে দিকে তাকাইয়া একটিবার "নড্‌" করিলেন মাত্র। সুব্রত নমস্কার করিল।

"জিজ্ঞেস কর্‌তে হবে না। পয়েণ্টটা হচ্ছে এই—ধর, তোমরা যেটা জেলের ভেতর থেকে কর্‌বে ঠিক ক'রেছ, সেটা, অন্যায় ব'লেই হোক্‌, অথবা ওপরকার পলিসির সঙ্গে বাধে, খাপ্‌ খায়না ব'লেই হোক্‌, তাঁরা কর্‌তে দিলেন না। অমনি না খেয়ে মর্‌বে তোমরা ? এও কি একরকম বাধা দেয়া নয়, 'কোয়ার্সন্‌' নয়, সুপ্রিয় ? জেলের অনেক আবশ্যক সংস্কার—পোলিটিকাল প্রিজ্‌নারদের বিশেষ সুবিধে টুবিধে—তাত' হ'য়েছেই ! যাতেই, যে কারণ থেকেই হোক্‌—এখন ভদ্রভাবে, এমনকি সম্ভ্রমের সঙ্গেও, ভদ্রলোকের ছেলে জেলে বোধ হয় থাকতে পারে।"

"ষ্টান্‌ডার্ডটা খাটো হচ্ছেনা, ক্রমেই যে বড় হ'য়ে চলেছে, জেঠামশায়। আগে জেলে এসে সাধারণ কয়েদীদের সঙ্গে সারবন্দী হ'য়ে 'সরকার সেলাম'টা না কর্‌তে হ'লেই চল্‌ত, এখন জেলের ভেতরেও ফ্ল্যাগ্‌ স্যালুউটেসন্‌ পর্য্যন্ত যে চাই !"

সকলে হাসিলেন।

"অর্থাৎ, তোমরা জেলের কর্তাদিকে বলছ—এটা জেলখানা নয়, কংগ্রেস ক্যাম্পই—স্বরাজ আশ্রম। তুমি দয়া ক'রে আমাদের ফ্ল্যাগ স্যালুউটেশন্, কুচকাওয়াজ টাওয়াজের সব যোগাড় যাগাড় ক'রে ফেল !"

এবারও সকলে হাসিলেন।

"মস্কিল এই—রাউণ্ডটেবল্, ওভাল টেবল—এসব হ'য়ে যা হয় একটা কিছু হবেই। যদ্দিন না হয়, তদ্দিন গভর্ণমেণ্টকে গবর্ণমেণ্ট হ'য়েই থাকতে হবেত', নয় কি ?"—মিঃ চ্যাটার্জ্জি আবার বলিলেন।

"আর, আমাদের তদ্দিন কি হ'য়ে থাকতে বলেন, জেঠামশায় ?"

"জেলের ভেতরে এসে অন্ততঃ আইন অমান্যটা বন্ধ রাখলে, তোমরা কিছু ভেড়া হ'য়ে যাবে না, নিশ্চয়।"

সুপ্রিয় এবার কথা কহিল না।

"যাক্, হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের প্রিন্‌সিপল্ নিয়ে ডিস্‌কাস্ করতে আমি আজ ঠিক আসিনি। অন্য দিক্ দিয়ে তোমায় আপীল্ করতে।"

"বাবা মার ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বুঝি ? সে কথা আমিত' ভুলিনি কোন দিন, জেঠামশায়।"

"তোমার জন্যে এই এঙ্গজাইটি তাঁদের পেড়ে ফেলেছে। একটা কিছু ভালমন্দ হয় যদি তোমার, তবে সে সক্ কি তাঁরা সাম্‌লাতে পারবেন, সুপ্রিয় ? তোমার বাবাত' না ম'রে বেঁচে আছেন বৈ নয় ! একেবারে শিশুর মত দুর্ব্বল হ'য়ে প'ড়েছেন।"—মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁর বাল্যবন্ধু।

সুপ্রিয়র চোখদুটো ছল ছল করিয়া উঠিল। খানিক পরে সে বলিল, "সে কথা সত্যি—খুবই সত্যি। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কাজটা আমিত' করিনি। একটা প্রিন্‌সিপলের জন্যে পাঁচজনে মিলে ক'রেছি।

ব্যক্তিগত কারণ যতই গুরুতর বা জরুরি হ'ক—একলা 'ব্যাক্ আউট্' করা যায় না, জেঠামশায়।"

"যদি কর্ত্তৃপক্ষ তোমাদের কেস্‌টা পুনর্বিচার করেন, কর্‌তে মত করেন, তবে ?"

"তা হ'লে, আলাদা কথা"—সুপ্রিয় গম্ভীরভাবে বল্‌ল।

অতঃপর সে প্রসঙ্গ আর চলিল না। সুব্রতকেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল—মিঃ চ্যাটার্জ্জি তাঁর দৌত্য—ডিপ্লোমাটিক্ মিশন্ বেশ সুকৌশলেই নির্ব্বাহ করিয়াছেন। ফল যাই হোক্।

"ভাল, সুজাতা কোথা, জেঠামশায় ? অনেকদিন তার খোঁজ পাইনি।" সুজাতা কে ?—সুব্রত চিনিল না।

"তাঁর খোঁজত' তোমরাই ভাল রাখ্‌বে। সেত' তোমাদের দলেই ভিঁড়েছে।"—মিঃ চ্যাটার্জ্জি বলিলেন। তাঁর মুখখানা ভার ভার, ভ্রূযুগল একটু কুঞ্চিত।

তিনি উঠিলেন। দরজার কাছে সুব্রতর দিকে ফিরিয়া একবার জিজ্ঞাসা করিলেন—

"আপনিই বুঝি সেক্রেটারি এঁদের ? মশায়ের নামটা ?"

"সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়।"

তিনি একটা "নড" করিয়া বাহিরে গেলেন। সুব্রত নমস্কার করিল।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি সেই বড় জেলটার একজন অনারারি "ভিজিটর্"। তিনি সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের আফিসে যাইয়া তাঁদেব সঙ্গে খানিক কি কথাবার্ত্তা কইলেন। তার পর, বালীগঞ্জ চলিয়া গেলেন।

সেবার জেলেই তারা দুর্গোৎসব করিবে ঠিক ছিল। কর্ত্তৃপক্ষের অমত ছিল না। তবে, খরচাটা তাদের নিজেদেরই। সেখানে তারা

সব্বাই হিন্দু। প্রথমে ঠিক ছিল—দস্তুরমত মায়ের প্রতিমা গ'ড়েই পূজো হবে। মেয়ে-ওয়ার্ডের ওঁরাও পূজোয় যোগ দেবেন। হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের ব্যাপারে কারুর প্রাণে স্বস্তি ছিল না, শান্তি ছিল না। প্রস্তাব হইল—যাঁরা ষ্ট্রাইক্ করেন নি, তাঁদের পক্ষ থেকে—পূজোটা না হয় বন্ধ থাক্। ষ্ট্রাইকের ছেলে ক'টি কিন্তু কিছুতেই তা হ'তে দেবে না। পূজো করতেই হবে। নৈলে, তাদের বোঝা আরও ভারি হবে! অগত্যা, হবে ঠিক হ'ল। তবে, প্রতিমা গ'ড়ে আর নয়, ঘটে। হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের ছেলে ক'টি যেখানটায় থাক্‌ত—তারি ঠিক সাম্‌নে একটা যায়গায় পূজোর মণ্ডপ হবে ঠিক হ'ল।

ষ্ট্রাইকের সংবাদ খবরের কাগজ দেশময় খুবই ছড়াইয়া দিয়াছিল। সারা দেশের লোক বড়ই একটা উৎকণ্ঠা লইয়া চাহিয়াছিল জেলের ঐ কয়টা সেলের পানে। যখন তখন জেলের ফটকের বাইরে লোক সব উদ্‌গ্রীব হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিত।

বোধনের দিন। কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থামত গঙ্গায় ঘট ভরিতে যাওয়ার আয়োজন হইল। বাইরে নরনারীর একটা মস্তবড় প্রোসেশন্। পতাকা তুলিয়া, গান গাহিয়া তারা জেলের ফটক পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। আমরা আপাততঃ তাদের সঙ্গে মিশিব না।

জেলের ভেতরে পূজামণ্ডপটি—পাতা দিয়ে, ফুল দিয়ে অতি সুন্দর সাজানো। জেলর ফুলটুল দিতে কার্পণ্য করেন নি। তা ছাড়া, বাহির হইতে রাশি রাশি ফুল এসেছিল। ফুলের মালা গেঁথে একটা "বন্দেমাতরম্" ছেলেরা তৈরি ক'রেছিল—ভারি সুন্দর হ'য়েছিল সেটা। জেলকর্ত্তৃপক্ষের নাসা তিনরঙা ফুলের ভেতর সিডিশনের গন্ধ পান নি। কয়টা ঘটস্থাপন ও স্বস্তিবাচনের বৈদিক মন্ত্রও তারা ফুল দিয়ে লিখেছিল। সুব্রত সেগুলো তাদের ব'লে দিয়েছিল।

টাটকা ফুলের পাপড়ি ছাড়ানো বিছানায় অনশনব্রতী ছেলে ক'টি ব'সে ছিল। তখন অনশন তিন সপ্তাহের বেশী হ'য়ে গেছে। ক্ষীণ শরীরের শিরায় শিরায় একটা যেন আগুনের স্রোত তাদের ব'য়ে যেত'। কিন্তু মুখ তাদের প্রফুল্ল—কা'ল সিটের ভেতর থেকে চোখদুটোতে যেন একটা জ্যোতিঃ—একটা জ্বালা বেরুচ্ছে।

দুর্গোৎসবের জাতীয় "ইন্‌টার্ প্রেটেশন্" সেই বঙ্কিমবাবু থেকে আরম্ভ ক'রে অনেকে দিয়েছেন। বাঙ্গালীর বুকের রক্তধমনীতে এ উৎসবের সেটা মর্ম্মবাণী, সেটা চিরদিন রক্তস্রোতের তালে তালে স্পন্দিত হ'চ্ছে। বাঙ্গালীকে চেতাবার, বোঝাবার তেমন কিছু নেই। তবে রক্তস্রোতের শিরেগুলোতে তাজারক্তের বেজায় চাহিদা হ'য়েছে!

বোধনের দিন সকাল বেলা জেলকর্ত্তৃপক্ষের নির্দ্দেশ মত ঘট ভরিতে ছেলেরা মেয়েরা কেউ কেউ গিয়াছে। পূজো মণ্ডপের কাছে এক যায়গায় রোশন চৌকীতে ভারি সুন্দর একটা আগমনীর সুর বেজেছে!

কার আগমনী? কে নেই—কে আস্‌বে আজ আমাদের? অন্তরে বাহিরে কাকে বোধন কর্‌বার, আবাহন কর্‌বার, প্রতিষ্ঠা কর্‌বার সাড়া প'ড়ে গেছে? কে ঘুমিয়ে ছিল এতদিন আমাদের, কে দূরে ছিল, কে অ-পাওয়ার প্রবাসে ছিল আমাদের?

উলুধ্বনি ক'রে, শাঁখ বাজিয়ে, লাজ পুষ্পবৃষ্টি ক'রে ঐ যে কারা ঘট ভ'রে দিয়ে আস্‌ছে! জাতির যেটা বুক, সেটা খালি ছিল বুঝি? কোথায়, কি দিয়ে, সে বুক আবার ভ'রে নিয়ে এল?

সে মঙ্গল ঘট, সে অভয় আশায় পূর্ণ ঘট বরণ ক'রে নেবার জন্যে সকল অন্তর আজ যে আকুল, উন্মুখ! বন্দীরা সব্বাই সা'র ক'রে দাঁড়িয়েছিল—এমনকি, সেই অনশনব্রতী কঙ্কাল ক'টিও!

শাশ্বত মহাআকাশের নিম্নে, বিরাট্ বিশ্বমন্দির ভ'রে, মানবের কোন্ ভাগ্যবিধাতা আজ পাঞ্চজন্য মুখে বিশ্বজোড়া মুক্তিবাণী শোনা চ্ছিলেন !

ভারতের দেহটা হাজার বছর ধ'রে বন্দী, কিন্তু আত্মাটা তার অনেকদিন বন্দী হয় নিত'। নিজস্ব সাধনার ভেতরে দেওয়া ছিল একটা অবিংসংবাদিত স্বরাজ! আজ সে স্বরাজের রূপটাও হয়ত' গোপন হ'য়ে যাচ্ছে। তাকেই আজ আবার বোধন করতে হবে। সেই সত্যকার স্বরাজকেই আজ আবার আবাহন করতে হবে, প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই হাজার বছরের বাইরের বন্ধন—সেটা যে একটা 'কৃচ্ছ সাধন। এর হয়ত' দরকারই ছিল। এতদিন পলিটিকস্ না ক'রে হয়ত দেশ ভালই ক'রে ছিল। করলে হয়ত' সেও আর আর দেশের মতন সাম্রাজ্যগর্ব্বের ফুটন্ত মদে তার যেটা হৃৎপিণ্ড, সেটাকে জেরে ফেলত, গলিয়ে ফেলত'! কিন্তু আজকে তারও বুঝি পলিটিকাল্ হবার দিন এসেছে! বিশ্বমানব পলিটিকসের বিষের রাগে জ্বলে যাচ্ছে—খুঁজছে তার পলিটিকল্‌কে একটা নূতন প্রাণ দিতে, রূপ দিতে, প্রতিষ্ঠা দিতে! সে নূতন 'বোধন', সে নূতন আবাহন, সে নূতন প্রাণপ্রতিষ্ঠায় এই চিরতাপস দেশটাকেই কি পুরোহিত হ'তে হবে না? কিন্তু, তার আগে, তার গলে দুলবে বীর্য্যের, অভয়ের, প্রতিষ্ঠার শুভ্র যজ্ঞসূত্র, তার কপালে ভাসবে মুক্তির, শান্তির, মৈত্রীর দীপ্ত জয়তিলক!

মেয়েরা, আর তাদের পেছনে পেছনে ছেলেরা, পূর্ণ ঘট নিয়ে এল —পূজা মণ্ডপের কাছে কাছে। ঘট কক্ষে ক'রে কে আসছে ঐ আগে আগে মেয়েটি—বাসন্তী রঙ্গের একখানা খদ্দরের সাড়ী পরণে, গলায় একছড়া শুভ্র ফুলের মালা—মাথায় একরাশ চুল এলানো?

সুব্রত সুপ্রিয়র কাছে দাঁড়িয়েছিল—ঐ দিক্ পানে চেয়ে।

নিজের চোখ দুটোকে সে অনেকক্ষণ বিশ্বাস করতে পারে নি। আর—আর বুকের ভেতরকার দপ্‌দপানি তার ছাপিয়ে উঠেছিল—পূজামণ্ডপে সকল শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, কাঁসর ঘণ্টার ধ্বনিগুলো ছাপিয়ে!

ধীরে ধীরে এসে সে ঘটটি নামালো—এলুন আল্‌পনা দেওয়া যায়গাটায়। ঘটের মুখে আম্রশাখাটি ঠিক সোজা ক'রে, মানান ক'রে, বসিয়ে দিল।

তারপর—তারপর সে ফিরল সুপ্রিয় যেখানে সুব্রতর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

"দাদা—"

"চরিতা, লক্ষ্মী বোন্‌টি—!"

সুপ্রিয় তার কাঁধে মাথাটি তার রেখে কেঁদে ফেলেছিল—সেও। সুব্রতর পাশে স'রে গিয়েছিল।

হাঁ—সুচরিতাই বটে!

একবার সুব্রতর পানে ভেজা চোখের পাতা দুটো তুলে সে চেয়েছিল, আর তখুনি নীচু ক'রে নিয়েছিল।

কিন্তু শুধু কি সেই?

বরণের ডালা হাতে ক'রে কে এসেছে তার পাছে পাছে? আসমানী রঙের একটা খদ্দরের সাড়ী তার পরণে।

তার আলাপী নিশ্চয়ই কেউ?

সেও সুপ্রিয়কে একবার বুকে জড়িয়ে ধরল। তখুনি আবার বরণ ডালাটা সাজিয়ে রাখ্‌তে চ'লে গেল।

সুব্রতর মুখের দিকে চায় নি সে। সুব্রত তাকে দেখতে পেয়েছিল কি? বোধ হয় না।

*   *   *   *

আরদালি এসে সুব্রতর হাতে এক "আধা" সরকারি চিঠি দিয়ে গেল। সে সেক্রেটারি কিনা! তার নামেই চিঠিখানা বটে। তাঁর ভেতরে যা লেখা আছে—তাতে জেলের সব গোলযোগই মিটে গেল।

সুচরিতা আর সেই মেয়েটি সত্য সত্যই স্বস্তিবাচন—শান্তির জল বহিয়া আনিল দেখ্‌ছি।

মিঃ চ্যাটার্জ্জি "টেলি" করিয়া সুচরিতা আর তার বাবা মাকে আনিয়েছিলেন। বাবা আর মাকে দুর্ব্বল শরীরে আর জেলে আস্‌তে দেওয়া হয় নি। সুপ্রিয়র অবস্থা দেখে পাছে হার্ট ফেল্ ক'রে বসে তাঁদের। সুচরিতারা বাইরের প্রোসেশনের সঙ্গে ছিল। তাদের জেলের ভেতরে এসে "ইন্‌টারভিউ" করার অনুমতি পত্র দিল। নিজে ইচ্ছে ক'রেই ঘট ভ'রে নিয়ে এসেছে সে। আর, ঐ দিনকার মিটমাটের মুলে হয়ত' মিঃ চ্যাটার্জ্জির কিছু তদ্বির ছিল। যাই হোক্—বোধনের দিনই হাঙ্গার ষ্ট্রাইকেরও অবসান হ'ল।

দ্বাদশ

সেদিন সন্ধ্যার পর বালীগঞ্জ লেকের তারা দুটিতে বাঁচ খেলিতেছিল—সুচরিতা আর সুজাতা। ছোট এক খানি জলি বোট—আর কেউ ছিল না। শরতের সন্ধ্যা—কোজাগর পূর্ণিমার দু' একদিন আগে—বোধ হয় ত্রয়োদশী। পূব দিকে একটা পাম্‌গ্রোবের ঘাড়ের দিক ঘেঁসে, বেশ ঢল্‌ঢলে একখানা চাঁদ উঠেছিল। লেকের জলে ছোট ছোট ঢেউ-গুলোর গায়ে সাঁঝের গোলাপি ওড়নায় ঝিক্‌ঝিকে রূপোর জরির কাজ-তোলা তখন সবে সুরু হইয়াছে মাত্র। সেদিন আর কোথাও কি আমোদ প্রমোদ ছিল বোধ হয়—লেকের বুকে ভিড় ছিল না! লেকের ধারে সিটগুলোতে ঘেঁষাঘেঁষি নেই। কেমন যেন চুপচাপ্।

খানিক দাঁড় টেনে তারা লেকের মধ্যিখানে দাঁড় তুলে ধরেছে। জলি বোটটা ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ-এর তালে তালে একটু নাচ্‌ছে। খদ্দরের রুমালে ঘামটা মুছে সুচরিতা বলিল—

"একদম্ কোথা ডুব মেরেছিলি, জুতি? প্রায় মাস দুই কোন খবর দিস্‌নি যে।"

সুজাতাকে "জুতি" ব'লে ডাক্‌ত। তাদের দুজনের ছেলে বেলা থেকে খুব ভাব। দুজনেই বেথুনে পড়ত'। বালীগঞ্জে পাশাপাশি বাড়ীতে তারা থাক্‌ত'। যখন তাদের ছাড়াছাড়ি হত, তখন তারা পোষ্টাল বিভাগকে অন্ততঃ দেউলিয়া হ'তে দেবে না প্রতিজ্ঞা করেছিল। সেখানে "নোট্যাক্স" নয়, সুপারট্যাক্সেও তাদের আপত্তি ছিল না। আজ প্রায় দুমাসের উপর হ'তে চলল সুচরিতা সুজাতার চিঠি পত্র পায় নি।

তার লেখা চিঠিও একখানা ডি, এল, ও হ'য়ে ঘুরে এসেছিল। সে ভারি আশ্চর্য্য বোধ করেছিল—ভাবিতও হয়েছিল বৈকি কতকটা।

"সবরমতী আশ্রমে গেছলুম।" সুজাতা বেশ কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে জবাব দিল।

"পঁয়তাল্লিশ দিনের রিটার্ণ টিকিট কেটে বুঝি?"

"তা না ত কি? আমাদের কি আর আশ্রমে টাশ্রমে থেকে পোষায়? আমাদের ত' এই জলি গুল্ড—থুরি—নিউ লেকটাতেই মন বাঁধা প'ড়ে আছে, নয় চরি? বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য মনসাপি ন গচ্ছতি" —সুজাতা সংস্কৃত পড়িত।

"মনসা না হ'ক, কায়েন বাচা কদ্দূর যাওয়া হ'য়েছিল° শুনি?"—সুচরিতারও সংস্কৃতের বিদ্যেটা সহসা হা'র মানল না!

"অজ্ঞাত বাসে"।

"কোন্ বৃহন্নলা বেশে? কোন্ উত্তরার পাশে?"

"বৃহন্নলা নয়, বেশ অবলা সরলার বেশে। আর উত্তরার পাশে নয়, ভাই। এখান থেকে কোন্ দিক হবে?—দক্ষিণা আশার পাশে।" সংস্কৃত জ্ঞানটা টন্‌টনে দেখছি। আশা দিক্ ইত্যমরঃ বুঝি?

"জেলে? সত্যি? কৈ কাগজে ত' তোর নাম বেরোয়নি!"

"তা হ'লেত' গলায় দড়ি দিয়ে মর্‌তে হয়! কাগজে যদি নামটা নাই বেরুল এত বড় একটা কাজ ক'রে, তবে আর হ'ল কি? তোর নাম তো কাগজে দু' দুবার বের করিয়েছিলি! পথ থেকে ফিরে এসেই এই!"

সুচরিতা দুবার এরেষ্ট হয়েছিল। একবার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে তাদের খাঁচা খুলে দেওয়া হয়। আর একবার লক্ আপে রাত্র্যেক অবস্থিতি মুড়ি মুড়কি ভোগরাগ-সংকৃতা হ'য়ে।

"কেমন ক'রে ধরা দিয়েছিলে, চাঁদ, শুনি ?

"চাঁদেরা যেমন ক'রে ধরা দিয়ে আসছেন, তেমনি ক'রেই। নতুন কিছু ডিস্‌কভার করি নি !"

"অর্থাৎ—"

"অর্থাৎ হঠাৎ একদিন শোভাযাত্রা ক'রে ফুটপাতের ওপর চিত্রার্পিত টকি পুত্তলিকাবৎ থপ করে বসে পড়া গেল। এই একটা শিষ্টাসম্মত উপায়। ইচ্ছাস্থপায়া বহবো ভবন্তি—ইত্যলমতি বিস্তরেণ।" সংস্কৃতে বিদুষী সন্দেহ নেই।

"জেল থেকে একটা খবর টবর দিলিনি কেন ?"

"বলেই ত' রেখেছি, অজ্ঞাতবাস !"

"কোন্ পণে অজ্ঞাতবাস বরণ করা হ'য়েছিল ?"

"প্রাণপণে।"

"না পাশার দানে ?"

"পাশার দানে সময় সময় প্রাণও পণ রাখতে হয়, চরি। পাশার দানইত' ফেলে যাচ্ছি এদ্দিন। কখন সখটুকু, কখন খেয়ালটুকু পণ রেখেই খেলে গেছি। এবার শক্ত পণ। অজ্ঞাতবাসে কঙ্কবেশী যুধিষ্ঠিরের কপালে পাশার ঘায়ে রক্ত বেরিয়েছিল। তোর সিঁতিতেও দেবতাদের পাশার দানে রক্ত ফুটে বেরিয়েছিল—মাঠে সেই রাখী বন্ধনের দিন। আমি কাগজে ছবি দেখেছিলুম।"

"কাগজে ছবি উঠেছিল, তবেই দেখছিস, আমি তোর মতন অজ্ঞাতবাস টাস করিনি। আমার সব সদর সই।"

"সত্যি সব ?"—সুজাতার এ প্রশ্নটায় আর হাল্‌কা সুর ছিল না।

সুচরিতা একটু যেন সলজ্জ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিল। হাসিয়া বলিল—

"হাঁ, সব নাত' কি? আমার তোর মত সদর অন্দর নেই। জেলে গেলি, ছ' ছটা উইক কাটিয়ে এলি,—এটাও আবার আমাকে লুকোতে হ'ল?"

"গঙ্গার বুকে মিথ্যে বলিস্‌নি চরি, তোরই বা কিচ্ছু লুকোবার হয় নি কি?"

—লেক্‌টাকে কালীগঙ্গার গর্ভে ভেবে নিতে তেমন বাধ্‌বে না নিশ্চয়ই।

"বৃহৎ কাষ্ঠে দোষ নেই, যদিইবা মিথ্যে দু'একটা মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে থাকে! তবে, তোকে আবার কি লুকোতে গেলুম? লুকোবার মতন হ'য়েছেই বা কি?"

সুজাতা তখন একটুখানি আন্‌মনা হইয়া পড়িয়াছিল কি? আর কোন এক সাঁঝের বাঁচের কথা মনে পড়ে গিছলো না ত? সাঁঝের বাঁচ ত' অনেকেই খেলেছে তারা! কিন্তু বুকের রক্তের দপদপানির বৈঠা ফেলে?

"তা তুই-ই জানিস ভাই।"—ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বল্‌ল।

"তোর সেই মাণিকপুর চিত্রকূটের ডেস্‌প্যাচগুলো যেন কেমন কেমন।"—পুনশ্চ বল্‌ল।

"কেমন কেমন আবার? তুমি মাইক্রোসকোপ লাগিয়ে লাইনের ভেতরে ভেতরে আর কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলেছিলে বুঝি, সাদা কালিতে লেখা?

"মাইক্রোসকোপে কুলোয় নি, ক্রেসকোগ্রাফ, রেজোনান্স রেকর্ডারের দরকার হয়েছিল। নোণা জলে লেখা।"

"সার জগদীশের কাজটা তাঁর পরেও চল্‌বে, এইবার আশা হচ্ছে।"

"যদ্দিন লজ্জাবতী লতাটতা থাক্‌বে, তদ্দিন নেহাৎ আনাড়ীরও ওরকমধারা কাজের তাগিদ থেকে যাবে "—'লজ্জাবতী লতা' বল্‌বার সময় সে মুখ তুলে চরিতার পানে চেয়েছিল! সত্যই, লজ্জাবতীর পাতার মতন তার চোখের পাতা নুয়ে পড়েছিল বুঝি! আর সুজাতার নিজের? সেও চোরের ওপর বাটপাড়ী কর্‌ছিল না ত?

"মাণিকপুর চিত্রকূট অঞ্চলে গাছপালা সব শক্ত প্রাণী। লজ্জাবতী টতী ওদিকে চোখে পড়েনি, জতি। তুই আমার ডেস্‌প্যাচগুলো জাল করিছিস্—ও মাই সুইট্‌ ইন্‌টারপোলেটর্‌!"

"না, ও মাই ট্রু ইন্‌টার্‌প্রেটর্‌!"

"ইস্—"

"ইস্‌ নাত' কি! আমি ছটা উইক্‌ একটা নতুন সায়েন্স শিখে এসেছি, জানিস্‌? ক্লেয়ারভয়ান্স। সুব্রত বাবুকে তোর খুব ভাল লেগেছিল, না চরি?"

একেবার পয়েণ্টব্ল্যাঙ্ক, উদ্যত, উদ্ধত প্রশ্ন।

চরিতার মুখখানা একেবারে রাঙা হ'য়ে গেছে। কিন্তু সুজাতা তখন সেদিকে চেয়ে ছিল না। প্রশ্ন ক'রেই মুখখানা তার ফিরিয়ে ঐ পাম্‌গ্রোভের ভেতর চীনে ফানুস্‌টার পানে তাকিয়ে ছিল। বোধ হয়, ঝাড়া দু'মিনিট তাদের মুখে আর কথাটি নেই। যেন দুটো গ্রোভের ভেতরে লুকোনো দুটো নীড়। কেউ কাকেও দেখতে দেয় নি। হঠাৎ এক সাঁঝের বেলা নীড়ের পাখী দুটো এক সঙ্গে তাদের মাথা দুটি তুলেছিল। আর, এ ভেবে ছিল, ও বুঝি তাকে দেখে ফেলেছে! সত্যিই কি দেখ্‌তে পেয়েছে? দিনকাণা ওরা, রাতে ওদের চোখ যে জ্বলে!

জেলে যেদিন অনশনব্রতী সুপ্রিয়কে সুচরিতা বুকে জড়িয়ে ধরে,

তখন নিমেষের তরে তার চোখ দুটো সুব্রতর পানে গিয়েছিল, আর তখুনি আবার নীচু হ'য়ে প'ড়েছিল। মুখখানা ঈষৎ রাঙাও হ'য়েছিল তার। সুজাতা ঠিক পেছনে কি পাশেই ছিল। সে সেটা দেখেনি? সুচরিতার মাণিকপুর চিত্রকূট ডেস্‌প্যাচ এর ওপর ভারি সংক্ষিপ্ত, কিন্তু প্রাঞ্জল হয় ত' ঐ সেদিনকার নির্ব্বাক্ ভাষ্যটুকু! বলা বাহুল্য, সুচরিতা সেই মাণিকপুর থেকে সুজাতাকে খানকয়েক লম্বা লম্বা চিঠি লিখেছিল। অসময়ে নূতন সঙ্গী সুব্রত বাবুর কথা অবশ্য তাতে খুবই থাকৃত। মাণিকপুরে ডাক বাংলোর সেই প্রথম রাত্রি; সুব্রতবাবুকে তার রান্না খাওয়ানো; চিত্রকূট, হনুমানধারা, ভরতকূপের সব বিবরণ; সুব্রতবাবুর সাহস ও বীরত্ব;—এ সবের চিত্র আঁকিতে সুচরিতা তার তুলি ফিঁকে রংয়ে ডোবোয় নি নিশ্চয়। সেই দু'একটা মিষ্টি "সাইড ভিউজ"—হনুমানধারার ওপর তাদের অচ্ছোদ আবিষ্কার—এ সব সুচরিতা তার তুলিতে ফলিয়ে তুল্‌তে নিপুণিকা হ'য়েছিল। শুধু কি নিপুণিকা? হয়ত' ছবি গুলোতে এমন এক একটা রেখাপাতের আভাষ, এমন একটা রং ও ছায়ার সমাবেশের ইঙ্গিত সে ক'রে গেছে, যাতে তাকে কোন প্রথমাস্বাদিত-পূর্ব্বরাগা মহাশ্বেতা কি কাদম্বরীর নর্ম্মসখী চিত্রলেখা ব'লেই সন্দেহ হ'লে হতে পারে। তার ওপর, সুজাতার বোধ হয় সন্দিগ্ধ মন!

অবশ্য, সুব্রতবাবুর ওপর কৃতজ্ঞ হবার হেতু তাদের যথেষ্ট ছিল। লোকটিও দেখা যাচ্ছে সব দিক্ দিয়ে বেশ। কাজেই, তার কথা সুচরিতার চিঠিগুলোতে বেশী ক'রে থাক্‌লেই সে যে আশ্চর্য্য হবে এমন না। কথাগুলোর পেছনে একটা সহজ সহৃদয়তা থাকবে, এটাও স্বাভাবিক। কিন্তু সুজাতা জানিত—তার দাদা সমরেন্দ্র ও

আর সুচরিতা বরাবর পরস্পরকে পছন্দই করিয়া আসিতেছে। সমরেন্দ্রর সঙ্গ তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষার, আনন্দের অনেক দিন থেকেই ত' দেখা গিয়াছে। দাদা তার যখন কলেজে পড়িত, তখন সুচরিতা অবশ্য বালিকা। কিন্তু সে সমরদাকে পেলে আর কাকেও চাইত না। তারপর দাদা ডেপুটি হ'য়ে মফঃস্বলে বেরিয়ে গেলেন। যখনই ছুটি ছাটাতে কল্‌কাতা আস্‌তেন, তখনই সুচরিতা ছায়ার মতন সঙ্গে তাঁর গেলে থাক্‌ত। রবিবাবুর গান টান গেয়ে শোনাত—এই লেকে রোয়িং কর্ত্তে আস্‌ত—বোটানিকাল্‌ গার্ডেনে যেত'—গড়ের মাঠে, ভিক্‌টোরিয়া মেমোরিয়ালে মোটরে ক'রে বেড়াতে যেত'। সব রকমে কত না মিল দেখা যেত তাদের। বরাবর "সমরদা" ব'লেই সে ডেকে এসেছে। আজকাল, তা বুঝি সে বলে না। সুজাতার বাবা মা—এঁরাও সুচরিতাকে খুবই ভালবাসেন। সুচরিতাকে পুত্রবধূরূপে পেলে বাবা কত সুখী হবেন,—এ কথাও সে বাবা আর কাকাবাবুর (মৃত্যুঞ্জয়) মধ্যে হ'তেও শুনেছে, আড়ালে দাঁড়িয়ে। দাদা তার স্পষ্ট করে কিছু বলেন নি—কিন্তু তিনিও সেটা নিশ্চয়ই আশা করেন, অন্তরের সঙ্গে কামনা করেন। এদ্দিন বোধ হয় তিনি ঐ জন্যই বে করেন নি, কর্‌তে চান নি। সেই সমরদা তার মাণিকপুরে ছিলেন। তাঁরও অনেক কথাই সুচরিতার চিঠি গুলোতে আছে। কিন্তু সুব্রতবাবুর সম্বন্ধে কথাগুলো যেন বড় হ'য়ে, উঁচু হ'য়ে আর সব কথার ওপর তার ছায়া ফেলেছে! নতুন লোক, অসময়ের বন্ধু ব'লেই কি এতটা? সুজাতা মনে মনে বোধ হয় মাথা নাড়িল।

এই "পোড়া" মুভ্‌মেণ্টটা এসেই কি সব ওলট্‌ পালট্‌ ক'রে দিয়ে গেল? সুচরিতাকে তার দাদার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল? তাকে

সুব্রত বাবুর পাশে এনে থুয়ে গেল? কিন্তু—শুধু কি তাকেই? কে জানে!

হ'তে পারে—মুভমেণ্ট অনেক কিছু ভেঙ্গেছে গ'ড়েছে, আবার ভাঙ্গবে গ'ড়বে! কিন্তু মাণিকপুরে যখন তারা, তখন মুভমেণ্ট কোথা ছিল? তখনই ত' খদ্দরপরা সুব্রতবাবুর গলাটাই এগিয়ে আস্ছে দেখছি সুচরিতার গোপনে গাঁথা মালাটি পর্বার জন্যে? দাদার হ্যাট্ কোট নেক্টাইএর মানানসই হ'য়েই সে মালাটা গাঁথা হচ্ছিল ব'লেই ত' জান্তুম।

"সত্যিই চরি, সুব্রতবাবুকে ভাল লাগবারই কথা। তাঁদের দেশে দাদা বদলি হ'য়েছেন। তাঁর চিঠিতে সুব্রতবাবুর উচ্চ সুখ্যাতিই গেয়েছেন—যদিও তাঁকে ছমাস জেলে পাঠাতে হ'য়েছে তাঁকেই। ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটও সুব্রতবাবুকে শ্রদ্ধা করেন শুনেছি। দাদা তাঁকে "এ" ক্লাশ প্রিজনার হ'য়ে থাক্বার সুযোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু সুব্রত বাবু সে সুযোগ নেন নি—"সি" ক্লাসেই ছিলেন। আর, তাঁর দেশের বন্যের সময় আমার জানা ক'টি মেয়ে গিছল সে অঞ্চলে ওয়ার্ক কর্তে। তাদের দু' একজনের মুখে যা শুনেছি—তাতে ত' মনে হয় তিনি দেবতা। তাঁর প্রকাণ্ড সম্পত্তি তিনি সবই গরীবদের জন্যে লেখা-পড়া ক'রে দিয়েছেন। নিজের জন্যে কিচ্ছু রাখেন নি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সেবা-কেন্দ্রগুলোতে চমৎকার কাজ হ'চ্ছে। দেশের "ম্যাস"কে গ'ড়ে যদি তুল্তে হয় ত', অম্নি ক'রেই কর্তে হবে। সুব্রতবাবুর মাও শুনেছি দেবী। দেশের যত গরীব দুঃখী, সব তাঁর আপন পেটের ছেলে। এই ফ্যামিন্ রিলিফ, পল্লীগঠন ইত্যাদি কাজে তাঁরা মায়ে পুতে অজস্র টাকা খরচ ক'রেছেন। এব্রতে তাঁরা সর্ব্বস্ব দক্ষিণা ক'রেছেন।"

সুজাতা বেশ গদগদ কণ্ঠে কথা কটা ক'য়ে গেল। সমস্ত প্রাণ ঢেলে সে যে সুব্রতবাবুকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে, তাতে সুচরিতার সন্দেহ রৈল না।

"চিঠি প'ড়ে, আর কাণে শুনেই তুই যে ভাবে গদগদ হ'য়েছিস জতি! মস্ত বড় এডমায়ারার! তবু ত' তারে এখনও চোখে দেখিস্ নি!"—সুচরিতা তখন তার লজ্জাটা সাম্‌লে নিয়েছিল। হেসেই বল্‌ল।

সুজাতার মুখে সুব্রতর নূতন আর দিকের পরিচয় তারও অন্তর শ্রদ্ধায় নত ক'রে দিয়েছিল, আনন্দে পুলকিত ক'রেছিল।

"হাঁ, ভাই, বাঁশী শুনেই এই। চোখে দেখ্‌লে না জানি কি হতুম্! হয়ত' রাই উন্মাদিনী টুন্মাদিনী একটা কিছু! তোর নমুনোটাত' সুবিধের নয়, চরি।"—সেও হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্‌ল বটে, কিন্তু ভেতরের ভাবটা বোধকরি হাল্‌কা ছিল না।

"চোখেই বা দেখিস্ নি কি ক'রে? সেই বোধনের দিন তুইও তো বরণ-ডালা হাতে নিয়ে আমার পাছে পাছে ছিলি। সুব্রতবাবুকে দেখিস্ নি?"

"ঠিক্ বল্‌ব কেমন ক'রে? সেখানে অনেকেই ত' ছিলেন! কেমন ক'রে বুঝ্‌ব তার মধ্যে কোন্‌টি তোমার—। জান্‌লে না হয় নতুন ক'রে আর একটা বরণডালা সাজিয়ে নিয়ে যেতুম্।"—খিল্ খিল্ ক'রে হাসিল তারা তুজনেই। চরিতা সুজাতার গাল টিপিয়া দিল।

"ভারি দুষ্টু তুই জতি! ছেরক্কালই একরকম যাবে তোর!"

"আমার যে এই রকমই যাবে তাতে সন্দেহ নেই।"—মুখে হাসি তার, কিন্তু সুরটা একটু ধরা ধরা।

"সেই যে দাদা তাঁর কাঁধটা ধ'রে দাঁড়িয়েছিল।"

"ও—তোর পছন্দর তারিফ ক'রতেই হয়, ভাই।"

"আবার দুষ্টুমি!"—

সুচরিতা তখন সুজাতার কোলের পর মাথাটা রেখে শুয়ে প'ড়েছিল। ত্রয়োদশীর চাঁদ তখন আর পাম্‌গ্রোভের পাতার ভেতর চাইনিজ ফানুস হ'য়ে ছিল না। বেশ ঝির্ ঝিরে হাওয়া উঠেছিল। লেকের বুকে নাচওয়ালীরা তখন জরির ওড়না গায়ে জলদ ঠংরী তালেই নাচ্‌তে সুরু ক'রেছিল। জলি বোটটা খাসা দুলে দুলে তাল দিচ্ছিল তাদের চটুল নূপুরের সঙ্গে সঙ্গে, ছন্দে ছন্দে। ছোট দ্বীপটার কাছাকাছি এসেছিল, তাদের বোটটা তখন। সুচরিতার মুখ খানায় চাঁদের আলো প'ড়েছিল। সুজাতার মুখের'পর প'ড়েছিল একটা পামের ছায়া। সুচরিতার বুকের 'পরে সরু সোণার হার গাছটা ভঙ্গী করে হেলে প'ড়েছিল, যেন চাঁদেরই কিরণ খানিকটে জ'মে একটা অনঙ্গ-মঞ্জরী হার হ'য়ে র'য়েছে! হাওয়ায় চঞ্চল বুকের কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে সেটা যেন লুকোচুরি খেল্‌ছিল। সুজাতার একরাশ অসামাল চুল নিয়ে চাঁদিনী রাত আঁচড়ে বিনিয়ে দিতে ব'সেছিল তার ভিজে দুব্বোঘাসের বাসমাখানো চঞ্চল, লীলাপর আঙ্গুলগুলো দিয়ে। দু একটা যুথহারা কুন্তলভুজগী তার, সুচরিতার বুকের ওপর এসে প'ড়ে, সরু সোণার হারটাকে ছুঁয়ে দেখছিল, সেও বুকের কাপড়ের ভাঁজের ভেতর থেকে ফণা তুলে সাড়া দেয় কিনা!

অনেকক্ষণ তারা কথাটি কয়নি।

"সমরদা এবার পূজোয় বাড়ী এলেন না, জতি?"

"না দার্জ্জিলিং গেছেন, চেঞ্জে। মফঃস্বলে তাঁর শরীরটা তত সুবিধে ছিল না।"

সুজাতা এটা লক্ষ্য করিতে ভোলেনি, যে, সুচরিতা সমরেন্দ্রকে

"সমরদা" বলিল। তাই সে ব'লত আগে। ইদানীং কিছুদিন বোধহয় বলা বন্ধ ক'রেছিল। অন্ততঃ সেত' কৈ ব'লতে শোনেনি।

"জ্যোছনা গিলেই পেট ভরাবি, চরি, বাড়ী যেতে হবে না? আটটা যে বাজে।"—চরিতার হাতখানা নিজের হাতে তুলে রিষ্টওয়াচ-টার দিকে সে একবার চেয়ে নিল।

"সত্যইত' রাত হ'য়ে গেছে। চল্ বাড়ী যাই। দাদা একলাটি আছে। তাকে গান শুনতে হবে। তুইও যাবি ত'?"

বোট ঘাটে বাঁধিয়া তারা এভিনিউগুলোর ভিতর দিয়া হাত ধরা-ধরি করিয়া চলিল। তুজনেই যেন কেমন ভেতরে সেঁধিয়ে প'ড়েছে তখন। কথাবার্ত্তা আর বিশেষ কিছু হ'লনা।

সুপ্রিয় বালীগঞ্জের বাড়ীতে আসিয়াছে। জেলে বিজয়ার দিন অপরাজিতার রাখী বেঁধেই সুপ্রিয় মুক্তি লাভ করে। তার তিন মাস শেষ হ'য়েছিল। মৃত্যুঞ্জয় বাবু, তাঁর পত্নী, সুচরিতা গিয়ে তাকে জেল থেকে নিয়ে আসেন। সুজাতা সেদিন আর যায়নি। হাঙ্গার ষ্ট্রাইকের পর ভারি তুর্ব্বল সে তখন। মৃত্যুঞ্জয় বাবুদের সঙ্গে সুব্রতর জেলেই দেখা হয়। তাঁরা—কর্ত্তা গিন্নী তুজনেই—বিশেষ ক'রে অনুরোধ করেন সুব্রতকে একবার তাঁদের জব্বলপুরের বাড়ী যেতে। সুচরিতা তখন অন্যদিকে চেয়েছিল—কিন্তু তার আঙ্গুল তুটো ভারি ব্যস্ত ছিল তখন আঁচলের খুঁটের কি একটা অজানা সমস্যাগ্রন্থি সমাধানে!

তার আগে অবশ্য সুব্রতর সংক্ষিপ্ত কুশল-বার্ত্তা-প্রশ্নের উত্তরটা অতি সংক্ষেপেই সে সারিয়া রাখিয়াছিল।

সেই হাস্যময়ী, পরিহাস-রসিকা তরুণী আজ এমনধারা "লজ্জাবতী" হ'লেন কি ক'রে? পরণে তার খদ্দরের সাড়ী। মৃত্যুঞ্জয়বাবু আর তাঁর পত্নীও খদ্দর প'রেছেন যে!

আন্দোলনের বন্যেয় প'ড়ে সুচরিতার বিলাসভূষা ত' দেখ্‌ছি ভেসে গেছে। তার তরুণ অন্তরের যে লীলাবিলাসটা সদাই মধুর হাসি আর রসাল' পরিহাসে ফুটে উঠ্‌ত, সেটাও ভেসে যায়নি ত'?—সুব্রত নিজেকে প্রশ্ন করিল।

এই সবে দিন দুত্তিন জেল থে'কে সুপ্রিয় বাড়ী এসেছে। এখনও খুব দুর্ব্বল সে। বেড়াতে টেড়াতে পারে না। দোতলার দক্ষিণে খোলা ঝুল-বারান্দা-ওয়ালা ঘরটিতে তার শুয়ে ব'সে থাকে। মৃত্যুঞ্জয় বাবু বাড়ীর দুর্গ-পরিখা নতুন জলে ভর্‌তি হ'য়েছে। দুর্গদ্বার আজ অবারিত। দুর্গের দেউলে জাতীয় পতাকা না উঠক্‌, ভেতরে অনেক কিছু পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। সুপ্রিয় আর সুচরিতা দুজনেই স্রোতে ঝাঁপিয়ে প'ড়েছিল—পরিবর্ত্তন না হ'য়ে যায় না। বিদেশী সৌখীনতা আর সহজে সে দুর্গে ছাড়পত্র পাচ্ছে না। সুপ্রিয় আর সুচরিতা, দুজনেরই কড়া পাহারা। চরকার ঘর্‌ঘর্‌ বাড়ীর অন্দর মুখর ক'রে রেখেছে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু যতটা পারেন, সেই ঘর্‌ঘরানির সঙ্গে গ'ড় দিয়েছেন।

পাশের বাড়ীতে পরিবর্ত্তনটা হ'য়েছে অন্য রকমের। সুজাতা আর তার ছোট ভাই পরিমল দুজনেই স্রোতের জলে সাঁতার কাট্‌তে বেরিয়ে প'ড়েছে। কিন্তু তাদের দুর্গের পরিখাগুলোতে তারা নতুন বন্যে ডেকে আন্‌তে পারেনি। ডেপুটি পিতা ও পুত্র—স্লুইস্‌ গেট্‌গুলো খুব জব্দ ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। ভাই বোন্‌ সাঁতার কাট্‌তে যায়—যখন ফিরে আসে, তখন খিড়্‌কীর "উইকেট্‌" গেট্‌ দিয়ে তারা আজও ভেতরে ঢুক্‌তে পাচ্ছে বটে, কিন্তু আর ক'দ্দিন পাবে, তা বলা যায় না। এক দিন হয় ত' ফিরে দেখ্‌বে—খিড়কীটেও বন্ধ হ'য়ে গেছে। আপন হ'তেও যারা আপনার, তারাও যাবে একদিন পর হ'য়ে—স্নেহের সামগ্রী

একদিন হ'য়ে পড়্‌বে আতঙ্কের বস্তু! যারা কিন্তু একবার বান তুফানে সাঁতার কেটে বেরিয়েছে, তাদের পক্ষে ঘরের সেই চৌবাচ্চাটাতে "সাঁতার" কেটে তৃপ্ত হওয়া, সুস্থির হওয়া শক্তই হবে! পরিমল এবারে ত' জেলের রাজটীকে প'রে আসেনি। কাজেই সে হয়ত' প্রায়শ্চিত্ত কর্‌লে "ব্যবহার্য্য" হ'তে পারে। কিন্তু সুজাতা? সে যে বড্ড বাড়াবাড়ি ক'রে ফেলেছে! তার শোধ্‌রাবার লক্ষণ ত' কৈ দেখা যাচ্ছে না। মিঃ চ্যাটার্জ্জি, সি, আই, ই, এবং শ্রীমান্ সমরেন্দ্র ফাঁপরে পড়িয়াছেন বৈ কি!

সুচরিতা এবং সুজাতা অনেকক্ষণ ধ'রে সুপ্রিয়র ঘরে গানটান গাইল। আন্দোলন সম্বন্ধে, জেল লাইফ্, সুব্রতবাবু সম্বন্ধে, এমন কি, মিঃ সমরেন্দ্র চ্যাটার্জ্জি সম্বন্ধেও, অনেক কথাবার্ত্তা হইল।

সুজাতা বাড়ী গেছে। তখন রাত্রি সাড়ে দশটা এগারটা হবে। মা ছিলেন সুপ্রিয়র ঘরে। সুচরিতা বাবার খাটটায় ব'সে তাঁর পায়ে আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল। নৈলে তাঁর ঘুমটি হয় না। তাদের পাড়াটা একেবারে বড় রাস্তা টাস্তার ধারে নয়। মটরের দৌরাত্ম্যিটে কম ছিল।

"মা চরিতা, তোর শরীরটেও ত' বেশ ভাল ক'রে সারেনি, সেই অসুখের পর থেকে। দিন কতক চেঞ্জে যাবি? দার্জ্জিলিং? আজ সমরের চিঠি পেলুম্। সে বিশেষ ক'রে লিখেছে। জ্ঞান্‌দাও খুব ক'রে বল্‌ছিল—তুই সাথে যাস্।" জ্ঞানদা হ'চ্ছেন মিঃ জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি সি, আই, ই।

"আমার শরীর ত' সেরে গেছে বাবা। তুমি খারাপ কি দেখ্‌ছ? দাদা আর তোমাদের থুয়ে আমার কোথাও যেতে ইচ্ছে নেই। দাদাকে

আমি প'ড়ে শুনুই, গানটান গেয়ে শুনুই আর—বাবা—মেয়েটি নৈলে তোমার বুঝি চলে ?"

"তা না হয় জতি এসে সুপ্রিয়র দেখাশুনো করত। আর সে ত' ক'রেই থাকে। মেয়েটি নৈলে আমার চলে না, সত্যি মা। কিন্তু মেয়ের আমার মুখখানা শুক্‌নো দেখ লে সে আমার আরও বেশী অচল হয়!"

সুচরিতা কিচ্ছু বল্‌ল না উত্তরে। শুধু মুখখানা তার বাবার পায়ের ওপর আদর ক'রে একবার রাখল।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একটু পরে আবার বলিলেন—

"আমিও তা ভেবেছি, চরিতা। ঠিক এ সময় তোমার আর কোথাও গেলে সুপ্রিয়রও বড্ড ফাঁকা ফাঁকা ঠেক্‌বে! জতি আর তুমি দু'জনা মিলে তাকে চাঙ্গা ক'রে তোল দিকিন্। নিজেকে একেবারে মেরে ফেলেছিল,—পাগল!"

সুচরিতা বাবাকে এক গ্লাস জল দিল। পান ছেঁচে এনে দিল।

"তা হ'লে, এখানকার অবস্থা জানিয়ে সমরকে লিখে দেওয়া যাক্। আমরা ত' দিন কতক বাদে—সুপ্রিয় একটুখানি সার্‌লেই—জব্বলপুর যাচ্ছি। বরং, লিখে দি—বড়দিনের বন্ধটা সমর যেন জব্বলপুরে কাটিয়ে আসে। ভাল কথা, সুব্রতবাবু জেল থেকে বেরুচ্ছেন কবে?"

"তাত' ঠিক জানিনে, বাবা। দাদার মুখে শুনেছি, ছ'মাস তাঁর জেল হ'য়েছিল। বোধ হয় বেরুতে এখনও দেরী আছে।"

"বড়দিনের সময় তাঁকেও একবার ইন্‌ভাইট্ কর্‌লে হয় না? ভারি চমৎকার ছেলেটি।"

সুচরিতা উত্তর দিল না। জানলার ধার পানে স'রে গিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকৃল। খাসা ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্না সে রাত্তিরে। লনের ওধারে দুটো শিউলি গাছ ফোটা ফুলে ভ'রে ছিল। একটা মিষ্টি শুচি বাস বাতাস ব'য়ে আন্‌ছিল।

"তুই তাঁকে চিঠি-পত্তর দিস্‌নে? খবর টবর নেয়া ত' উচিত।"

"কার বাবা?"—যেন বাবার প্রশ্নের লক্ষিত ব্যক্তি সম্বন্ধে তার কোন সংশয় ছিল!

"সুব্রতবাবুর। তাঁর সুখ্যাতি সব্বাইকার মুখে শুন্‌তে পাই। তাঁর প্রকাণ্ড বিষয়টাও নাকি হরিশ্চন্দ্রের মতন গরীব প্রজাদিগকে দান ক'রে ফেলেছেন। জ্ঞান্‌দা বল্‌ছিলেন—তাঁর থিয়েটার রোডের মস্ত বাড়ীখানাও বেচে ফেল্‌চেন। তাঁর এটর্ণির সঙ্গে জ্ঞান্‌দার কথাবার্ত্তা হ'য়েছিল। বাড়ীখানার দাম লাখ খানেকের কম হবে না। সবই তিনি গরীবদের বিলিয়ে দিচ্ছেন। আর, সুপ্রিয় ব'ল্‌ছিল, তাঁর ভিলেজ্‌ রিকন্‌স্‌ট্রাকসনের স্কিম্‌টাও চমৎকার। তাতে নাকি সত্যিকার কাজ হবে। হচ্ছেও। সুপ্রিয় তাঁর একজন গোঁড়া এডমায়রার্‌ দেখলুম।"

এবারও সুচরিতা কিছু বলিল না। টেবিলের ওপর কতকগুলো গোলাপ টোলাপ ফুল গোছানই ছিল, সেইগুলো নতুন ক'রে গোছাতে লেগে গেল।

"মা চরিতা, দেখত' আমার কপালটা কি গরম গরম ঠেক্‌ছে আজ? ঘুম আস্‌ছে না যে।"

সত্যই, একটুখানি ছ্যাঁক্‌ ছ্যাঁক্‌ করিতেছিল মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কপালটা।

"কেন বাবা, আজ আবার কপালটা গরম হ'ল কেন? ভাবনা-টাবনা করনি বেশী? ওডিকোলন দিয়ে ধুইয়ে দেব?"

"না থাক্। ভাবনা আর কিসের মা ?"—বলিলেন বটে, কিন্তু কথাটার সুরে একটা কি যেন গোপন ছিল। সুচরিতা সেটা ধরিল।

"কেন, দাদার জন্যে আমার জন্যে ভাবনা। দাদার শরীরত' দিন দিন সবল হ'চ্ছে। আর আমিত' তোমায় ছেড়ে কোন কাজেই আর যাব না, বাবা। আমার সেই রাখীবন্ধনের দিনের পর থেকে অসুখের ঝঞ্ঝাট, দাদার হাঙ্গার্ ষ্ট্রাইকের ব্যাপার তোমার ভেতরে খুবই একটা সক্ দিয়েছে, বাবা। এখনও সাম্‌লাতে পারনি তা তুমি, নয় ?"

কতখানি স্নেহের সঙ্গে সুচরিতা বাবাকে কথা ক'টি বল্‌ল! বাবা তার আদর ক'রে একবার বুকের কাছে টেনে নিলেন।

"সত্যিই মা, সক্‌টা বেশী বেশীই হ'য়েছিল। শীগ্‌গির সেরে যাবে 'খন। তুই আর আমাকে ছেড়ে যাচ্ছিস নেত ?"

"না, বাবা, যাব না।"

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কপাল গরমের ডায়ওগ্‌নোসিস্‌টে সম্পূর্ণ বটে ত' ? আর কিছু কারণ ছিল কি ?

মা ঘরে আসিলেন। সুচরিতা গেল শুইতে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কপালটা সেদিন গরম হবার আর একটা নিগূঢ় কারণ ছিল—গৃহিণীর কাণে সে কারণটা তিনি প্রকাশ করিলেন। ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা বড় মন্দ। সর্ব্বত্রই। তাঁর নিজের লাইম্ সিমেণ্টের কারবারে বড্ড লোকসান হইতেছিল। তিনি নিজেও, নানা কারণে, সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া সুচারুরূপে ব্যবসা তাঁর চালাইতে সক্ষম হইতেছিলেন না। ফলে, তাঁর পাওনাদার হইয়া পড়িয়াছিল বিস্তর। বাজারে তাঁর ক্রেডিট্ তখন সামান্য। সেই দিনই সকালে জানদা নিজে কতক, আর কতক জামিন থাকিয়া, সবশুদ্ধ পঞ্চাশ হাজার

টাকা তাঁকে কর্জ্জ দিয়াছেন। তাতে উপস্থিত ধাক্কাটা হয়ত' সাম্‌লানো যাবে। কিন্তু কারবার বেশীর ভাগ বন্ধই রাখিতে হইবে!

সুচরিতা তার মাতামহের দিক হইতে হয়ত ভবিষ্যতে প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হইবে। একটা "হয়ত" ছিল বুঝি? যাক্, বর্ত্তমানে তাতে হাত দেবার উপায় নেই; আর উপায় থাকিলেও, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর তাতে হাত দেবার ইচ্ছা নেই।

সুচরিতা তার ঘরটিতে গিয়ে শুয়েছিল। সেটাও দখিণে খোলা, ঝুল্‌বারন্দা-ওয়ালা। সাম্‌নে লন্, তার ওদিকে বাগান। জানলা দিয়ে চাঁদের আলো তার বালিশে প'ড়েছিল। সে শুয়েছিল, কিন্তু অনেক-ক্ষণ ঘুমোয় নি। লেকের ওপর সুজাতার সেই প্রশ্নটা তাকে তখনও অস্থির কর্‌ছিল—

"সুব্রতবাবুকে তোর খুব ভাল লেগেছে, না?"

সত্যিই ভাল লেগেছে কি?—হাঁ। খুব?—হাঁ, খুবই।

কিন্তু এ খুব ভাল লাগার যেটা পূরো মানে, তার সাম্‌না-সাম্‌নি, মুখোমুখি হ'তে তার অন্তরটা যেন কেমন ধারা সঙ্কুচিত হ'চ্ছিল। অথচ, এটা সে বুঝছিল, সাম্‌না-সাম্‌নি না হ'লে আর চল্‌ছে না! সে কি সুব্রতকে ভালবেসেছে?—এ প্রশ্নটার মুখো-মুখি তাকে দাঁড়াতেই হ'চ্ছে। ওটাকে আর ঠেলে রাখার যো নেই, দেখব না ব'লে চোখ বুজলেও আর চল্‌বে না। আর, সত্যি কথা বল্‌তে—ওটাকে ঠেল্‌তে কি সে চাচ্ছে?

"না, ভালবাসি না"—এই জবাবটা পাবার জন্যেই কি তার মরম কাণ খাড়া ক'রে র'য়েছে? তাত' নয়! তবে, এ সঙ্কোচটা তার কেন?

সঙ্কোচটা তার জীবনের অতীত ক'টা বছরের যে সব আস্তে আস্তে তৈরি সংস্কার, যে সব ধীরে ধীরে ফোটা রুচি আর আশা, তাই সব

হ'তে। সমরদার সঙ্গে তার এতদিনকার সম্পর্ক! বছরের পর বছর ধ'রে সে যে পা ফেলে ফেলে সমরদার দিকেই এগিয়ে এসেছে, সব দিক্ দিয়ে। আগে তাকে দাদা ব'লে ডাকত। আজ কা'ল আর বলে না। কেন বলে না? সে প্রশ্ন সে নিজেকে কোন দিন করেনি। করার দরকার হয় নি। অনায়াস, সহজ, নিশ্চিন্ত ভাবেই সে নিজেকে সমরের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছিল—এর মানে কি, এর নিদান কোথা—এসব জেরা সে কোন দিন তোলে নি। সমরকে কি সে বে করবে?—এ প্রশ্ন যেমন এদ্দিন তাকে কেউ কোন দিন করে নি, তেম্‌নি সে নিজেও নিজেকে কোনদিন করেনি। অথচ, প্রশ্নটা করলে সে আশ্চর্য্য হ'ত না, অবাক্ হত না, নিশ্চয়ই। রাগও বোধ হয় করত না। সমর হয়ত' সেটা আশা করে, আত্মীয়স্বজনেরা কামনা করে,—এও বোধহয় তার অজানা ছিলনা। সমরকেই কি তবে সে ভালবেসে এসেছে?

এদ্দিন এ প্রশ্ন করলে, সে কি উত্তর দিত, তা সে জানে না। হয়ত, শুনে অবাক্ হ'য়েই থাকৃত। কি জবাব দেবে? একবার হয়ত মন তার বল্‌ত—হাঁ, ভালবাসি বৈকি! তখুনি আবার হয়ত' মাথা নেড়ে ব'ল্‌ত—কে জানে বাপু, ভালবাসা আবার কাকে বলে!

কিন্তু, আজ সুব্রত তার জীবনে এসে প'ড়ে, জাতীয় আন্দোলন তার এতদিনকার ভাব, সংস্কার, রুচি, অভ্যাস সব ওলট্ পালোট্ ক'রে দিয়ে, তাকে তার এতদিনকার অভ্যস্ত জীবনের যা কিছু সব শক্ত খুঁটি, সে সব থেকে দূরে—বহুদূরে সরিয়ে এনেছে। এখন নতুন যায়গায়, নতুন পতাকার তলে এসে দাঁড়িয়েছে। এ পতাকার তলে সুব্রত বুঝি বা তার বড়ই কাছে—পাশেই। আর, সমরেন্দ্র—সমরদা—? দূরে—ক্রমেই দূরে!

আর বোধহয়, এই ওলট পালট, ছাড়াছাড়ি কাছাকাছির ভেতর দিয়েই সে ঠিক বুঝেছে—বুঝতে পারছে—সুব্রত তার জীবনে এসে প'ড়েছে কি ভাবে! তাকে শুধু ভাললাগে, না, তাকে সে ভালবাসে?

ত্রয়োদশ

মাস তু'তিন পরে। জব্বলপুর। ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট অঞ্চলে একটা উঁচু যায়গায় সুচরিতাদের বাংলো। ঠিক পাহাড় নয়। জব্বলপুরের যে অঞ্চলটায় বড় বড় রাস্তার তুপাশে কম্পাউণ্ড-ঘেরা সুন্দর সুন্দর বাংলো গুলো, সে অঞ্চলটা সত্যিই ভারি চমৎকার। সায়েব সুবোরাই বেশী থাকে। দেশী ভদ্রলোকদেরও বাংলো তুদশখানা আছে। সুচরিতাদের বাংলোটা বেশ বড়—মস্ত বড় কম্পাউণ্ডে লন্, বাগিচা, মায় একটা পুকুরও আছে। পুকুরে একখানা ছোট বোটও ছিল। রোয়িংএ তাদের ভারি নেশা। মটর গ্যারাজে মটর ছিল। আউট্ হাউসে মালীরা চাকর বাকর সব থাকিত। ফটকের পাশে দারোয়ানদের ঘর। বড় রাস্তা থেকে বাড়ীটে তু'রশি দূরে হবে। লাল সুর্‌কির রাস্তা, তুধারে ইঁটের কেয়ারি করা। তিন হাত অন্তর অন্তর ফুলের গাছ। বাংলোটার ঠিক সাম্‌নেই একটা ঝর্‌ণাও ছিল। পাশে কালো কালো পাথর-ওয়ালা পাহাড় থেকে একটা ঝর্‌ণা নেমে এসেছে। সেই নৈসর্গিক ঝর্‌ণাটার জলই কৌশলে কৃত্রিম ঝর্‌ণা যেন ওপর পানে কুল্‌কুচো ক'রে দিচ্ছে। পাহাড়টা পাশে থাকায়, বাংলোটার প্রাকৃতিক সংস্থান অপূর্ব্ব হইয়াছিল। কাটুনির মতন ঢেউখেলানো, যেন কারুর হাতে তৈরি, পাহাড় এগুলো নয়। পাহাড়টায় ওঠবার খানিকদূর পর্য্যন্ত সিঁড়ি ক'রে দেওয়া ছিল। ঠিক মাথার ওপর নয়, মাঝামাঝি, ক'টা বড় বড় গাছের ছায়ায়, একখানা মস্ত বড় আসনের মতন পাথরের স্ল্যাব প'ড়েছিল। সেখানে বস্‌লে, চারধারের ভিউটা যে কি চমৎকার লাগত, তা সুচরিতা আর সুপ্রিয়ই জানে। তাদের এই

জব্বলপুরের বাড়ীখানাকে তারা সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবাস্‌ত।

বিকেল বেলা সাম্‌নের বারান্দাটায় বসিয়া তাঁরা সব চা পান করিতেছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু, তাঁর পত্নী, সুচরিতা, সুপ্রিয়। মৃত্যুঞ্জয়বাবু একখানা বেতের ইজিচেয়ারে এলিয়ে প'ড়েছিলেন। তাঁর শরীরের স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়নি। সন্ধ্যার পর কপালটা বোধ হয় নিত্যিই গরম হয়। মানসিক স্বাস্থ্যও সম্ভবতঃ তাঁর নেই।

ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা আরও শোচনীয়। বাজারে ক্রেডিট্‌ একেবারে নিল্‌। পাওনাদারের পাল শুধু যে বাড়িয়াই চলিয়াছে এমন নয়, ভীলরুলের মতন ছাঁকিয়া ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। ফ্যাক্‌টরি প্রভৃতি বন্ধ। লোকসান দিয়ে আর কত চালানো যায়? আয়ের ঘরে শূন্য। তার ওপর, উপস্থিত ব্যয়টাও বড় কম নয়। জ্ঞানদার কাছ থেকে যে পঞ্চাশ হাজার টাকা নেওয়া হ'য়েছিল, তাত' ক্ষুধার্ত্ত নেকড়ে বাঘের দলের মুখে একটা ভেঁড়ার ঠ্যাং ফেলে দেবার মতন। এক দণ্ডেই তারা সে ঠ্যাংটা ছিঁড়ে খুঁড়ে খেয়ে ফেলেছিল। তখুনি দ্বিগুণ উৎসাহে তারা আবার পেছু নিয়েছে! দেনা লাখখানেকের ওপর! তাঁর বালীগঞ্জের আর জব্বলপুরের বাড়ী দুখানা বেচলেও লাখ টাকা হবে না। মর্টগেজ দিলে ত' নয়ই। আর এ মন্দার বাজারে কিন্‌ছেই বা কে? এটর্ণিকে দিয়ে একটুখানি চেষ্টাও হ'য়েছিল সে পক্ষে; কিন্তু এটর্ণির শেষ চিঠিটা আশাপ্রদ নয়।

সুপ্রিয় আর প্রেসিডেন্সিতে পড়ে না। মায়ের একান্ত ইচ্ছায় জব্বলপুরেই রবার্টসন কলেজে সে ভর্ত্তি হ'য়েছে। সুচরিতার পড়াশুনো খতম। মটর গ্যারেজেই প্রায় থাকৃত। সোফারটা দিন কতক ছুটি নিয়ে বাড়ী গেছে। সুপ্রিয় বাইকে ক'রেই কালেজে যাওয়া আসা

কর্‌ত। তেমন বেশী দূরও নয়। কালে ভদ্রে একদিন মটরে ক'রে মৃত্যুঞ্জয়বাবুরা বেড়াতে বেরুতেন। তখন সুপ্রিয়ই হত' ড্রাইভার্।

মৃত্যুঞ্জয় বাবু ছেলে মেয়েদের কাছে অবস্থা-বৈগুণ্যের কথা কইতেন না। তারা সঠিক সংবাদ না জানিলেও, এটা অবশ্য বেশই বুঝিয়াছিল যে, তাদের তখন একাদশ বৃহস্পতির দশা যাইতেছে না। বাবার রোজ রোজ কপাল গরম হবার নিগূঢ় কারণটা এতদিনে সুচরিতারও অবিদিত ছিল না। দাদার শরীরত' সেরেই গেছে। আর, উপস্থিত তখন তাদের শ্রীঘরে যাবারও কোন সম্ভাবনা দেখা যাইতেছিল না। কাজেই, ওসব দিক্ দিয়ে, বাবা মা নিশ্চিন্ত হ'তে পেরেছেন বৈকি। অথচ, বাবার রোজ রোজ কপালটা গরম হয়! ডাক্তাররা দেখেছিলেন, কিন্তু কৈ তাঁরা ত' এটাকে রোগপীড়া ব'লে সাব্যস্ত করেন নি। আর, সব চাইতে সুচরিতাকে কষ্ট দিত এই চিন্তা—বাবার সেই সদানন্দ, নিত্য হাস্যপ্রফুল্ল ভাব আর যেন মোটেই নেই। জোর ক'রে তিনি একটু আধটু হাস্‌তে চেষ্টা কর্‌তেন বটে, কিন্তু সেটা হ'ত নেহাৎই জোর ক'রে চেষ্টা। সে কিন্তু প্রাণপণে বাবাকে মাকে তার সেবা যত্ন কর্‌ত। নানান্ কৌশলে, উপায়ে তাঁদের মন যাতে একটা "ডার্ক ব্রুডিং" থেকে মুক্তি পায়, তা সে কর্‌ত। তাতে কতক ফল যে না হ'ত এমন নয়। কিন্তু তবু—বাবার তার বুকের ওপর, মাথার ওপর একটা বিষম বোঝা চেপেই থাকৃত। সে তা বুঝ্‌ত।

জ্ঞান্‌দার কাছ থেকে যে টাকাটা তিনি নিয়ে ছিলেন, সেটা বেশী দিনের মেয়াদে নয়। মাস চার পর্য্যন্ত, সুদ বেশী নয়। কিন্তু চার মাসের ভেতর শোধ না করিলেই সুদের হার খুব বেশী হবে, আর চক্রবৃদ্ধি। একখানা খাঁড়ার মতন সেটা তাঁর মাথার ওপর সব সময়ই ঝুল্‌ছিল। এক আশা—জ্ঞান্‌দা যদি মেয়াদটা আরও কিছুদিন বাড়িয়ে

দেন, আর ভবিষ্যতে কিস্তিবন্দীতে টাকা শোধ নেবার ব্যবস্থা কর্‌তে পারেন! তাহ'লে না হয় আপাততঃ বালীগঞ্জের বাড়ীটে বেচে কি মর্টগেজ রেখে অন্য নেকড়ে বাঘদের কতক ঠেকানো যায়। জব্বলপুরের বাড়ীটে বেচা আর তাঁর বুকের পাঁজর ক'খনা বেচা, সমান কথা ছিল। সে সম্ভাবনাতেও তিনি যেন শিউরে উঠতেন। মেয়েটি আর ছেলেটির মুখের দিকে তাকিয়ে বিশেষতঃ। জব্বলপুরের বাড়ীতে তারা দুটিতে ছোট্ট বেলা থেকে দুটো প্রজাপতির মতন খেলে বেড়িয়েছে। এখন আর প্রজাপতি নেই তারা। বড় হ'য়েছে। এখন, দুটো পাখীর মতন তারা বাগানে বাগানে পাহাড়ে পাহাড়ে খেলে বেড়ায়। বাংলোটাকে তাদের খাঁচা কোনদিন তারা করে নি। সেটা যেন পাহাড়টারই বুকে রঙিন্ পালক, এভারগ্রিন্ আর টাটকা ফুলের পাঁপড়ি দিয়ে তৈরি তাদের সহজ-সুন্দর আপন নীড়। আজ একটা দম্‌কা বাতাসে নীড়টা যদি তাদের উড়ে যায়, তবে আর তারা দাঁড়াবে কোথায় গিয়ে?

গৃহিণী অবশ্য স্বামীর অন্তরের সকল চিন্তা, সকল দরদের ভাগী ছিলেন। কিন্তু তিনি "হায় হায়" ক'রে বেড়ানর মতন মেজাজ ভেতরে পোষণ কর্‌তেন না। ধীর ভাবে, মুখ ফুটে কিছু না ব'লে, তিনি সকল বোঝা ব'য়ে যেতেন।

"সমর কাল বিকেলে আস্‌ছে। তার ক'রেছে। তার এখন বড় দিনের বন্ধ।"—মৃত্যুঞ্জয়বাবু চা খেতে খেতে বল্‌লেন।

"আমিও আজ সমরদার এক চিঠি পেয়েছি, বাবা। তিনি মার্বেল রক্‌স কখনও দেখেননি। এবার আমাদের নিয়ে তাই দেখতে যাবেন। কল্‌কাতায় কি কাজটাজ সেরে আস্‌ছেন। এ সময়ে দুতিনদিনের বেশী ত' তাঁর থাকা হবে না।"—সুচরিতা বলিল।

সমরের চিঠিখানা কিন্তু চরিতা দেখাল' না। সমরদার চিঠি তার কাছে নতুন নয়। সে সব চিঠি সব্বাইকে দেখাতে সে কখনও ইতস্ততঃ করে নি। কিন্তু এ চিঠিখানায় সমরদা যেন একটু বেশী রকমের "ঘনিষ্ঠতা"র দিকে ঘেঁসে এসেছেন। স্পষ্টতঃ কিছু নেই। আভাষে ইঙ্গিতে। দু'একটা কথার গোপন ব্যঞ্জনায়। পত্রখানা সুচরিতার কেমন কেমন ঠেকেছে। সব্বাইকে দেখাতে বা প'ড়ে শোনাতে তার বুঝি লজ্জা কর্‌ছিল।

"তা হ'লে পরশুই মার্ব্বেল রক্‌স দেখতে যাবার বন্দোবস্ত কর্‌তে হয় তোমাদের। সুপ্রিয় তুমি ত' বেশ ড্রাইভ কর্‌তে পার। কতটুকুই বা পথ? মাইল তের। সমরও নিজে ড্রাইভ কর্‌তে পারে। মটরটা দেখে শুনে ঠিক ক'রে রেখো যেন।"—মৃত্যুঞ্জয়বাবু বলিলেন।

তারপর দিন বিকেলে সমরেন্দ্র আসিল। সেই সাহেবী পোষাক। সেই "রাইডিং দি হাই হর্স" চা'ল চলন। বরং কিছু বেশী বেশী। এতদিন সম্ভবতঃ অনেক "শিকারের" তাজা রক্তের আস্বাদ পাওয়া হ'য়েছিল, কাজেই মেজাজটা ভেতরে ভেতরে আরও উগ্র, আরও শাণিত। অবশ্য, মৃত্যুঞ্জয়বাবুদের বাড়ীতে সে ঘরের ছেলের মতনই আসিত, আজও আসিয়াছে। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বাবুদের "স্বদেশী" পরিবর্ত্তনটায় তাকে ভ্রূকুঞ্চিত করিতে দেখা গিয়াছিল বৈ কি! বাড়ীতে চরকা চল্‌ছে; সব্বাই এর পরণে খদ্দর। এবার এসে ঠিক সে অনুভব কর্‌তে পারল না যে, সে নিজের "সেটে"ই এসে প'ড়েছে। সে নিজের হাতে কত জনকে জেলে পাঠিয়েছে, আর এরা নিজের হাতে জেলে "ঘানি" ঘুরিয়ে এসেছে! একটা মস্ত বড় নদীর বিপরীত পারে তাদের "ক্যাম্প" প'ড়েছে যেন। নদীটে শুকিয়েই যাক্‌, আর যাতেই ভ'রে

যাক্—এর ওপর পুল সহজে প'ড়বে তার মনে হ'চ্ছিল না। স্মব্রত একদিন মাণিকপুরে যে "আধ্যাত্মিক ব্যবধান" অনুভব ক'রেছিল, সে আজ জব্বলপুরে এসে, তার মৃত্যুঞ্জয় কাকার বাড়ীতেই, সেই আধ্যাত্মিক ব্যবধানটা অনুভব করল। তার আপন বাড়ীতেও তার বোন আর ছোট ভাইটিও বড় কম যায় নি। কিন্তু তারা বাড়ীটাকে গিল্‌তে পারেনি। বরং, বাড়ীটেই তাদের উগলে ফেলে দিয়েছে। এঁদের এখানে স্মপ্রিয় স্মচরিতা দেখছি খাসা হজম হ'য়ে এক হ'য়ে গেছে। মৃত্যুঞ্জয় বাবু আর তার পত্নীও ভাবে, চা'লে চলনে "স্বদেশী" হ'য়েছেন দেখা যাচ্ছে। কে জানে "স্বরাজিষ্ট"ও হ'য়েছেন কিনা! সমরেন্দ্র এসেই একটা অস্বস্তি বোধ করল!

তারপর, অবস্থার মালিন্যও কতকটা চোখে তার পড়িল বৈকি! ভোগ বিলাসের বড় বড় ভাণ্ডার গুলোতে যে চাবি প'ড়ে গিয়েছে! মৃত্যুঞ্জয় বাবুর দেনাদায়ের কথা, তার বাপের কাছ থেকে টাকা ধার নেবার কথা, সে জানিত। এ সব দিক্ দিয়ে, তার দৃষ্টিতে, এঁরা একটা "লোয়ার সেট্" হ'য়ে পড়েননি কি?

তবু সে স্মচরিতাকে চাইত—চায়। কেন?—বেজায় ভাল বাসে ব'লে কি? বেজায় ভালবাসা যাকে বলে, সেটা তার ধাতে আস্‌ত কি না, সন্দেহ। অন্ততঃ, এ পর্য্যন্ত, সে বেজায় ভালবেসে কাকেও ফেলে নি। স্মচরিতাকেও না। তবু অনেক দিন থেকে মেয়েটিকে সে কাছে পেয়ে এসেছে—হয়ত' বোনের মতনই। আজও সে পেতে চায়—অন্যভাবে। এ চাওয়া অথবা পাওয়া, দুই-ই তার কাছে বরাবর সহজ, স্বাভাবিকই বোধ হ'য়েছে। এতে যে কোন রকমের একটা "কিন্তু" হ'তে পারে, তা সে কোন দিন মনে আনে নি। স্মচরিতাকে সে বে কর্‌বে আশা ক'রে আস্‌ছে; আর, তার ধারণা, অপর পক্ষেও, আশা তাই। দুই

বাড়ীর সেটাত' আশা বটেই। সুচরিতা কোন দিন বাগ্‌দত্তা হয়নি, অথবা সে নিজেও কখন নিজেকে তার কাছে "সঁপে" দেয়নি। ব্যবহারেও না, মনে মনেও বোধ হয় না। তবু সে ভাবত—ভেতরে বন্দোবস্ত সব ঠিকঠাকৃই আছে। মায় "পাকা দেখা, আশীর্ব্বাদ" পর্য্যন্ত। ভালবাসা-বাসির প্রশ্নটা নিজেকে বা তাকে সে কোন দিন করেনি।

মাঝে, দিনকতক আগে, সুজাতার—তার বোনের—একখানা চিঠি তার মনে সামান্য একটু খট্‌কা তুলেছিল বটে। "চরিতা অন্য রাস্তা ধ'রেছে, তাকে পেয়ে কি তুমি সুখী হ'তে পারবে, দাদা?"—এই রকমের একটা সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন সে চিঠিখানায় ছিল। কিন্তু "অন্যরাস্তা" যে পুষ্পধন্বার রাজ্যে অন্য কোন এক রাস্তা,—এ সন্দেহ সে করেনি। মুভমেণ্টে খানিকটে নেবে প'ড়েছে—তা অমন অনেকেই ত' নাবে, নামছে আজ কাল। বে হ'লেই ঠিক্ হ'য়ে যাবে'খন। তখন, একটা বই দোসরা রাস্তা নেই।—এইটে ছিল সমরেন্দ্রর মনে মনে সমাধান। সে নিঃসংশয় ছিল যে, বের পর তার রাস্তাটাই হবে সেই একমাত্র রাস্তা।

সুচরিতাদের, অবস্থাবৈগুণ্য—হাঁ, এটাতে তার মন খুঁৎ খুঁৎ ক'রেছিল বৈ কি! শ্বশুর বাড়ীটে "ভাঙ্গা বাড়ী", "প'ড়ো বাড়ী" হ'লে মনে ওঠে ক'জনের? মৃত্যুঞ্জয় বাবুর "ভাঙ্গনধরা" বাড়ীটেয় তার স্বস্তি হ'চ্ছিল না। আর, সে রকম গতিক, তাতে এ জব্বলপুরের বাড়ীটেই বা কদ্দিন? কা'ল এসে পাওনাদারেরা গ্রাস করবে। বালীগঞ্জের বাড়ীটেত' তিনশ' টাকায় ভাড়া দেবার কথা সে বাবার মুখেই শুনে এসেছে। সেই তিনশোতেই এঁদের যো সো ক'রে চালাতে হবে এখন বোধ হয়। সুচরিতাকে বে ক'রে যে আর তার সমানে সমান "ঘরে" পড়ল না নিশ্চয়!

সমরেন্দ্র যে টাকার লোভে সুচরিতাকে বে করবে, এমন হ'তেই পারে না। রূপে গুণে সুচরিতার মত মেয়ে তাদের বালীগঞ্জে দুটি ছিল না। সে আকর্ষণটা অবশ্যই কম ছিল না। তারপর, তাদের ভাবটাও অনেকদিনকার। মেলামেশা হইয়াছেও যথেষ্ট। তাতে আকর্ষণটাকে নিশ্চয়ই স্থায়ী ক'রেই তুল্‌তে চেয়েছে। তবে, আপন "সেটের," "ঘরের" মধ্যে গিয়ে পড়ার লোভটা সমরেন্দ্র অস্বীকার কর্‌তে পার্‌ত না। সুচরিতার নিজের আকর্ষণটাই ছিল তার কাছে বড়, আর তার সেটের বা ঘরের আকর্ষণটা ছিল তার তুলনায় ছোট।

কিন্তু মিঃ জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জ্জি সি, আই, ই'র? তাঁর বোধ হয় উল্টো। তিঁনি সুচরিতাকে বেশ পছন্দ কর্‌তেন, স্নেহও কর্‌তেন, পুত্রবধূরূপে কামনা কর্‌তেন। কিন্তু সে কামনার মূলে কোন্ আকর্ষণটা বড় ছিল? সুচরিতার নিজের, না, তার সেটের, তার ঘরের?

জ্ঞান্‌দা মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ পাতাইতে উৎসুক ছিলেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা প্রধানতঃ সুচরিতা মেয়েটি বেশ ভাল বলিয়া নয়। সেটা প্রধানতঃ দুই কারণে। প্রথম, সুচরিতার নিজের মাতা-মহের দিক্ হ'তে প্রভূত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হবার সম্ভাবনা আছে। দ্বিতীয়, সুচরিতাদের ঘর বনিয়াদি বড় মানুষের ঘর, আর তাঁরা তিন পুরুষে ডেপুটি হ'লেও, তাঁদের ঘর বনিয়াদি ঘর নয়। তাঁর আভিজাত্য বড় চাকুরির, ঐ সি, আই, ইর। আর, পয়সাকড়ির দিক্ থেকেও, চাকুরির পয়সা, হাজার হোক্, চুনো পুঁটি। বড় বড় জমিদারের বা কার্‌বারীর পয়সা রুই কাতলা। জ্ঞান্‌দার অন্তর্নিহিত বাসনা ছিল—সুচরিতাকে পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিয়া যদি রুই কাতলার ঝাঁকে গিয়া পড়িতে পারেন! আর, বড় চাকুরির অভিমানটা এরগু হ'লেও মফঃস্বলেই "দ্রুমায়তে" হ'তে পেরেছিল—মফঃস্বলে ডেপুটিগিরি মস্ত

বড় চাকুরি—রাজপুরুষ, হুজুর, ধর্ম্মাবতার! কিন্তু সার্কুলার রোড, বালীগঞ্জ ইত্যাদি অঞ্চলে শাল-সরল-পিয়াল প্রভৃতি সত্যিকার মহাক্রমের অভাব নেই—হাইকোর্টের জজ, বড় বড় এডভোকেট্, মিনিষ্টার, একজিকিউটিভ কাউন্সিলার ইত্যাদি সে স্থলে বর্ত্তমান। অলিগলি "নাইট্"। সে মফঃস্বলের এরণ্ড এসে এখানে তেমন জেঁকে বস্‌তে পারেন নি। অনেক হাইসার্কেলের টি পার্টিতে সুচরিতাদের বরং নেমতন্ন হ'ত; কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জ্জির নামে কার্ড সব সময়ে ইস্যু হ'ত না। নাইটের দল বালীগঞ্জের ঐ রাস্তাটা দিয়ে মোটরে যাবার সময় মুখ তুলে মিঃ চ্যাটার্জ্জির গেটের ব্র্যাস্ প্লেট্‌টার দিকে তাকিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলাবলি কর্‌তেন—"এ ভুঁইফোড় চ্যাটার্জ্জিটা কে হ্যা? কোন পাড়াগেঁয়ে রিটায়ার্ড ঘটিরাম টটিরাম বুঝি?" প্রথম, কালাপানি পার হ'য়ে ধলার ছোঁয়াচ না নিয়ে আস্‌লে আজকা'লকার অনেক সার্কেলে কৌলীন্যই হয় না। তারপর, হাই কনেক্‌সন্সও চাই। অবশ্য, এ গিনি-আভিজাত্যের দিনে ব্যাঙ্ক-ব্যালান্সও বেশ কিছু থাকা চাই। শেষেরটা মিঃ চ্যাটার্জ্জির কিছু ছিল। ত্রিশ চাল্লিশ হাজার টাকার বাড়ী খানাই হবে! ক্যাশও কিঞ্চিৎ ছিল। তাতে কতকদূর পর্য্যন্ত কেটে ছিল। কিন্তু মিঃ চ্যাটার্জ্জির আশা আকাঙ্ক্ষা বড় ছিল। তিনিও বাড়ীতে তাঁর পার্টি টার্টি দিতেন। আস্‌তেনও অনেকে। কিন্তু বড় বড় বালীগঞ্জী "কুলীনরা" আস্‌তেন যেন কতকটা মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে, দেখাতে। মিঃ চ্যাটার্জ্জির পিট্‌ও বোধ করি কেউ কেউ চাপড়ে যেতেন। "তোমার ছেলে এখন কোথায় পোষ্টেড্ আছে বল্‌ছিলে, চ্যাটার্জ্জি? ধাধেবরে গোবিন্দপুর, না কোথা? ভাল—মনেও থাকে না! বেশ প্রমিসিং ইয়ং অফিসার। পাকা এস, ডি, ও হ'য়েছে না?"—কোন পদস্থ নাইট হয়ত জিজ্ঞেস্ কর্‌তেন তাঁর সিগারের ধোঁয়াটা চ্যাটার্জ্জির

মুখের ওপর ঐকান্তিক উৎসর্গ ক'রে দিয়ে। মৃত্যুঞ্জয় বাবুদের বরং খাতির ছিল। নিজে বড় একজন এডভোকেট্ ছিলেন, তারপর, হাই কনেক্সন্স।

চ্যাটার্জ্জি মনে মনে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবতেন—এটা কাটিয়ে উঠতেই হবে।

এইজন্য সুচরিতাকে শুধু পুত্রবধূরূপে নয়, কৌলীন্যের, আভিজাত্যের উচ্চ পদবীতে ওঠার আবশ্যক সোপানশ্রেণীরূপে, তিনি পেতে ইচ্ছা কর্‌তেন! শুধু ইচ্ছা কর্‌তেন ব'ল্লে হয় না; ইচ্ছাটাকে তিনি দৃঢ়ভাবে পোষণ কর্‌তেন। এত দৃঢ়ভাবে যে, আবশ্যক হইলে তিনি তার বাল্যবন্ধু মৃত্যুঞ্জয়ের সঙ্গে এক বাজি বেশ গূঢ়চালের দাবাখেলা খেল্‌তেও প্রস্তুত আছেন।

তারপর দিন। তারা মটরে ভেড়াঘাট যাইয়া মার্ব্বেল রক্‌স দেখবার জন্য বোট্ ঠিক করিয়া ফেলিল। বোটের দক্ষিণে বোধ হয় এক টাকা দশ আনা। দু'তিন জন মাঝি মার্ব্বেল পাহাড়ের গভীর অবকাশে এঁকে বেঁকে নর্ম্মদার যে সঙ্কীর্ণ, কিন্তু স্বচ্ছ গভীর ধারা চ'লেছে, তারির বুকে ঘুরিয়ে নিয়ে আস্‌বে। সাদা ধবধবে উঁচু মার্ব্বেল পাহাড়ের ভেতরে কুটিল কিন্তু গভীর বর্ত্ম র'চে নর্ম্মদার গতি যে একখানা ছবি মুগ্ধ, চমৎকৃত দৃষ্টির সাম্‌নে খুলে দেয়, তা কারুরই বর্ণনার তুলি, বাস্তবের কেন, স্বপ্নের রঙেও, ফুটিয়ে তুল্‌তে পার্‌বে না। কেউই বর্ণনা ক'রে কোনদিন ধারণাকে তার "আইডিয়া" দিতে পারে নি; কোনও উপমা দিয়ে কল্পনাকে তার কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারে নি। আমরা সে চেষ্টা কর্‌ব না। একটা একটা মোড় ফেরা যায়, আর এক একটা নতুন অবাক্ ক'রে দেওয়া ভেঙ্গি ফুটে ওঠে!

একটা যায়গায়—নর্ম্মদা সামান্য একটুখানি চওড়া হ'য়ে যেন ছোট

একটা হ্রদের আকার ধ'রেছেন। মাথার ওপর নীল আকাশ। দুধারে ধবধবে মার্ব্বেলের দেয়াল, কত চিত্র বিচিত্র তার গায়! জল প্রায় সাগরের মতন নীল। নিস্তরঙ্গ। সুপ্রিয়র সঙ্গে ক্যামেরা ছিল। তার আর সুচরিতার ইচ্ছে করছিল—সেই মার্ব্বেলের রকে লাফালাফি করে খানিক, হেঁচ্ড়ে মেচ্ড়ে ওপর পর্য্যন্ত উঠে পড়ে। মাঝিরা বল্ল—"ওমন কাজ করবেন না, হুজুর। অই ওপরে মার্ব্বেলের ফুকরে ভীমরুলের চাক্ টাক্ আছে।" দেখা গেল না। থাকা অসম্ভব নয়। যাই হোক্—ঠিক হ'ল একখানা পাথরের ওপর সমরদা আর সুচরিতা বস্বে, সুপ্রিয় নৌকো থেকে ফোটো তুলে নেবে। তারপর, একবার নৌকায়ও তাদের ফোটো নিতে হবে।

এবার জব্বলপুর এসে অবধি সমরেন্দ্রর আচরণ, হাব ভাবটা, সুচরিতা সম্বন্ধে যেন একটুখানি কেমন কেমন। বাড়ীর সেই "স্বদেশী-পানাটা" তাকে ভেতরে যতই অস্বস্তি দিক্, সে তার চাহনি, কথাবার্ত্তা, চা'লচলন সবই যেন মধু দিয়ে মেড়ে নেবার চেষ্টা করছিল। অন্য সব্বাইকার সঙ্গে ব্যবহারে যদি বা কখনও মধ্বভাবে গুড়ং দত্থাৎ হ'য়েও থাকে, সুচরিতার সঙ্গে ব্যবহারে সে যেন একটুখানি চাকগালা টাট্‌কা "মধুই" ব্যবহার ক'র্ত্তে চেষ্টা কচ্ছিল। তখন তার চোখের চাহনি আলদা, কথার সুর, ভাবভঙ্গী আলদা। সুচরিতা ক'াল থেকে সেটা অবশ্য লক্ষ্য ক'রে এসেছে। কিন্তু সমরদার ভাবভঙ্গীতে এই নতুন মধুটুকুর ঝাঁজ তার পক্ষে উপাদেয় হয় নি বোধ হয়। সে বোধ হয় কতকটা অস্বস্তি বোধ করছিল। আর, যেন একটা আতঙ্ক!

সমর অবশ্য তখন সুচরিতার হাতখানা ধরে টরে নি। তবু, সেই নর্ম্মদার বুকে নৌকোয় ব'সে যে ভাবে তার দিকে চেয়ে, গলার সুরটা যেমন ক'রে, তাকে বল্ল—"চরিতা, এই চমৎকার যায়গায় তোমার সঙ্গে

একসঙ্গে একখানা ফোটো তুল্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে”—, তাতে, বোধ হয়, সুচরিতার মুখখানা রাঙা হ’য়ে অন্য দিকে ফিরে যায় নি, ভুরু দুটো ঈষৎ কুঞ্চিত ক’রেই অন্য দিকে ফিরেছিল। সে হাঁ না কিচ্ছু বল্‌ল না। সমর অবশ্য মৌনং সম্মতি লক্ষণং ভেবে নিল। একসঙ্গে ফোটো তোলা অবশ্য মারাত্মক ঘটনা নয়। আগে আগে—সেই বালীগঞ্জ লেকের ওপর হ’লে—সে এ প্রস্তাব হ’য়ত’ নিজেই কর্‌ত। অন্য কেউ কর্‌লে আহ্লাদ তার লুকোবার চেষ্টা কর্‌ত না। কিন্তু আজ এ প্রস্তাবের পেছনে একটা গোপন হাতছানি সে দেখতে পেয়েছিল বোধ হয়। অন্তরে সে সেটাকে পছন্দ করে নি।

ঠিক হ’ল মার্বেল পাহাড়টার মাঝামাঝি পর্য্যন্ত উঠে একটা ধবধবে পাথরের চাঁইএর ওপর তারা গিয়ে বস্‌বে। তাই তারা গিয়ে বস্‌ল। সমরেন্দ্র অন্তরে ঠিক “লাভার” যাকে বলে, তা হ’তে পেরেছিল কিনা, জানা নেই। তবে, তখন সেই ফোটো তোলবার সময়, খাসা লাভারের মতন “পোজ” তার হ’য়েছিল। অবশ্য, এ থেকে কেউ যেন না ভাবেন, সমর “এক্টিংই” ক’রে যাচ্ছে। তা নয়। তার ভেতরে হয়ত সুব্রতর মতন একটা বড় কিছু ছিলই না; সে তা পাবে কোথেকে? তার ঘটটিতে যতটুকু খালি ছিল, ভর্‌তে বাকি ছিল, ততটুকুই সে ভর্‌তে এনেছিল। জানা, কল্পনীর বিশাল ক্ষুধিত “খোল” তার ত’ ছিলই না।

সুপ্রিয় নৌকোয় দাঁড়িয়ে ক্যামেরা সেট্ কর্‌ছে। একখানা কালো বনাত দিয়ে ঢেকে। সুচরিতা বোধ হয় গাঢ় নীল আকাশের পানেই তার চোখের তারা দুটো তুলে ব’সেছিল।

সত্যিই, সে যায়গাটায় রংগুলো ভারি খোল্‌তাই। পাহাড়ের সাদা রং, আকাশের গাঢ় নীল, গভীর জলের রং (কি বল্‌ব সেটাকে?) সবই যেন এক একটা “প্রাইমারি কলারের”—মূল রঙের মৌলিকতা

সম্পূর্ণরূপে বজায় রাখিয়াই সেখানে বর্ত্তমান ছিল। আর ধীর, স্থির। তাই বুঝি এটা ওটার ঘাড়ে গিয়ে প'ড়ছে না, মিশ খেয়ে যাচ্ছে না। সুচরিতা ভাবছিল কি তা সেই জানে!

বোঁ—ও ক'রে মাথার ওপর কি দুচারটে উড়ছে না? আকাশে পাখীর ছায়া কদাচিৎ নর্ম্মদার ফটিক জলে পড়ছিল। পাখী ত' নয়। সেই ভীমরুল বুঝি? মাঝিরা যার কথা ব'লেছিল? ভীমরুল ব'লে ভীমরুল! পাহাড়ী বিচ্ছুর নাম শুনেছ? পাহাড়ী বিচ্ছুর পাখা উঠ্‌লে বুঝি পাহাড়ী ভীমরুল হয়? আর, সে পাখা ওঠা মরিবার তরে নয়, মারিবার তরে। তাইত—দুচারটে যে সুচরিতাদের তাড়া ক'রে আস্‌ছে! সুপ্রিয় কালো বনাতখানা নিয়ে ছুটে গেল, সুচরিতার কাছে। বনাতখানা তার গায়ে জড়িয়ে দিলে। সমরের হাফ্ প্যাণ্ট, হ্যাট্, কোট্ পোষাক। তারির হ'ল বিপদ্। আর ভীমরুলগুলোর রোখটা তার ওপরই বেশী বেশী। সে বেচারী হ্যাট্‌টাকে হাতে ক'রে সেই "দিব্য" খেতদ্বীপী আয়ুধ দিয়েই ভীমরুলবর্গের সঙ্গে লড়াই চালাইতে লাগিল। অবশ্য পিছু হাঁটিতে হাঁটিতে। সে মার্ব্বেল পাহাড়ের প্রায় খাড়া গায়ে পিছু হাঁটার প্যাচ্‌টাত' সহজসাধ্য নয়। খানিক "ষ্ট্রাটেজিক রিট্রিটের" পর শ্রীমান্ সমরেন্দ্রের চরণ স্লিপ করিল। তিনি ঘুরিয়া পড়িলেন। মার্ব্বেলের শুভ্র, তপ্ত কোলে নয়, নর্ম্মদার সেই সুনীল শীতল জলে। ঝপাৎ ক'রে একটা শব্দ সেই এঁকা বেঁকা সাদা পাহাড়ের ফুকরে ফুকরে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে গেল। থির জলে বড় বড় ঢেউ খেলে গেল। সমরের এবম্বিধ সমর-পরিণাম মর্ম্মান্তিক বটে, কিন্তু "কমিক" বড় কম হয় নি। সুপ্রিয়র, আর বোধ হয়, সুচরিতারও, পেটের ভেতর একটা হাসির সোডাওয়াটার্ বোতল ছিপি খুলে বেরুতে বেজায় চেষ্টা করছিল। চেপে রাখা দায়!

কোন পক্ষই কিন্তু সহজে রণে ভঙ্গ দিল না। সমর জলে পড়িয়া সাঁতার কাটিতেছে। ভীমরুল সেখানেও তাড়া ক'রেছে। কথায় বলে ভীমরুলের তাড়া! তার ওপর আবার পাহাড়ী ভীমরুল। সমর এক হাতে সেই দিব্যাস্ত্র তখনও ত্যাগ করেনি। শত্রু এরোপ্লেনে লড়াই চালাইতেছে, তিনি চালাইতেছেন সব মেরিণে। তাঁর হ্যাটের টর্পেডো নানা "আঙ্গেলে" নানান্ ভঙ্গীতে মুহুর্মুহুঃ প্রযুক্ত হইতেছিল। বঙ্কিমের কমলাকান্ত তালবৃন্ত সহযোগে একবার একটা "আততায়ী" ভ্রমরের সঙ্গে আলীঢ়, প্রত্যালীঢ়, সমালীঢ় ইত্যাকার সকল রণমুদ্রার প্রণালী-সম্মত-ভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন না? যা হ'ক—কিছুক্ষণ পরে শত্রুপক্ষ প্রতিনিবৃত্ত হইল দেখা গেল। সন্তরণশীল সব্যসাচী সমরেন্দ্রের টর্পেডোর পরাক্রম স্বীকার করিতেই হয়! সমরেন্দ্র তখন কিন্তু "স্পেণ্ট আপ্"—প্রায় কণ্ঠাগতপ্রাণ! মাঝিরা আর সুপ্রিয় মিলিয়া তাকে টানিয়া বোটে তুলিল। সে বেচারীর নাকালের পরিসীমা নেই! কোটপ্যাণ্ট সব ভিজে জাব। শীতকাল। বরফ গলা জল বললেই হয়। রণজয়ের পর তার সেই কাঁপুনিটে পুলকের ব'লে ভ্রম হয় নি বোধ হয় কারুরই!

মন্দভাগ্যের কাপটা এবারও তার ছাপিয়ে পড়্‌ল যে। অগত্যা, সুপ্রিয়র মোটা খদ্দরের চাদরটা তাকে পর্‌তে হ'ল, আর সুচরিতার খদ্দরের গায়ের কাপড়খানা গায়ে জড়াতে হ'ল। খদ্দরের কাচা পরিধান করিয়া তাঁর সাহেবিয়ানার আদ্যশ্রাদ্ধ করিতে বসিবেন নাকি? ভারি, কমিক্ সে দৃশ্য! সুপ্রিয় আর সুচরিতার ভেতরে সেই সোডাওয়াটারের বোতল তখনও ছিপি খুলিতে ঠেলাঠেলি করিতেছিল। সেই সময় সমরের একখানা ফোটো তুলে নিলে হয় না? এই খদ্দরের কাচা পরণে? সে ফোটো যেখানে সেখানে বের কর্‌লে সুবিধের হবে না

সমরের পক্ষে। যাক্—তখন ফোটো তোলার কথা কেউ ভাবে নি।

ফের্‌বার সময় কথাবার্ত্তা বিশেষ কিছু হয় নি। সোডাওয়াটারের বোতলটাকে জোর ক'রে চেপে বন্ধ ক'রে ফেল্‌তে হ'য়েছিল। খানিকটে "শেকেন্" হ'য়েছে মাত্র, আঘাত টাঘাত পায়নি—সুচরিতাদের প্রশ্নোত্তরে সে জানিয়েছিল। ঘাটে ফিরে এসে অনেকগুলো সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ডাকবাংলোয় উঠে যেতে হয়। ডাকবাংলোর ধারে পথের ওপর তাদের মটরটা ছিল। পাহাড়ের ওপর চৌষাট যোগিনীর কোনটাই সেদিন অনুকূলা ছিলেন না সমরের ভাগ্যে।

সেদিনকার ট্রিপ্‌টে একেবারে মাটি! আর, সমরের সেই সাধের একসঙ্গে ফোটো তোলাটা হ'ল না। বিধি যদি সাধে বাদ—

ফের্‌বার পথে জব্বলপুরের উপকণ্ঠে যেখানটায় একটা উঁচু কালো পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কেটে কে ওপর পর্য্যন্ত নিয়ে গেছে, আর পাহাড়টার মাথায় একটা মন্দির টন্দির কি বানিয়ে রেখেছে, সেইখানে এসে মটরটা একবার বিগড়ুল। সমর আর সুচরিতা মটর থেকে নেবে মাঠটায় একটুখানি পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগল। তখনও সন্ধ্যা হয় নি। সুপ্রিয় মটর মেরামত কর্‌ছিল। সেই সময়, কি জানি কি একটা কথা যেন সমর সুচরিতাকে বল্‌ব বল্‌ব কর্‌ল। সেদিনকার একসিডেণ্টটা না হ'লে সে হয়ত' বলতও। বলার সুযোগ বটে। কিন্তু সেদিনকার শক্‌টা সে তখনও সাম্‌লাতে পারে নি। বিশেষ, নিজের খদ্দরের কাচা আর নগ্নপদযুগলের চিত্র তাকে নিজের কাছেই বড় "ছোট" ক'রে রেখেছিল। এই বেশে "প্রোপোজ" করা! চমৎকার আর কি! প্রোপোজ না ক'রে ভালই করেছিল। কেননা, তখনও

স্থচরিতার ভেতরে সেই সোডাওয়াটার্ বোতলটা থেকে থেকে "চুঁ চুঁ" করছিল। থাক্—বাড়ী ফিরেই হবে।

আধ ঘণ্টার ভেতরেই তারা বাড়ী ফিরে এল। তখন মৃত্যুঞ্জয়বাবু বাঁংলোর সাম্‌নে সেই কৃত্রিম ঝর্‌ণার ধারে একখানা মার্ব্বেলের বেঞ্চে ব'সে চুরুট টান্‌ছিলেন। সমরের খদ্দরের কাচা পরণে দেখে তিনি অবাক্ হ'লেন। সোডা ওয়াটারের একটা ছোট্ট ঢেঁকুর তাঁরও গলার কাছটায় উঠেছিল বুঝি? সমর তাড়াতাড়ি ঘরে গিয়ে তার স্থট্‌কেশ থেকে নতুন ড্রেস্ বের ক'রে পর্‌ল। রূপকথায় শোনা গিয়েছিল—রাক্ষসীদের প্রাণ কোন এক কোটোর ভেতর ভোম্‌রা ভুম্‌রী পা'থ্ হ'য়ে থাকৃত। সমরেন্দ্র-শ্রেণীর লোকেদেরও প্রাণ—মানইজ্জৎ সবই—বোধ হয় তাদের ড্রেসেই বেশীর ভাগ থাকে। নতুন ড্রেস্ প'রে সমরেন্দ্র নতুন ক'রে প্রাণ পেল। তার ঘরেই চা টা তাকে দিয়ে আসা হ'য়েছিল।

ইতিমধ্যে অবশ্য মৃত্যুঞ্জয়বাবুরা সমরেন্দ্রদের সেদিন কার "এড্‌ভেন্‌চারের" রিপোর্টটা শুনেছিলেন। স্থপ্রিয়ই শুনিয়েছিল। স্থচরিতা আর তাতে রসান দেয়নি। আর, সত্যই বোধ হয়, তার সমরদার দুঃখে দরদী হবার আরও একটা কারণ উপস্থিত ছিল। সে কারণটা কেউ মুখ ফুটে বলেনি—তবে কা'ল থেকে সে সেটা ক্রমাগত অনুভব ক'রে আস্‌ছে। সমরদা তাকে "প্রোপোজ" কর্‌তে এবার এসেছে। আর সে?—সে যে কি জবাব দেবে, তা সে মনে মনে মক্স ক'রে রাখে নি। তবে, তাতে তার বড় একটা সন্দেহ ছিল না। সমরদার নতুন মধু দিয়ে মাড়া ব্যবহার ট্যাবহারগুলোতে তার অবশ্য অন্তরের রুচি হচ্ছিল না। কিন্তু তবু দুঃখ হচ্ছিল। সত্যিকার গভীর দুঃখও সেটা! সমরদাকে বে কর্‌বে

সে—এতে আশ্চর্য্য একটা কিছু কোন দিন সেত' দেখ্‌ত না!

সন্ধ্যার পর সমরেন্দ্র বেশ সাম্‌লাইয়া লইয়াছে, দেখা গেল। এমন কি, নিজের সেই "মিস্‌এডভেন্‌চার" নিয়ে নিজেই খানিকটে হাসা-হাসি করিল সে। সুচরিতাকে পিয়ানোয় ব'সে দুএকটা গান গেতে অনুরোধ করল সে। সেই নতুন একটা মধু দিয়ে মাড়া অনুরোধটুকু!

সুচরিতা বিনা ওজরে গান গাহিল। প্রথমে জাতীয় একখানা গান। গানের তার বেশ উন্নতি হ'য়েছে ত'! প্রাণে তার নটরাজ নেচেছেন যে! সে যে বড় কাজের, বড় ভাবের, বড় আশার, বড় বেদনার যে একটা স্বভাবসিদ্ধ মনীষা, যে একটা স্বয়ংপ্রভ প্রতিভা, সেইটের স্পর্শ পেয়েছে যে! রাখীবন্ধনের দিন মাথার রক্ত পায়ে ফেলে জাতীয় ঐক্যের, মৈত্রীর প্রতীক হস্তে বিপুল জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে সে গান গেয়ে এসেছে সে! তার গলা দিয়ে শুধু তল্লা বাঁশের বাঁশীর মিষ্টি আওয়াজটুকুই আজ বেরুবে কেন? তা দিয়ে আজ রুদ্রবিষাণের জলদ-গভীর মন্ত্রও যে বেরুতে অভ্যস্ত হ'য়েছে!

সমর সেই রাত্রেই বিবাহের প্রস্তাব ক'রেছিল। তার সে প্রোপোজ করার ডাইরিটে আমরা আজ ঘাঁটব না। খাওয়া দাওয়ার পর তারা দুজনে গিয়ে খানিক ব'সেছিল লনের ওধারে মার্ব্বেলের সোফাটায়। সেই সময়ই প্রোপোজ হ'য়ে থাক্‌বে বোধ হয়। সুচরিতা সেদিন সমরেন্দ্র সম্বন্ধে সহিষ্ণু ছিল, দরদী ছিল। কিন্তু প্রোপোজের জবাবটা কি দিয়েছিল সে?

ঠিক কথাগুলো তার মনে নেই। তবে বোধ হয় এই ভাবে—"তা হবে না, সমরদা। অনেক কিছু এসে প'ড়ে মস্ত বড় একটা ব্যবধান সৃষ্টি ক'রেছে আমাদের ভেতর। আমি স্নেহের,

আদরের বোন চিরদিনই থাকব, আশা করি। কিন্তু—তা আর হয় না।"

"ম্যুভমেণ্ট ছাড়া আরও কোন কিছু কারণ আছে কি?"—সমর হয়ত' জিজ্ঞেস ক'রেছিল।

"আপনি ও প্রশ্নটা কর্‌বেন না, সমরদা"—এই ব'লে সুচরিতা বোধ হয় উঠে প'ড়েছিল। সুচরিতার প্রত্যাখ্যানে কোন রকম একটা রূঢ়তার বা হৃদয়হীনতার লেশটুকু ছিল না। কিন্তু প্রত্যাখ্যানটা স্পষ্ট।

সমরেন্দ্র মুখভার ক'রে নিজের ঘরটিতে চ'লে গিয়েছিল। সুচরিতা আস্তে আস্তে লনের মাঝখান দিয়ে ফিরে এল! যেটা একরকম পাকাপাকিই হ'য়েছিল, সেইটে মুখের একটা কথায় ফাঁসিয়ে দিয়ে এল! কিন্তু উপায় ত' নেই! সত্যিই নেই! সুব্রতকে সে হয়ত' ভাল-বেসেছে। কিন্তু তাকে পাবার আশা তার আছে, না নেই? তাত' কৈ সে জানে না! অকূলেই বোধ করি সে আজ ভাস্‌ল!

সমরদাকে বে কর্‌লে সে "সুখে স্বচ্ছন্দে" হয়ত' থাকৃত। অন্য দিক্ দিয়েও মুস্কিল আসান হ'ত! কিন্তু সুখস্বাচ্ছন্দ্যের হিসেব ত' কৈ তার মনের কোণে উঁকিটুকুও মেরে যায়নি!

মাথার ওপর আকাশ, তারাগুলো জল্ জল্ করছিল। সে মাথা নুইয়ে একবার প্রণাম কর্‌ল। জানিনে, কোন্ ধ্রুবতারাটা তার চোখে প'ড়েছে, যাতে নজর রেখে সে তার নবীন তরীখান ভাসিয়ে দেবে আজ অকূলে!

বারান্দায় চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিল কে? সুপ্রিয় বুঝি?

"দাদা?"

সুপ্রিয় কিচ্ছু বল্‌ল না। বোনের হাত দুটো নিজের হাতের মুঠোয় নিয়ে একবার টিপে দিল।

সুচরিতা তার মৌন ভাষাটা বুঝল বোধ হয়।

সুপ্রিয় ব্যাপারখানা আঁচ ক'রেছিল নিশ্চয়। তার স্নেহের বোন্‌টি যে আজ বুকে অসীম সাহস বেঁধে ঠিক চলার পথটিতে একলাটি পা বাড়িয়েছে, তা সে বুঝেছিল। সে বোনের হাতদুটো টিপে জানাল তার অন্তরের অনুমোদন, আর, আনন্দ!

সেও বুঝেছিল সমরদাকে বে করা তার বোনের বোধ হয়, আর কোন মতেই চল্‌তে পারে না। সে অবশ্য কিচ্ছু বলেনি। একটা উৎকণ্ঠা নিয়ে চুপটি ক'রে দাঁড়িয়েছিল—বাংলোর বারান্দাটায়।

* * * * *

তার পরদিন সমরেন্দ্র চলিয়া গেল। ভাল কথা।—যেদিন তারা মার্ব্বেল রক্‌স দেখতে গিয়েছিল, সেই দিনই বিকেলে মৃত্যুঞ্জয়বাবু এক চিঠি পান—জ্ঞানদার—সমরের পিতার—তাতে লেখা ছিল—সেই পঞ্চাশ হাজার টাকার পরিশোধের মেয়াদ তিনি বোধ হয় চেষ্টা চরিত্তির ক'রে বাড়িয়ে দিতে পার্‌বেন। সে পক্ষে বিহিত চেষ্টা তিনি কর্‌ছেন। আর—আর এক কথা। সমরের সঙ্গে চরিতার বে যখন একরকম ঠিক হ'য়েই আছে, তখন তিনি, দেনার কতক অংশ—সেটা তিনি নিজেই দিয়েছিলেন—চরিতাকে যৌতুকরূপে দেবেন ঠিক ক'রেছেন। বড্ড যে উদার তিনি!

চরিতারা মার্ব্বেল রক্‌স থেকে ফিরে আসার পর এক ফাঁকে তিনি চিঠিখানা তাকে দেখতে দিয়েছিলেন। চরিতা একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিল মাত্র! তার পাশার দান প্রাণপণ রেখে ফেলা হ'য়ে গেছে বুঝি!

অনেকখানি রাত তখন, যখন চরিতা এল তার বাবার ঘরে—পায়ে হাত বুলিয়ে ঘুম পাড়াতে। মৃত্যুঞ্জয়বাবু চোখ বুজেছিলেন।

"মা চরিতা" !

"হাঁ বাবা"—ব'লে চরিতা বাবার পায়ে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেল্‌ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে।

"কাঁদিস্ নে মা। তোর ভুল্‌ত' কোন দিন হয় নি। আমরাই হয়ত' এদ্দিন ভুল বুঝিছিলুম্। ফল দেবার মালিক আর একজন—জেনে শুনে জীবনে এত বড় একটা ভুল কর্‌লে তা কি আর শোধরান যেত' মা ? আশীর্ব্বাদ করছি—দেখিস্ মা, তোর সব ভালই হবে।"

মৃত্যুঞ্জয়বাবুও সব বুঝেছিলেন। তাঁকে কিচ্ছু ভেঙ্গে বল্‌তে হয় নি।

— —

চতুর্দ্দশ

জব্বলপুর রবার্টসন কলেজের পাশে একটা লেক্ আছে। বালীগঞ্জ লেকের মতন "পুতুল" লেক্ নয়। দস্তুরমত লেক্! তাই ব'লে মানস সরোবরের মতন একটা কিছু কেউ যেন না ভাবেন। তিনধারে তার পাহাড়, একদিকে ময়দান; আর সেই ময়দানটার ওপর রবার্টসন কলেজের বিল্ডিংটা দাঁড়িয়ে আছে। ময়দানের যায়গায় যায়গায় কালো কালো পাথরের হাতী গণ্ডার দুদশটা পড়িয়া আছে। লেক্‌টার ভিউ বেশ চমৎকার! পাহাড়ের ফ্রেমে আঁটা একখানা বড় আয়নার মতন। ঐ অন্তরীক্ষলোকের ওরা বুঝি যখন তখন তাতে মুখ দেখে! এ অঞ্চলে যাঁরা বেড়াতে আসেন, তাঁরা লেক্‌টাও না দেখে যান না।

একদিন, জানুয়ারির শেষ, কি ফেব্রুয়ারির প্রথম হবে, দুজনে একটা ক্যাম্বিশের বোটে ক'রে সেই লেক্‌টার ওপর ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বেলা তখন পড়' পড়'। ক'দিন বেশ গরম প'ড়ে গিছলো। সেদিন বায়ুকোণে একখানা মেঘও বিকেলের দিকে দেখা গিয়েছিল। হাওয়াটাও সামান্য একটুখানি জোরেই বচ্ছিল তখন। লেক্‌টা তখন আর আয়না নয়। তবে, অসময়ে ঝড়বৃষ্টি হবে, কেউ মনে করেনি।

বোটখানা ছাড়া হ'য়েছিল বোধ হয় রবার্টসন কলেজের দিক্ থেকেই। বাইতে বাইতে তারা দুজনে ওদিকে অনেকদূর চ'লে গেছে। বোটে তাদের স্পষ্ট নজর হচ্ছিল না। বোধ হয় একজন পুরুষ, একজন মেয়ে। হাওয়াটার মুখ যেদিকে, তাতে পা'ল খাটিয়ে কলেজের দিকে আসা যাবে না!

ঐ যে—মেঘখানা দেখতে দেখতে বেশ উঠে প'ড়েছে! হ্রদের জল

কালো হ'য়ে গেছে, হাওয়াও জোর ধ'রেছে। ঢেউগুলো বড় বড় হ'য়ে উঠছিল। দিনের আলো একরকম নেই বল্লেই হয়। ঝড়বৃষ্টি উঠলে তাদের নাকাল ত' হবেই, বিপদেরও বেশ একটু সম্ভাবনা।

তারা জোরে দাঁড় বাইতে লাগল। ঢেউএর বাড়ি খেয়ে ক্যাম্বিশের বোট্ তেমন এগুতে চাচ্ছিল না। কলেজের দিকে ফিরে আসা তখন অসম্ভব। কাজেই, অন্য আর এক দিকে পাহাড়ের কোলের আশ্রয় পাবার জন্যে তারা বেয়ে যাচ্ছিল। কূলে এসে পৌঁছুবার আগেই বেশ তোড়জোড় ক'রে ঝড়বর্ষা নেবে গেল। তবে নিরাপদে তারা কূলে পৌঁছেছিল।

সে ঝড়বৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে থাকা দায়। তাদের কাপড় চোপড় সব ভিজে গেছে। আর, শীতও প'ড়ে গেছে তখন বেজায়। সেখানটায় লোকালয় নেই বোধহয়। কতদূরে লোকালয় তাই বা কে জানে? ভারি মুস্কিল। তারা দুটিতে কাঁপতে কাঁপতে চ'লেছে।

হঠাৎ—শাঁকের শব্দ শোনা গেল না? তিন তিন বার। একটা ধুনো গুগ্‌গুলের বাসও ঝ'ড়ো হাওয়া কোত্থেকে ব'য়ে এনে দিল। তবে ত' নিকটে বাড়ীঘর আছে! তারা শাঁকটা যেদিকে শুনেছিল, সেদিকে চল্‌ল। পাহাড়ে রাস্তা টাস্তাও নেই। যাক্—বেশীদূর যেতে হ'ল না। রশি দুতিন গিয়েই একটা আলো দেখতে পেল। চারধারে নাতিউচ্চ পাহাড়ে ঘেরা একটা যায়গায় একটা ছোট্ট বাড়ীইত' বটে! লোকালয় ব'লে যেন মনে হয় না। যেন কোন পাখীটাখী এসে পাহাড়ের এক নিভৃত যায়গায় তাদের কুলায় বেঁধেছে!

বাড়ীখানা ছোটই। বোধহয় খ'ড়ো চালাই হবে। খানদুত্তিনের বেশী ঘর বোধহয় নেই। চারধারে খানিকটে যায়গা কিসের বেড়া দিয়ে ঘেরা। একটা পাহাড়ে' ঝরণার জল বোধহয় সে যায়গাটার

মাটি (হাঁ, মাটিই বটে, পাথর নয়) ভিজিয়ে ব'য়ে যাচ্ছে। ঘাসটাস, কয়েকটা গাছও সেখানে আছে।

বাড়ীতে ঢোকার পথ খোলাই ছিল। তারা দুটিতে ঢুকে পড়ল। সঙ্গে তাদের ক্যামেরা বক্সটা ছিল। আর বোধহয় টিফিন কেরিয়ারটা। ওয়াটারপ্রুফ ট্রেঞ্চ তাদের গায়ে ছিল না। শীতকালে বর্ষা তারা মোটেই আশা করেনি। বোটখানা গুটিয়ে তারা লেকের ধারেই থুয়ে এসেছিল।

তাদের টর্চের আলোতে বাড়ীর লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ হ'য়েছিল। একটি মেয়ে দাঁড়িয়েছিল ঘরের দাওয়ায়। হাতে তার একটা আলো।

"এইযে উঠে আসুন"—ব'লে সে অভ্যর্থনা করল আগতদের। ভারি সুন্দর চেহারা। আটার উনিশ বছরের মেয়েটি। একখানা মোটা খদ্দরের সাড়ী পরণে। হাতে দু'গাছি সরু সোণার চুড়ি। আর কোন গহনাপাতি নেই।

যাঁরা পিঁড়েয় উঠে পড়লেন, তাঁদের একজন ভদ্রলোক—এই সাতশ আটাশ বছর বয়েস হবে। আর একজন মহিলা—তরুণী—সুশ্রী। তাঁদেরও দুজনের খদ্দরের কাপড়। তখন খদ্দরেরই রেওয়াজ চলছে—আশ্চর্য্য কিছু নেই।

ঘর থেকে একখানা খদ্দরের কাপড়, আর একখানা র‍্যাপার সে নিয়ে এল। আর, মহিলাটিকে সঙ্গে ক'রে সে ভেতরে নিয়ে গেল।

বড় ঘরটিতে তাঁরা সব্বাই গিয়ে ব'সেছিলেন। বৃষ্টি তখনও হচ্ছিল। চায়ের যোগাড় হ'য়েছে। বাড়ীর ভেতর থেকে কিছু গরম গরম খাবারও তৈরী হ'য়ে সেখানে এসেছিল। টিফিন কেরিয়ারে খাবার যা ছিল, তাতেও সকলের সান্ধ্য জলযোগটার কতক সাহায্য হ'য়েছিল।

ঘরের আস্‌বাবপত্র খুবই সামান্য ধরণের—কিন্তু সবই বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাজিয়ে গুছিয়ে রাখায় বেশ একটু সৌষ্ঠবের পরিচয় ছিল। একটু পরে "ক্রিরিরিং" ক'রে বাইকের শব্দ হ'ল। একটি যুবক ভিজতে ভিজতে এসে উপস্থিত। সাইকেলের সঙ্গে ছোট্ট একটা বাজার বাস্‌কেট্ বাঁধা।

"দাদা, খুব ভিজেছ বুঝি?"—মেয়েটি বলিল। যুবকটি আসার আগে মেয়েটি অবশ্য এক্‌লাটিই বাড়ীতে ছিল না। এক প্রবীণ ভদ্রলোক, আর এক প্রবীণা নারী ছিলেন। এদের বাবা, মা।

আর বল্‌তে হবে কেন?—এত' মৃত্যুঞ্জয়-বাবুদেরই বাড়ী। মেয়েটি সুচরিতা। ছেলেটি—সুপ্রিয়। কিন্তু এখানে, এ অবস্থায় তাঁরা?

হাঁ, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর মাথার ওপর যে খাঁড়াটা ঝুল্‌ছিল, সেটা এসে ঠিক মাথারই ওপর প'ড়েছে। একেবারে বিপর্য্যস্ত ক'রে দিয়ে গেছে তাঁদের। জব্বলপুরের সেই বাংলো থেকে সমরেন্দ্র বিদায় নেবার দিন সাতেক পরেই জ্ঞান্‌দার এক পত্র আসে—তিনি দেনা পরিশোধের মেয়াদটা বাড়াতে পারেন নি। শুধু তাই নয়। পাওনাদারেরা বুঝতে পেরেছে মৃত্যুঞ্জয়বাবু একেবারে ধ্ব'সে প'ড়েছেন। তিনি আর কিছুতেই খাড়া হ'য়ে উঠতে পার্‌বেন না। কাজেই, তারা আর ঋণ পরিশোধের অপেক্ষায় ব'সে থাক্‌তে রাজি নয়। প্রথম চারমাসের মেয়াদটা ফুরুলেই, তারা দয়া ক'রে, একমাস গ্রেস্ দেবে। তার পর, তারা তাঁর যা কিছু সম্পত্তি আছে, তাই এসে দখল কর্‌বে। তাতে তাদের সব পেটটা না ভর্‌লেও, যতটা হয়। তাঁর বালীগঞ্জের বাড়ী, জব্বলপুরের সেই সুন্দর বাংলোখানা, ফ্যাক্‌টারি আর তার কল্‌কবজা সাজ সরঞ্জাম যা কিছু আছে—সব তার ওপর তারা "ইন্‌জঙ্কসন্" নিয়ে রেখেছে। চারমাস মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে। ঐ একমাস গ্রেস্ চল্‌ছে তখন। বালীগঞ্জ

আর জব্বলপুরের বাড়ী এখনও তারা বেচে ফেলে নি ; কিন্তু সে দুটোর ভাড়া যা আদায় হচ্ছে, তা আর মৃত্যুঞ্জয়বাবুর ভোগে লাগছিল না। তারাই নিচ্ছিল।

অগত্যা, মৃত্যুঞ্জয়বাবু তাঁর জব্বলপুরের বাংলোখানা ছেড়ে দিয়ে এইখানে—লেকের ধারে এই সামান্য খ'ড়ো ঘরটায় এসে বাস করছেন। কিন্তু এমন নিভৃত স্থানে, পাহাড়ের বুকের ভেতর, পালিয়ে রয়েছেন যে?

জ্ঞান্‌দা বা অন্য পাওনাদারদের সম্বন্ধে অনুযোগ করার তাঁর কিচ্ছু ছিল না। সত্যিই তাঁর "ভবিষ্যৎ" যে একেবারেই ব্ল্যাঙ্ক! তারা তাদের ন্যায্য পাওনাগণ্ডা ছাড়বে কেন? কি আশায় তারা চুপ ক'রে ব'সে থাক্‌বে? তবে, এমত অবস্থায়, সকলের চোখের সাম্‌নে, পাওনাদারদের ইতর ভদ্র সকল রকম আক্রমণের "টার্‌গেট্‌" হ'য়ে, তাঁর পক্ষে থাকা অসম্ভব হ'য়ে প'ড়েছিল। একেত' নার্‌ভাস্‌ ব্রেকডাউন্‌—তার ওপর এই উৎপাত! তিনি মোটেই সহ্য কর্‌তে পার্‌তেন না। সুপ্রিয় আর সুচরিতা পরামর্শ ক'রে, ভেবে চিন্তে, লেকের ধারে এই নিভৃত "রিট্রিট"টে "পুনরাবিষ্কার" ও সুসংস্কার ক'রে তাতেই এসে বাস করা ঠিক ক'রেছিল। বাংলো ছেড়ে আস্‌তে তাদের কষ্ট হ'য়েছিল, কিন্তু পাহাড়ের কোলে এই "পাখীর বাসাটা" তাদের ভালই লেগেছিল। সুপ্রিয় এখান থেকে সাইকেলে ক'রে হাট বাজার ক'রে নিয়ে আস্‌ত। কলেজে এ সেসন্‌টা সে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর শরীর ও মনের অবস্থা আরও খারাপ—তবে প্রাণগতিকে টিঁকে আছেন। এটর্ণিকে তাঁর জানিয়ে রেখেছেন—গ্রেসের ঐ একমাসের মেয়াদ ফুরুলেই তিনি যেন এসে যা সব বন্দোবস্ত

কর্‌বার তা ক'রে যান। এর ভেতরে তাঁকে যেন বিরক্ত হ'তে না হয়। তদ্দিন এঁদের অজ্ঞাতবাস।

চিঠি পত্তর লেখা বা পাওয়া এঁদের বন্ধ ছিল। এমন কি, সুজাতার সঙ্গে সুচরিতার, সুপ্রিয়র সঙ্গে সুব্রতর চিঠি লেখালেখি বন্ধ ছিল। ফল কথা, এঁদের পাত্তা কেউ জান্‌ত না।

আর, যাঁরা আজ সন্ধ্যার দুর্য্যোগে এঁদের অতিথি হ'য়ে প'ড়েছেন, তারা কে?

বিনয় আর সুষমা।

মৃত্যুঞ্জয়বাবুরা এঁদের চিন্‌তেন না। সুব্রতবাবুর মুখে কখনও এঁদের নামধাম শুনেছেন ব'লেও ত' মনে হয় না।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু সদালাপী ছিলেন, খোলা প্রভৃতির লোক ছিলেন। বিনয়ের সঙ্গে সন্ধ্যার পর সেই ঘরটিতে ব'সে অনেক কথাবার্ত্তা হ'ল তাঁদের। বিনয়ও ত' সিমেণ্ট লাইনে কারবার্ করে। তার কার্‌বার চল্‌ছিল নেহাৎ মন্দ নয়। বিজ্‌নিসে তার মাথা অসাধারণ—"জিনিয়াস্" বল্‌লেও অত্যুক্তি হবে না। কথায় কথায়, মৃত্যুঞ্জয়বাবুর কার্‌বারের অবস্থা সে সবই জেনে ফেল্‌ল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুর রেখে ঢেকে কথা বলার অভ্যেস নেই। তাঁর বর্ত্তমান বৈষয়িক অবস্থাটাও বিনয় সহজেই আঁচ করিয়া লইল। ও অঞ্চলে প্রায় এক সেট্ লোকের সঙ্গেই তাদের লেনদেন কর্‌তে হয়। কাজেই, বিনয় এটাও মোটামুটি জান্‌তে পার্‌ল—কারা কারা মৃত্যুঞ্জয়বাবুর "ক্রেডিটর্"।

ওদিকে সুষমাকে নিয়ে গেছে সুচরিতা তাদের ছোট রান্নাঘরটিতে। ঠাকুর চাকর নেই। নিজেই সে সব করে। মার শরীর ভাল নয়, তাঁকে প্রায় কিছু কর্‌তে দেয় না সে। সুপ্রিয় বরং কিছু কিছু তার "হেল্‌প" করে।

সুষমার অন্তর আজ ভরপূর—সুচরিতাকে পেয়ে। তার ঠাকুর-পোর জীবনের পরশমণি! পরশমণি ব'লে পরশমণি! বড্ড ভাল লেগেছে তার মেয়েটিকে! ঐ এক দণ্ডেই কত ভাব হ'য়ে গেছে তাদের। সুষমা গিয়ে বঁটি নিয়ে তর্‌কারি কুট্‌তে বস্‌ল—মস্‌লা বেঁটে দিল। না দিয়ে ছাড়বে না সে। রান্নাবান্নার অনুষ্ঠান সামান্যই। তা হোক্—তার এমন ভাল লাগছিল যে বলার নয়। রাজার ঝিয়ারী আজ সত্যিই শিবের জন্যে তপস্যা কর্‌ছেন যে!

সুষমার বগলে কি একখানা বই ছিল।

"কি বই ওখানা দিদি?"—সুচরিতা বলিল।

"দেখ্‌বে? চমৎকার বই।"

একি?—এ যে সুব্রতবাবুর লেখা নতুন বই। বাংলায়। জেলে ব'সে তিনি লিখেছেন, এই ম্যুভ্‌মেণ্ট সম্বন্ধে। এটার "স্পিরিট" আর "পার্‌পাস্‌" সম্বন্ধে। আর—আর টাইটেল্‌ পেজের' পর—সুচরিতার মুখখানা একেবারে রাঙ্গা হ'য়ে গেছে যে—সুব্রতবাবুর একখানা সুন্দর ফটো!

সুষমা একদৃষ্টে সুচরিতার মুখের পানে তাকিয়ে ছিল। আর মুখ টিপে টিপে একটা দুষ্টু হাসি হাঁস্‌ছিল।

"আমার ঠাকুরপো যে ভাই, তোমার সুব্রতবাবু!"

তোমার সুব্রতবাবু!

সুচরিতার বুকের সবখানি রক্তই বোধ হয় মুখে এসে জ'মেছিল!

সুষমা একটা ষ্টাইলোপেন বের ক'রে, বইখানার টাইটেল পেজে লিখ্‌ল—"স্নেহের বোন্‌ সুচরিতাকে—"। সুচরিতার হাতে কে যেন সাত রাজার ধন এক মাণিক তুলে দিয়ে গেছে!

"এখানে পিদীপের আলোয় ফোটাখানা ভালো দেখা যাচ্ছে না,

ভাই। ধোঁয়াও হ'য়েছে ঘরটায়। যাও দিকিন্—তোমার ঘরটায়। ল্যাম্পের আলোয় বেশ ক'রে দেখে, সনাক্ত ক'রে, বইখান তুলে রেখে দিয়ে এস।"—একটা দুষ্টুমিভরা হাসিমাখা বক্রদৃষ্টি ফেলে সুষমা কথা ক'টা বল্ল।—"আমি না হয়, ডাল্‌টেয় ফোড়ন টোড়ন দিচ্ছি।—"

সুচরিতার সেই রাঙা মুখখানা থেকেও একটা বক্রদৃষ্টির তড়িৎ বেরিয়ে গেল। বড়ই সলাজ, বড়ই মধুর কিন্তু সেটা।

"যাও—" শুধু এইটকুখানি সেই তড়িতের ব্যক্ত ঝঙ্কার!

সুচরিতার চিবুকের ডিম্পল্‌টি একবার সুষমা সস্নেহে টিপিয়া দিল।

সে রাত্রে তারা দুটিতে আর কাছছাড়া হয় নি। সুচরিতার বিছানাতেই গিয়ে তারা শুয়ে প'ড়েছিল। বিনয় বোধ হয় বিধিকে "নিরজনে" পেয়ে একলা শোয়ার যে কি মজাটা তা বেশ ক'রে টের পাইয়ে দিয়েছিল।

শোবার আগে "তার" সুব্রতবাবুর সেই ফোটোখানা একটিবার "নিরজনে" আলোয় গিয়ে দেখ্‌বার সুযোগ সুচরিতা পেয়েছিল কি? তা নাইবা হ'লো আলোয়, আঁধারেই বা ক্ষেতি কি!

একবার কিন্তু আঁধারে চোরটা বামাল শুদ্ধ গ্রেপ্তার হয়েছিল।

খাওয়া দাওয়া হ'য়ে গেছে তখন। সুষমা গেছে বিনয়কে পান টান দিতে! হাঁ—শুধু পান নয়, টানও বটে। যাই হোক্—পান টান দিয়ে সে সুচরিতার ঘরটিতে যখন ফির্‌ল, তখন ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। জান্‌লার ধারে সে দাঁড়িয়ে র'য়েছে বুঝি! আঁচল দিয়ে কি একটা মুছ্‌ছিল না? টপ ক'রে টর্চ্চ জ্বেলে ফেল্‌ল সুষমা।—সেই সুব্রতবাবুর ফটোখানা। তা, সুচরিতা সেখানা আঁচলে মুছছিল যে? চুরির দাগটা একেবারে মুছে ফেল্‌তে চায় বুঝি।

"দেখি, আহা, এমন সুন্দর ফটোখানায় রাঙা দাগ লাগিয়ে ফেল্তে হয় ?"—সুষমা বইখানা কেড়ে নিল।

সত্যিই, সুচরিতার ঠোঁট্ দুটো রাঙা টক্ টক্ কর্ছিল, পান খেয়ে।

বামাল শুদ্ধ, মায়, চুরির নিশেন শুদ্ধ, চোরটিকে গ্রেপ্তার ক'রে সুষমা আপন জিম্বায় বিছানার গারোদে নিয়ে এল। টর্চ্চটা তার আর সুচরিতার মুখের 'পর ফেলে নি। বড় কন্সিডারেট্ অফিসার্ যে! ঘুমুবে কি ছাই তারা দুটিতে! সারা রাত্তির গুজুর গুজুর! খাঁচায় একজোড়া বুল্বুলির মতন! সুচরিতা বল্বে আর কি ?—সুষমা সবই বুঝেছিল, বুঝে গেল।

"চিঠি লিখবি ত" ?—সে সকালবেলায় বিদায়ের সময় বল্ল।

"অজ্ঞাতবাস যে দিদি !"

"যারা জ্ঞাতবাসের চেনাশুনো, তাদের কাছেই অজ্ঞাতবাস। আমাদের যে অজ্ঞাতবাসেই চেনাশুনো।"

"আচ্ছা লিখব। কিন্তু গোপন রেখো দিদি।"

"কাণ্ট প্রমিস। চেষ্টা কর্ব। তেমন এমার্জেন্সি হ'লে নাচার, তা হ'লে রাখছি কিন্তু। এস্ ও এস্ যদি এসে পড়ে, তখন টুকতে পাবিনি, চরিতা।"

* * * *

সুব্রত সম্প্রতি কলিকাতার সেই জেলটা হইতে বের হইয়াছে। সুপ্রিয়র কোনও চিঠি পত্র আর সে পায় নি। বালীগঞ্জের ঠিকানায় একখানা চিঠি সে লিখিয়াছিল, ফিরিয়া আসিয়াছে। মালিকের ঠিকানার পাত্তা হয়নি। জেলে থাকিতে শেষের দিকে সেই শুশ্রূষাকারিণী তরুণীর এক পত্র এসেছিল। পোষ্ট মার্ক—এবারে বোধ হয় "বেনারস"।

ভাল ক'রে পড়তে পারা যায় নি। নাম ধাম এবারও অপ্রকাশ। এ রহস্যময়ীটি কে? সুব্রতর বুকটার ভেতর একটা আলোড়ন হ'ত, তার কথা মনে হ'লেই। সুচরিতারা সম্ভবতঃ ভাল আছে, তবে, হয়ত, দিন তাদের "সুদিন" যাচ্ছে না—এই রকমধারা "সম্ভবত" "হয়ত" দিয়ে আরও সঙ্গীন ক'রে তোলা একটা সংবাদ-সমস্যা সেই পত্রটুকু ব'য়ে এনে দিয়ে ছিল। এই রকম সব চুপ চাপের পালা দেখে, সুব্রত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়েছিল। তারা সত্যিই ভাল আছেত? আর—আর, সুচরিতাকে পাবার আশা কি তার একবারে ফুরিয়ে গেছে? সুচরিতা অপরের—সেই সমরেরই— হ'য়ে যায় নি ত' এতদিন? জেলখানা থেকে যখন সে বেরুল, তখন তার মনের গতিক "সাংঘাতিক"।

জেলখানায় ব'সে একখানা বই সে লিখেছিল—দেশের, জাতির এই নব জাগরণের শুধু মর্ম্মকথাটি নয়, এর সভ্যতার প্রাণপ্রতিষ্ঠার মূলমন্ত্রটি, সে তার লেখায় বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল। ভারতের সকল শক্তির মূল আর সেরা শক্তি আধ্যাত্মিক শক্তিটাকে সর্ব্বতোভাবে উদ্‌বুদ্ধ ক'রে চলার পথ তৈরি ক'রে নিতে হবে, যারা পথভ্রষ্ট, আশাভ্রষ্ট তাদের হাত ধ'রে পথে তুলে নিতে হবে—এইটেই ছিল তার আজকের এ আসরে নূতন গানের মূল তান। গানে আজ তার সব্বাই কাণ দেবে না। হয়ত' দেশে যারা চলার পথে গোল বাধিয়েছে, তারা সে গান শুনে কাণে আঙ্গুলই দেবে। ভাববে, ওটা সেই অতীতের প্রেতাত্মার পেত্নীর গান নাকি সুরে! অন্য দেশ—যে দেশের পানে এরা সব হা ক'রে আজ তাকিয়ে আছে—সে দেশের অনেকে হয়ত' কাণ খাড়া করবে। ভাববে—এটা সত্যই আশার বাণী। সুব্রতর অনেক বিলেতফেরত অথবা অফেরত বন্ধু বিস্তু বল্‌তে সুরু ক'রেছেন —"সুব্রত দিন দিন বড্ড মিষ্টিক্, আধ্যাত্মিক, ব্যাক্‌ওয়ার্ডিষ্ট (?) হ'য়ে

পড়ছে।" সুব্রতর চলার পথ "আগে চল" কি "পিছু হাট" তা কে নির্ণয় করবে? আগে পিছু নেই রে ভাই—যেটা সত্য, যেটা শ্রেয়ঃ, যেটা সুন্দর, সেইটেই অনুসরণ করে চল। সন তারিখের টিকিটটে দেখে লাভ নেই।—এইটে বোধ হয় ছিল সুব্রতর কৈফিয়ৎ। শাশ্বতিষ্ট, সনাতনিষ্ট? আবার সেই লেবেল? লেবেল আঁটা না হ'লে বুঝি বাজার দর যাচাই হয় না?

বিনয় সুব্রতর এ বইখানা পাবলিশ ক'রেছিল, আর, সুব্রতর সম্মতির কোন অপেক্ষা না রেখেই, সে তার এক ফোটো বই-এর সঙ্গে ছেপে দিয়েছিল।

জেল থেকে বেরিয়ে সুব্রত প্রথম অবশ্য গেল কল্যাণপুর—তাদের বাড়ী। গিয়ে রাণীমার পায়ের ধূলো মাথায় নিল! সত্যই বিনয়ের নিপুণ ব্যবস্থাতে, আর দেওয়ানজী জেঠামশায়ের দক্ষ তত্ত্বাবধানে, আর সর্ব্বোপরি, তার রাণীমার পুণ্য আদর্শের ও চরিত্রের অমিত মহিমায়, পল্লীতে পল্লীতে কাজ চলিতেছিল ভালই। সুব্রত আসিয়া কাজটাকে আরও গোছাইয়া লইল। পল্লীগঠনের কাজ যে প্রকৃতপক্ষে আত্মগঠনের কাজ—বাইর থেকে গভর্ণমেন্ট কিম্বা মিশন টিশন এসে গঠন ক'রে দিয়ে যেতে পারে না, পল্লীকে নিজেই গ'ড়ে উঠতে হয় সব দিক্ দিয়ে—এইটেই ছিল তার মূল নীতি। ছোট বড় সকল পল্লীবাসীর নিজেদের স্বাতন্ত্র্য-সামাজিকতা এবং স্বামিত্ব-দায়িত্বের বোধ একসঙ্গে জাগিয়ে তুলতে হবে। ডাঙ্গায় সাঁতার শিখিয়ে তাকে জলে নাবাতে চাইলে চলবে না। আর, শুধু ভাসা সাঁতার, চিৎ সাঁতার, এড়ো সাঁতার এসব শিখলেই তার হ'ল না। ডুব সাঁতারও তাকে শিখতে হবে। ভারতীয় প্রকৃতির ও ইতিহাসের যেটা বিশিষ্ট সাধনা ও সংস্কার—তারই গভীর অন্তঃস্রোতগুলোতে ডুব দিতে—"দম্ সামর্থ্যে" ডুব দিতে—শিখতে

হবে। তার যাত্রা পাঁচালী, মচ্ছোব, কথকতা, সঙ্কীর্ত্তন, হরিসভা, মেলা খেলা পরব—এসব অনুষ্ঠান আবার তাজারক্তে সজীব ক'রে তুল্‌তে হবে। তার শিল্প, তার নৈপুণ্য, তাব আমোদ, তার সমবেদনা, তার সাহস, তার সঙ্ঘবদ্ধতা, তার সভ্যতা ভব্যতা! তার সহজ সংস্কার, তার পরীক্ষিত অভিজ্ঞতা, তার বিশ্বস্ত আশা, আনন্দ, শান্তি! কেন্দ্রগুলো সুব্রত একবার ঘুরে ঘেরে আস্‌ল। কর্ম্মীদের ঠিক চলার পথটি দেখিয়ে দিল।

তার সমস্ত সম্পত্তি, স্থাবর অস্থাবর—মায় কলিকাতা থিয়েটার রোডের বাড়ীখানা পর্য্যন্ত—সবই এ কাজে সে উৎসর্গ কর্‌তে পেরে নিশ্চিন্ত হ'য়েছে। এমন কি তার ভদ্রাসন বৃহৎ প্রাসাদটাও কর্ম্মিসংসদের মিলনমন্দির হ'য়েছে। মা তার লক্ষ্মীনারায়ণজীউ এর মন্দিরের পাশে একটা সামান্য বাড়ীতে খ'ড়ো ঘরে থাকেন। সুব্রতও সেখানে এসে থাক্‌ল।

এদিকের কাজকর্ম্ম চুকিয়ে সে একবার বেরিয়ে পড়ল। কোন কাজের নেশাই আজ তাকে মাতিয়ে রাখতে পার্‌ছে না। মায়ের কাছে কিছু দিনের ছুটি নিয়ে সে পশ্চিমে গেল। তার গোপন কম্পাসের কাঁটাটাত' সেই দিকেই ফিরে আছে!

কোথা যাবে?—এল বিনয়ের ওখানে কাটনিতে। সেই পাহাড়ের গায় সুন্দর বাংলোখানা—লাল কাঁকরের রাস্তা। সুষমা বৌদির শুচি শুভ্র আঁচলের প্রান্তেই সে ছুটে এসেছে! সমবেদনা পেতে, একটুখানি সান্ত্বনাও পেতে। কিন্তু সুষমা বৌদি তার বিষাদমুখ দেখে নিজেও মুখখানা "কালো" কর্‌ত সন্দেহ নেই, হয়ত একটু আধটু দীর্ঘশ্বাস, আহা উহুর "রসান"ও দিত তার ব্যথার ব্যথায়! কিন্তু এক একবার সুব্রতর যেন মনে হ'ত—বৌদি তার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে মুখ টিপে

টিপে হাঁস্‌ছেন। কে জানে একি নতুন ভাব তার বৌদির !

একদিন বাংলোর কাছে সেই পাথরের বেদীটায় সে ব'সেছিল তুপুরবেলায়। তখনও বেশ শীত আছে ওদেশে। একটা গাছের ছায়া বেদীটার ওপর প'ড়েছিল—কিন্তু চার ধারের ধবধবে রোদ্দুর আর সেই রোদ্দুরমাখা বাতাস বেশ মিষ্টি লাগছিল। খাঁটী ঝাঝালো সরষের তেল মাখানো গরম গরম চা'ল কড়াই ভাজার মতন বল্‌ব না—বল্‌লে সুব্রতর হয়ত' রসভঙ্গ হবে।

অনেকক্ষণ একলাটি ব'সেছিল সে বেদীটার ওপর। ঐ যে জব্বল-পুরের রাস্তাটা চলে গেছে—তু' একখানা মটরও, সে দিকে ছুট্‌ছিল।

তারা যাচ্ছে কোথায়—জব্বলপুর কি ? কে জানে! কি ভেবে তার চোখ তুটো বোধ হয় জলে ভ'রে উঠেছিল। আঁচলের খুঁটে একবার চোখ তুটো মুছল। চোখ মুছে চেয়ে দেখে—সুষমা পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখখানায় তার সেই চাপা হাসি! বৌদি তার চোখের জল দেখেছে ? দেখেছে বৈকি!

তবু তার মুখের কোণে হাসিটুকু কেন ?

"ঠাকুরপো চোখ তুটো রগ্‌ড়ে রগ্‌ড়ে লাল ক'রেছে যে ? ধূলো টুলো উড়ে এসে প'ড়েছে নাকি ?"

আজকে বৌদির হাঁসিটুকু যে "এগ্রেসিভ্"—তার ব্যথার ওপর চড়াও হ'য়ে পড়ছে। ব্যাপারখানা কি ? সে কিছু বল্‌ল না।

"মুখ নাবিয়ে রাখলে যে! এদিকে তাকাও—দেখি, তোমার চোখ তুটোতে একটু গোলাপ জল দেবার দরকার হবে কি না।"—এবার হাসিটুকু আর অস্ফুট নয়।

"যাও, বৌদি, তুমিও রঙ্গ করছ!" এবার সুব্রত একটুখানি অনুযোগের সুরেই বল্‌ল।

"রঙ্গ নয়গো, ব্যঙ্গ! সত্যি ঠাকুরপো, তুমি সাধ ক'রে রগড়ে রগড়ে চোখে জল বের করছ কেন? বল না, লক্ষ্মীটি"!—কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে সুষমা বল্‌ল।

সুব্রত নিরুপায়—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

তখন স্নেহময়ী—হাস্যময়ী সে আস্তে আস্তে পাশে এসে আঁচল দিয়ে চোখ দুটো তার মুছিয়ে দিতে গেল। সুব্রতও হাতখানা তার ধ'রে ফেল্‌ল—একটু খানি কষ্ট হাসিও হেসেছিল বুঝি সে!

ও মা—বৌদির হাতে ওটা কি? গোলাপ জলের শিশি?—না, একখানা কাগজ—একটা চিঠি।

কার? খামের ওপর ত' সুষমার নাম। লেখাটা কার?—তারি না?—মাণিকপুরে থাকতে তার লেখা সে দেখেছিল বৈকি।

"তোমার ঝাপসা চোখে তুমিত' দেখতে পাবে না ঠাকুরপো, আমিই প'ড়ে শুনোবো?"

সুব্রত খামখানা খুল্‌ল। আঙুল বেজায় কাঁপছিল?

"ভুঁইকম্প না হৃৎকম্প, ঠাকুরপো? অভয় দিচ্ছি—দুর্গা বলে খুলে ফেল দিকিন। আপীলে খালাস ক'য়ে নেয়া যাবে'খন।"—এবার হাসি খিল্‌ খিল্‌।

সুব্রতর হাত কাঁপছিল, কিন্তু এবার সেও হেসেছিল—এবার কষ্ট হাসি নয়, মিষ্টি হাসি!

সুচরিতাই লিখছে। কি লিখছে? কি লিখছে—এক অলকার আসরে সুচরিতার আঁকরগুলো ঘুঁঙুর পায়ে দিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে—তালে তালে সুব্রতর বুকের সবটুকু রক্ত নিয়ে লোফালুকি ক'রে!

"তুমি চিঠিখানা পড় ততক্ষণ। আমি চট্ ক'রে গোলাপ জল নিয়ে এলুম ব'লে"—হাঁসতে হাঁসতে সে পালিয়ে গেল। দুষ্টর শিরোমণি!

বরের ঘরের পিসি, ক'নের ঘরের মাসি! জব্বলপুর লেকের ধারের বাড়ীতে সেই ছোট্ট ঘরটায় সুব্রতর ফটোটা এমনি ধারা একলাটি বেশ ক'রে দেখতে আমন্ত্রণ ক'রেছিল সে সুচরিতাকে। দুষ্ট মতলব ছিল। পরে চোর বামাল শুদ্ধ ধরাও প'ড়ে গিছল।

এখানেও সেই দুষ্ট মতলব বুঝি!

সুব্রত সে চিঠিখানার কোন খানটায় "সিঁদ টাঁদ" দিতে চেষ্টা করেছিল কি না, আর সে সিঁদের চিহ্নটা পরে গোপনে সার্‌তে চেয়েছিল কি না, তা প্রকাশ নেই।

আর সে থানার ইন্‌চার্জ্জ সুষমাদেবীর ডাইরি ঘেঁটে কি হবে?

সেই দিনই সুষমা বৌদির কাছ থেকে সে জান্‌তে পার্‌ল—কোথায় সুচরিতারা অজ্ঞাতবাস কর্‌ছে। সুষমা ত' সুচরিতাকে "প্রমিস্" করে নি যে, সে তার অজ্ঞাতবাসটা গোপন রাখবেই সর্ব্বাবস্থায়। আজ তার বড় স্নেহের ঠাকুরপোর যে "হার্টরেক্" হবার উপক্রম! "এস্ ও এস্" না পাঠিয়ে উপায় নেই যে!

কিন্তু সব তাতেই তার "দুষ্টমি"। সুব্রতর জব্বলপুর লেকে ভিজিট্‌টে যাতে "সারপ্রাইজ" হয়, আর সে ভিজিটে তারা পরস্পরকে যাতে "পরমরমণীয় ভাবে" সারপ্রাইজ কর্‌তে পারে, সে ব্যবস্থা সে কর্‌ল। নৈলে—এ মজার খেলা জম্‌বে কেন? সারপ্রাইজ না হ'লে তার স্নেহের সুব্রত, তার স্নেহের সুচরিতা, প্রথম মিলনের যেটা অনির্ব্বচনীয় পরমরমণীয়তা, সেটা উপভোগ কর্‌তে পারবে কেন? সে কোন "ইনটিমেশন্" দিল না সুচরিতাকে। আর, সুব্রতকেও সে জান্‌তে

দিল না৷ কি দেখে এসেছে, কি বুঝে এসেছে সে, তাদের সেই লেকের ধারে এক রাত্রি বাসের আড্ডাটিতে। শিব নিজে যান্ না, গিয়ে দেখুন—কি তপস্যা করছেন রাজার ঝিয়ারী তাঁর বরের তরে!

সুষমা বিনয়কে সে রাত্রে "পানটান" দিতে এসে বলেছিল—"স্বামীজী, এইবার তোমার মাহাত্ম্য বোঝা যাবে। আমিত' তোমার যোগযাগের সব গোছগাছ ক'রে দিয়েছি।"

বিনয় সুষমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে (পানটানের সেই টানটা বুঝি?) তার সব কিছু যোগযাগের যেটা ছিল মূল যোগাযোগ সেটা সংগ্রহ ক'রে নিয়েছিল।

তারপর দিনই, সুব্রত দড়ি ছেঁড়ে আর কি! বিনয় একটু হেঁসে ব'লেছিল—"এত ব্যস্ত কি, সতু! দিন দুই বাদে এক সঙ্গেই যাওয়া যাবে 'খন মটরে। জব্বলপুরে আমার নিজের একট কাজ টাজও আছে। প্রায় সত্তর মাইল মটর ট্রিপ। মন্দ লাগবে না। পথে কতকগুলো দেখবার মতন জিনিষও আছে।"

অগত্যা তাই।

যাত্রার দিন বৌদি তাদের মটরে তুলে দিতে এসে সুব্রতর কাণে এমন কি একটা কথা ব'লেছিল, যাতে সুব্রতর মুখখানা একেবারে রাঙ্গা হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু চোখ দুটোতে একটা আশার নূতন আলো ফুটে বেরিয়েছিল বুঝি!

সুষমা কি তবে কাণে কাণে তার উলিয়ে টুলিয়ে দিয়েছিল—যেন সে সেদিন বরযাত্রা ক'রেই বেরিয়েছে! ততদূর বোধ হয় নয়। তাহ'লে যে বৌদির পাকা চাল কেঁচে গেল!

কাণাকাণির খবর কি ক'রে রাখবে বল? তবে এটা নিশ্চিত যে, সেদিন যাত্রাকালে সুষমা শাঁক্ টাক্ বাজায় নি।

আর পুঁথি বাড়িয়ে কি হবে? দুদিন বাদে বিনয় সুব্রতকে নিয়ে জব্বলপুর গেল। সেখানে গিয়ে সেই রবার্টসন্ কলেজের ধারে সুব্রতকে সে নামিয়ে দিয়ে গেল। লেক্‌টা পারি দেবার চার্ট আর কম্পাস্ বিনয়কে দিয়ে দিতে হয় নি। সুব্রত লেকের ধারে ধারে হেঁটেই চল্‌ল। একলাই। সে যা অন্বেষণে আজ বেরিয়েছে, তাতে একবার কেন, জনম জনম ধ'রে, সেই বড় লেক্‌টা পরিক্রমা কর্‌লেও সে নিশ্চয়ই আলস্ত হবে না! বিনয় তাকে "চ'রে খাও" ব'লে ছেড়ে দিয়ে গেল বটে, কিন্তু তার অন্তরের সেই গোপন, সজাগ কম্পাসটা তাকে ঠিক পথেই নিয়ে চ'লেছিল। কোথায় অয়স্কান্ত মণিটি তার আছে, ঠিক তারই টানে টানে সে চ'লেছিল! মাঝে দশ বিশটা এভারেষ্ট কি সাইবিরিয়া পেরুতে হ'লেও তার বাধত না! প্রণয়ের এই "ষষ্ঠ" ইন্দ্রিয়টা, অনুভূতিটে অস্বীকার কর্‌বে কে?

চল্‌তে চল্‌তে একটা বড় পাথরের ওপর উঠে এ দিক্ ওদিক্ সে চেয়ে দেখছে! যাযাবর পাখীরা হাজার হাজার মাইল উড়ে কতদিন পরে আবার আপন আপন নীড়ে ফিরে আসে! মাঝে যখন এক আধবার কোন কূলকিনারাহীন সাগরের মাঝখানে একটা জাহাজের মাস্তুলে পাখীটা বসে, তখন সেও এদিক্ ওদিক্ তাকিয়ে দেখে বোধ হয় —কিন্তু সেটা নিশ্চয়ই জাহাজের কম্পাসের কাঁটাটা চুরি ক'রে দেখ্‌বার জন্যে নয়। তার বুকের ভেতরকার কম্পাসটায় তার সংশয় হয়নি, দ্বিধা হয়নি কখনও।

সুব্রতরও চলার পথে সংশয় হয়নি, দ্বিধা হয় নি। কোন্ দিকে কোন্ খানে তার প্রাণের তীর্থ র'য়েছে, তা যে খুবই অনুভব কর্‌তে পার্‌ছিল। তবে, তার পথের পরিপার্শ্ব, তার তীর্থের প্রতিবেশটাও, সে দেখে যেতে চায় যে! সে পথের, সে তীর্থের যেটা প্রতিবেশ,

যেটা অবেষ্টনী, সেটাও না জানি কত সুন্দর, কতখানি মনোমদ!

প্রিয়ের দরশ পরশ যা কিছুর ভেতরে নিজেকে ছড়িয়ে, বিলিয়ে রেখেছে, তাই যে মিষ্টি, তাই যে হৃদ্য, তাই যে প্রিয়!

ঐ আস্‌ছে কে সুপ্রিয় না? সে কিন্তু এখনও মুখ তুলে চায়নি, দেখতে পায়নি।

আর কাঁকে তার ছোট্ট একটি ঘাঘরী নিয়ে কে আস্‌ছে—ঐ পাহাড়টার ছায়ায় ছায়ায় হ্রদের ধারে কালো জলে এই অবেলায় জল ভর্‌তে?

চিরদিনই কি বিশ্বের যত পিয়ারী এমনি ক'রে কালো জলে অবেলায় কলসী ভর্‌তে আসে—যুগ যুগ আস্‌ছে?

নিত্য নব পূর্ব্বরাগ তার বিশ্বব্রজে সেই চিরন্তনী ব্রজকুমারীর!

আর চিরদিনই কি যত প্রাণপিয়াসী অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, কনক কলসে ছল্‌কে-পড়া জলে সিক্ত অভিসার পথে প্রিয়ার তার প্রস্ফুটিত-চরণাঙ্ক-পদ্ম-পরিমল-মধুটুকুর আস্বাদ-স্পন্দ প্রাণের আকুল চুম্বনে আহরণ কর্‌তে!

সুচরিতা কি সেই চিরন্তনেরই একটা নিত্য নূতন রূপ—আর, সুব্রত আর একটা?

এবারত' ভুল হয়নি তাদের!

দুজনেই তারা দুজনের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল! তাকিয়েই চিনেছিল! শুধু চিনেছিল? সেই তাকানোতেই তাদের অন্তরতম দেশে মিলন হ'য়ে গেছিল; তারা দুজনে দুজনের কাছে ধরা দিয়ে ফেলেছিল!

অন্তরের গভীরতম সত্যপ্রত্যয়ে আরত' তাদের সংশয়ের, উৎকণ্ঠার

বালাই নেই। অথচ একটিবার থমকে দাঁড়িয়েই সে চ'লে গিয়েছিল। আর ফিরে চায় নি!

"এই সে সুব্রত দা"—সুপ্রিয় এবার তাকে দেখতে পেয়ে ছুটে আসছে।

তারা পরস্পরকে বুকে একবার জড়িয়ে ধরল।

তারপর, হাত ধরাধরি ক'রে আস্তে আস্তে বাড়ী পানে চলল।

পঞ্চদশ

সুচরিতা সেদিন হ্রদের জলে স্নান করতে গেছল। কোন কোন দিন যায়। সেখানে ত জনমানব নেই। দূরে লেকটার ওধারে—রবার্টসন কলেজ দেখা যেত। হ্রদের জলে সাঁতার কাটতে তার ভারি ভাল লাগত। কোনদিন সুপ্রিয়ও সঙ্গে যেত, কোন কোন দিন সে একলা।

তখন বেলা দশটা সাড়ে দশটা হবে। ভিজে কাপড়টা ছাড়তে সে আপনার ঘরটাতে গেল। মৃত্যুঞ্জয়বাবুরা অন্য ঘরে ছিলেন। খানিকক্ষণ ভিজে কাপড়েই জানলার গরাদে ধ'রে দাঁড়িয়ে থাকল সে। বাইরের দিক তাকিয়ে। কিন্তু মাথামুণ্ডু কিচ্ছুই সে তখন দেখছিল না। দেখছিল যা, তা সেই জানে, আর তার অন্তর জানে!

বুকের দপদপানিটে থামে না যে!

বাবাকে মাকে গিয়ে কি ক'রে জানাবে তাদের সেই নতুন অতিথির কথা? সুপ্রিয় সুব্রতর হাত ধ'রে যখন বাড়ীর রোয়াকে এসে দাঁড়াল, তখনও সে আপনার ঘরটাতে দাঁড়িয়ে জানলার গরাদে ধ'রে—সেই ভিজে কাপড়ে! কলসীটে যে তার কখন নামিয়েছে, কোথা নামিয়েছে, তা তার তখন মনে নেই! আর কিই বা মনে আছে তার তখন?

"মা—" সুপ্রিয় র'ক থেকেই মাকে ডাকল। "দেখ—আজ কাকে নিয়ে এসেছি।"

সুচরিতার ঘরটা বাড়ীর ওপিঠে। তা হ'লেও সে র'কে পায়ের শব্দ শুনে বুঝেছিল—কোনটা দাদার, আর কোনটা তাদের আজকের অতিথির!

বুঝবে না ?—দুখানা বীণ যে ঠিক এক পর্দাতেই বাঁধা। একটার তারে মৃদু পরশের লেশটি লেগেছে কি না লেগেছে, আর অমনি অন্যটার তারে তার অনুরণন গুঞ্জরে উঠেছে!

সাগরসৈকতে অগুনতি বালির ভেতরেও একটা বালি ঠিক চিনে নেবে, বেছে নেবে তার সমদরদী বালির কণাটিরে! ভুল হবার যোটি নেই!

সুরে সুরে ছন্দে ছন্দে এমন বাঁধাবাঁধি!

মা বেরিয়ে এলেন। তিনিও দেখে আনন্দে, আর বোধ হয় একটা কি গোপন ব্যথায়, একটুখানি যেন কেঁপেছিলেন!

সুব্রত পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করল্।

"এস, বাবা, এস"—তিনি মাথায় হাত বুলিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন।

তাঁরা সব্বাই ঘরে ঢুক্লেন। সেখানে মৃত্যুঞ্জয়বাবু এলিয়ে প'ড়েছিলেন একটা জীর্ণ মলিন বেতের ইজিচেয়ারে। সাধারণ একখানা খাটে সামান্য একটা বিছানা। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরে আন্লা টান্লাও নেই। বোধ হয় দড়িতেই কাপড়চোপড় ঝুল্ছে। আস্বাব পত্তর কিচ্ছুই নেই।

সেই সঙ্গতিপন্ন, সুশিক্ষিত, মার্জ্জিতরুচি, সৌখীন মৃত্যুঞ্জয়বাবু আজ এই কুঁড়ে ঘরে, কাঙ্গালের সাজে!

তাঁর শরীরের দিকে চেয়েও সুব্রত চম্‌কে উঠেছিল। চুলগুলো ধবধবে হ'য়ে গেছে। চোখ দুটো দীপ্তিহীন, কোটরে। লোল চর্ম্ম। একেবারে যেতে ব'সেছেন যে!

গৃহিণীরও অবস্থা প্রায় তথৈবচ।

মা একখানা আসন দিলেন। সুব্রত তাতেই বস্ল। একখানা পাখা দিয়ে মা তাকে বাতাস করতে লাগলেন।

সেই মাণিকপুর ডাকবাংলোয় তাকে খেতে বসিয়ে মা এম্‌নি ক'রে পাখার বাতাস দিচ্ছিলেন। আর,—খাবার এনে দিচ্ছিল তখন কে—?

মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সেই "শেষ" অবসাদ আর নৈরাশ্যের ভেতর থেকেও একটুখানি হাসি ফুটে বেরিয়ে এসেছিল।

"এখানে এসে আপনাকে নেমন্তন্ন রক্ষে কর্‌তে হবে, তাত' ভাবিনি। আপনি এসেছেন—সত্যিই বড্ড সুখী হ'য়েছি। বিনয়বাবু আর তাঁর স্ত্রী ভাল আছেন ত'? কি চমৎকার লোক তাঁরা দুটিতে! সেই এক রাত্তিরেই কত আপন ক'রে নিয়েছিলেন আমাদের! সুচরিতার মুখে ত' লেগেই আছে তাঁদের কথা!"

সুষমা সুব্রতকে সব কথাত' ভেঙ্গে চুরে বলে নি—কেমন ক'রে, কি অবস্থায় সে রাত্তিরে বিনয় আর সে এই বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছিল, আর এখানে সেদিন কি হ'য়েছিল না হয়েছিল।

সুব্রতর চোখে জল আস্‌ল। আস্তে আস্তে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পদধূলি নিল। তিনি তাঁর জীর্ণ শীর্ণ হাতখানি তুলে সুব্রতর মাথায় একবার রাখ্‌লেন। "হাঁ, বিনুদা বৌদি এঁরা ভালই আছেন। বিনুদাও কি এক জরুরি কাজে আমার সঙ্গে জব্বলপুর এসেছেন। আমাকে ঐ কলেজের কাছটায় নাবিয়ে দিয়ে গেলেন। আজ কাজ টাজ সব সেরে সময় যদি নাই কর্‌তে পারেনত', কাল সকালে এসে নিশ্চয়ই আপনাদের সঙ্গে দেখা ক'রে যাবেন, ব'লেছেন।"—সুব্রত বল্‌ল।

"জব্বলপুর এসে দেখা না ক'রে যাবেন, একি হয়! আপনি জেল থেকে বেরুলেন কবে?"

"মাসখানেক। বেরিয়েই বাড়ী গেছলুম মার কাছে। তার পর দিন তুচ্চার হ'ল কাটুনি এসেছি।"

"আপনার নতুন বইখানা দেখছিলুম। ভারি থটফুল্ অথচ এন্‌গেজিং

লেখা আপনার! আপনি যে পথ দেখিয়েছেন—সেইটেই পথ, এ বিশ্বাস আমারও হচ্ছে। এই ভাঙ্গন গড়নের দিনে একটা কিছু শক্ত ক'রে আমাদের ধ'রে থাকতেই হবে! আর সেটা হচ্ছে এ দেশের কাল্‌চারের যেটা স্পিরিট, সেইটে। ফর্ম্ হয়ত' কতকটা বদলে যাবে। কিন্তু তারও আসোল কাঠামোটা বজায় থাকা উচিত ব'লেই মনে হচ্ছে।"

এই নিয়ে সামান্য একটুখানি আলোচনা হ'ল তাঁদের দুজনের।

মা ডেকে নিয়ে গেলেন পাশের ঘরটাতে—কিছু জলটল খেতে। সে ঘরটাও খুব সাদাসিদে রকমের। সুপ্রিয় থাকে বুঝি সেটায়? ঘর মোটে তিনখানা। ছোট ছোট রান্নাঘর ভাঁড়ার ঘরও দুটো ছিল।

"মা চরিতা, সুব্রতকে খাবারটা দিতে যাও"।—মা ডাকলেন।

সুচরিতা খাবার নিয়ে এল। সুব্রত মুখ তুলে চাইতে পারে নি। শুধু পা দুটি তার দেখেছিল—কত না মুগ্ধ পিপাসিত দৃষ্টিতে! কত সুন্দর তার পা দুটি!

সেও বোধ হয় সুব্রতবাবুর মুখের পানে চোখ তুলে চাইতে পারে নি।

খাবারের থালা নামিয়ে দিল। তার খদ্দরের সাড়ীতে কি একটা মিষ্টি বাস—ধূপ আর চন্দনের বুঝি!

খাবার সামান্য। একটু গরম গরম হালুয়া। আর কিছু ফলটল। সুব্রত যে চা খায় না, তা সে জানত।

ব্রত যেন আবিষ্টের মতন খেয়ে গেল।

সুপ্রিয় আর গৃহিণীর সঙ্গে খেতে খেতে দু'চারটে কথা সে ক'য়েছিল বৈকি—কিন্তু কোন্ কথার পর কোন কথা তা তার মনে নেই।

সুচরিতা সে ঘরে ছিল না।

"বাবা, এসেছ, ছুদিন থেকে যাচ্ছত'? সেই মাণিকপুরে কি অসময়ে তোমাকে ভগবান্ মিলিয়ে দিয়েছিলেন! আজও তোমায় যে আদর যত্নটুকু করি, তার উপায়ও রাখেন নি ভগবান্।"

তাঁর চোখে জল এসেছিল।

একটু সাম্‌লাইয়া আবার বলিলেন—

"বিনয়বাবুর মুখে সবত' শুনেছ বাবা?"

স্থব্রতর ভেতরটাও তখন দরদে ভ'রেছিল। সে সংক্ষেপে উত্তর দিল—

"হাঁ।"

"তুমি ত' শুনেছি, বাবা, তোমার রাজার ঐশ্বর্য্য সব তোমার গরীব ভাইদের বিলিয়ে দিয়েছ। তোমার বইখানা চরিতা আমাকে প'ড়ে শোনায়। কত আহ্লাদ ক'রে যে, তা আর বলার নয়। বইখানাতে চলার যে পথ তুমি দেশকে দেখিয়েছ, নিজেও তুমি সেই পথেই চ'লেছ, বাবা! ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার শুভ মহৎ অভীষ্ট পূরণ হোক্!"

স্থব্রত চুপ করিয়া রহিল কিছুক্ষণ।

"স্থপ্রিয় কালেজে যায় না?"

"না, বাবা, এ সেসন্‌টা সে পড়া বন্ধ রেখেছে। ছুপুরে স্বদেশী ষ্টোরে আর ব্যাঙ্কে কি কাজকর্ম্ম করে! সেই এখন আমাদের অবলম্বন।"

স্থপ্রিয়ই সামান্য কিছু রোজগার ক'রে সব চালাচ্ছিল। অন্য কোনও আয় ছিল না তাঁদের।

জলখাবার শেষ হ'লে উঠে সে আবার আগের সেই ঘরটাতে গেল। স্থপ্রিয় ততক্ষণ চাট্টি খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রেছে। বাইকে ক'রে সে টাউনে কাজে বেরিয়ে গেল।

"দাদা, আজ আর আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন না ত'?"—বেরুবার সময় সে স্বব্রতকে ব'লে গেল।

স্বচরিতা আড়ালে আড়ালেই ছিল। বোধ হয় রান্নাঘরে-টরে আছে সে। গৃহিণীও রান্নাঘরের দিকে গেছেন। স্বব্রত কিছুক্ষণ মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করিল। দেখ্‌ল—তাঁর যেন ঘুম ঘুম পাচ্ছে। রাত্তিরে ভাল ঘুম হয় না। দিনমানেই যখন তখন একটু তন্দ্রার মতন হয় বুঝি। স্বব্রত আস্তে আস্তে উঠিল। ওধারের ঘরটা সে দেখে নি। সেটার ভেতর থেকে চমৎকার ধূপের আর ফুলের গন্ধ একটু একটু আসছিল। ঘরের দরজা ভেজান' ছিল না।

সে আস্তে আস্তে সেদিকে গেল। খালি পায়ে। ঠাকুরঘর বুঝি? সেদিকে স্বচরিতা নেই ত'?

দরজার কাছে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল সে। পা তার উঠল না।

স্বচরিতার ঘর সেখান। ঘরের এক পাশে পূজোর যায়গা তার। সেইখানে আসন পেতে ব'সে আছে সে। পরণে শিউলী ফুলের বোঁটা দিয়ে ছোবানো খদ্দরের সাড়ী। চুলগুলো পিঠের ওপর এলানো।

সাম্‌নে তার সামান্য একটু উঁচু বেদীর মতন। তারির ওপর তার দেবতার মূর্ত্তি বুঝি আছে। স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল না। টাট্‌কা ফোটা ফুল দিয়ে ঢাকা বল্‌লেই হয়। বাড়ীতে ফুলগাছ অনেকগুলো ছিল। ফুলের দুঃখু নেই! ধ্যাননিরতা প্রতিমাটির মতন সে ব'সে আছে। বাইরের কোন সাড়াই বুঝিবা সেখানে পৌছুচ্ছে না।

তপস্বিনী নির্ব্বাক হেমপ্রতিমা!

মিনিট দুত্তিন সৌম্য মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে স্বব্রত আবার ফিরে

গেল। কেউ তাকে দেখতে পায় নিত', মৌন-পূজা-নিরতা জান্‌তে পারে নি ত'?

সে এসে ফুল গাছগুলোর ভেতর দাঁড়িয়ে আছে। মা রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে বল্‌লেন—

"স্নান করবে না বাবা? অনেকখানি বেলা হ'য়ে গেল। চরিতা ঝরণার জল তোমার জন্যে টবে করে ধ'রে রেখেছে। এস, তেল মাখবে।"

তেল মেখে সুপ্রিয়র গাম্‌ছাখানা নিয়ে বেরুল—হ্রদের দিকে।

"হ্রদটাতেই চান ক'রে আসি মা। এইত' কাছেই। ইচ্ছে কর্‌ছে।"

"আচ্ছা যাও। বেশী সাঁতার টাঁতার কেটনা কিন্তু। যে ঠাণ্ডা জল! চরিতা আমার ঐ ঠাণ্ডা জলেই যে কতক্ষণ প'ড়ে থাকে!"

দেরি কর্‌ল না সে। হ্রদের ধারে এক ঘুপচি যায়গায় একখানা ছোট্ট বোট বাঁধা আছে, তাও দেখল। তাদেরি হবে বোধ হয়। জল সেখানটায় গভীর, কিন্তু কিনারা থেকে একটা ডুবো পাথর অনেক দূর পর্য্যন্ত চ'লে গিয়েছিল। তার ওপর ব'সে দাঁড়িয়ে স্নানের ভারি আরাম।

ফিরে বাড়ীতে এসে ঢুকছে—ভারি স্নিগ্ধ কোমল পরদায় একটা স্তবের সুর তার কাণে গেল। কথাগুলো ঠিক বোঝা গেল না—তবে, বোধ হ'ল শ্রীকৃষ্ণের স্তব, গোপীরা কোন সময় ক'রেছিল।

আহার হইল। সুচরিতাই সব দিয়ে থুয়ে গেল। মা কাছটায় ব'সে পাখার বাতাস কর্‌ছিলেন।

"কষ্ট হচ্ছে নাত' বাবা? তোমার মুখে আজ কি তুলে দিচ্ছি!"

"না, মা, খুব ভাল লাগছে।"—সত্যিই এত ভাল আর তার কোন

দিন লাগে নি। যোগাড় অতি সামান্যই। কিন্তু কি আনন্দ, কি তৃপ্তি তার আজ খেয়ে!

পাহাড়ের নিভৃত প্রদেশে অজ্ঞাতবাস কর্‌ছেন ওঁরা,—কুঁড়ে ঘর, গরীবের ক্ষুদকুঁড়ো। কিন্তু তার প্রাণের যথাসর্ব্বস্ব যে সেখানে—সেই কুঁড়ে ঘরেই,—সেই অভাব, দৈন্য আর কৃচ্ছ্রের ভেতরেই!

"রান্না বান্না চরিতাই করে বাবা। আমায় কিছু কর্‌তে দেয় না। আমি আজ তোমার জন্যে গরম ভাত কটা শুধু নাবিয়ে নিয়িছি।"

রান্না বান্না সামান্য হোক্‌—সত্যিই চমৎকার। সাধাসিধে রান্না, এমন কি সেদ্ধপক্কর ভেতরেও যে একটা চমৎকারিতা, একটা অপূর্ব্ব উপাদেয়তা থাক্‌তে পারে, এটা সকলে স্বীকার কর্‌বেন কিনা জানিনে; কিন্তু সমজদার কেউ কেউ বোধহয় কর্‌বেন। আর, স্থব্রতর করারত' বলবৎ স্বতন্ত্র কারণও ছিল।

খাওয়া দাওয়ার পর, সামান্য একটু গা গড়ালো সে স্থপ্রিয় ঘরটায় গিয়ে। চোখ মেলেই ছিল। জান্‌লা দিয়ে একটা পাহাড়ের নেড়া মাথা দেখা যাচ্ছিল। টিকিটেও নেই! আর, কোত্থেকে একটুক্‌রো সাদা মেঘ এসে মাথায় তার গান্ধী ক্যাপ পরিয়ে দিচ্ছিল! হাওয়া যেন কার পরওয়ানা নিয়ে এসে ক্যাপটা রোখ ক'রে খুলে দিতে চাচ্ছিল—কিন্তু পাহাড়টা অনড়, অচল। কিছুতেই তার মাথাটা নোয়াবে না! আইডিয়াল্‌ সত্যাগ্রহী!

স্থব্রত দেখছিল, আর একটু একটু হাঁসছিল। আজ তার ভেতরে একটা গোপন অনাবিল, নিশ্চিন্ত হাসির ঝর্‌ণার মুখ বুঝি খুলে গেছে! সেই বন্যেয়, সেই দেশের কাজে, সেই জেলে—কোথাও এতদিন সে ঝর্‌ণাটির মুখত' খোলে নি!

এক হাতে এক গ্লাস জল, আর একটা রেকাবিতে ক'রে পান নিয়ে

এসে সে হাজির। দরজার কাছে একটিবার থমকে দাঁড়াল—চোখদুটো নত ক'রে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল। সেই রেলগাড়ীতে কাঁচের গ্লাসে জল ভ'রে এম্‌নি ক'রে সে তার দিকে এগিয়ে এসেছিল। সেই তার, তার দিকে প্রথম পা ফেলাটি। সে ছবি সে কোনদিনই ভোলেনি। আজকে ছবিটে কিছু না কিছু বদ্‌লেছে বৈ কি!

কিন্তু এত পেলবসুন্দর, এত সরসমধুর সে বদ্‌লানোটুকু!

"এখনও খান নি, আপনি?"

মুখখানা ঈষৎ অন্যদিকে ফিরিয়ে সে বল্‌ল—

"না,"—প্রায় অস্ফুটস্বরে। কিন্তু কাণে নয়, প্রাণের কাছে, সেটা বুঝি পৌঁছুবার জন্য!

"অনেক দিন খবর পাইনি। ভাল ছিলেন ত'?"

"হাঁ,"—স্বর পূর্ব্ববৎ। "না" "হাঁ"—এই সামান্য দুটো কথা কি বুকের রক্তে এমনধারা একটা মধুহিল্লোল তুলে দিতে পারে! আগে জানা ছিল না!

সুচরিতার চোখদুটো আর ওঠে নি। আঙুল দুটো আঁচলের খুঁটে বাঁধা কি জানি কি একটা সমস্যা সমাধানে সেবারও নিযুক্ত ছিল!

"খেতে আপনার বড্ড বেলা হ'য়ে গেল যে।"

"যাই"।—যেন মানবীর গলা থেকে বেরোয় নি—কোন্‌ নীপকুঞ্জের মঞ্জরীগুলোর ভেতর নব বসন্ত প্রথম ফাগুনে মৃদুল দোদুল দোল খেয়েছিল!

শীত তখনও বেশ র'য়েছে—রোদ্দুর বেশ মিষ্টিই লাগে। আর, সেই সুন্দর পাহাড়গুলোর অবকাশে অবকাশে হাওয়া বেশ একটুখানি তেজেই বইতেছিল। পাহাড়গুলোর গায়ে কোথাও ফুকর আর পরদার ঘাট বাঁধা ছিল বুঝি? নৈলে, মাথার ওপর ঐ নীল আকাশ লম্বা পাহাড়টাকে

একটা বীণার মতন কোলে ফেলে, হ্রদের ফটিক জলে নীল আভার চরণ ছড়িয়ে দিয়ে, তার হাওয়ার চঞ্চল আঙ্গুল গুলো দিয়ে, একটা দুর্জ্জয় মান-করা পাহাড়ী স্থরের মানের মূর্চ্ছনাগুলো দেখিয়ে দিচ্ছিল কেমন ক'রে ?

স্থব্রত চুপ ক'রে ঘরে ব'সে থাক্‌ল না। বাড়ীটের চার ধারে অনেকগুলো ফুলফলের গাছটাছ ছিল। চারধারের পাহাড়গুলোর গায়েও গাছপালা ছিল। আর, লেকটার ধারে তাদের শোভা সত্যিই রমণীয় ! মৃত্যুঞ্জয়বাবুরা জব্বলপুরে অনেকদিন থেকে আছেন। জব্বলপুরে তাঁদের স্থন্দর বাংলোখানা ত' আমরা আগেই দেখেছি। তিনি একদিন লেকের এই ধারটা বেড়াতে এসে যায়গাটা খুব পছন্দ ক'রে গিয়েছিলেন। এখানে একটা "রিট্রিট্" কর্‌লে মন্দ হয় না ভেবে ছিলেন। খানিকটে যায়গা বেছে নিয়ে,—যেখানে পাহাড়ী ঝর্‌ণাটা ব'য়ে যাচ্ছে—সেইখানে একজন মালী রেখে একটা ছোট্ট বাগান কর্‌বার মতলব ক'রেছিলেন। ফুলফলের গাছ কিছু কিছু লাগানোও হ'য়েছিল। ঘর দুয়োর তেমন কিছু তৈরি করা হয়নি। অবস্থাবৈগুণ্যের সময় সেই "রিট্রিট্"টেই তাঁদের শেষ আশ্রয় হ'য়ে দাঁড়াল। জব্বলপুরের বাংলো যখন ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়, তখন স্থপ্রিয় আর স্থচরিতা এসে মালীর আড্ডাটাকে একটুখানি গোছগাছ ক'রে নিয়ে ছিল। মালী এখন আর নেই।

স্থব্রতর চোখে আজ সবই স্থন্দর। কিন্তু পাহাড়ের বুকে লুকোনো এই "পাখীর বাসাটার" তুলনা সে যে কোথাও দেখেনি—সারা দুনিয়ার কোথাও—এ পক্ষে সে নিঃসংশয় হ'য়েছিল। সে এসেছে তার রাজ-প্রাসাদ সাধ ক'রে "ভাই বোন্‌দের" বিলিয়ে দিয়ে ; এঁরা এখানে এসে বাসা বেঁধেছেন দাবানলে তাঁদের যথাসর্ব্বস্ব যখন পুড়ে গেছে, তখন পালিয়ে এসে ! তারও সেটা যে সাধ ক'রে, এমন নয়। তারও বুকে

দাবানল জ্বলে নি? যদি তার প্রাসাদটা আঁকড়ে ধ'রে প'ড়ে থাকত, তা হ'লে সেও কোন্‌দিন পুড়ে মরত! নয় কি? দেশে একটা মহাবন্যে এসেও দাবানল নিভুতে পারে নি। তবে, বন্যের স্রোতে প্রথম ঝাঁপিয়ে প'ড়ে সে মুক্তির একটা পথ পেয়েছিল বৈ কি! তার পাখাদুটো শুধু কেন, বুকটাও ঝল্‌সে গিয়েছিল কিন্তু। এঁরা যেখানে পালিয়ে বেঁচেছেন, সেও ঠিক সেই খানে এসেই সর্ব্বনেশে জ্বালাটা থেকে মুক্তি পেয়েছে। তার মুক্তি, তার শান্তি, তার আশা, তার সিদ্ধি—সবই এই কুঁড়ের স্নিগ্ধ ছায়াটুকুতে! নিজেকে অতিথি সে ভাবতে পারল না। পরের ঘর এটাত' তার নয়। এইটে—হাঁ—এইটেই তার সত্যকার আপন ঘর!

বাগানটুকুতে ঢুকে দেখে সুচরিতা ব'সে ব'সে নিড়নি দিয়ে ফুল আর ফলের গাছগুলোর গোড়া খুঁড়ে দিচ্ছে। বলা নেই কওয়া নেই—সেও গিয়ে লেগে গেল সেই কর্ম্মে। সুচরিতা কিচ্ছু বল্‌ল না। মুখ তুলে চেয়ে একটুখানি হেসেছিল শুধু। সেও তা হ'লে দেখ্‌ছি তা'কে নিতান্ত অতিথি অভ্যাগত ভাবে নি!

গোড়া খোঁড়া হ'য়ে গেলে, একটা গাছের ছায়ার একখানা পাথরের ওপর সুচরিতা ব'সে খদ্দরের সাড়ীতে আর চাদরে সুঁচ দিয়ে ফুল তুল্‌তে লেগে গেল। তাতেও কিছু রোজগার হ'ত তাদের। সুপ্রিয় কাজ নিয়ে আস্‌ত। আর—সুব্রত মাটিতে ব'সে টেকোয় সুতো কেটে দিতে লাগল। টেকোর সুতো ভাঁজ ক'রে ক'রে তার হাতে তুলে দিতে লাগল। শুনে আশ্চর্য্য হ'চ্ছ?

চলচ্চিত্রটা, ফিল্‌মটা বেশ, কিন্তু "টকি" নয়!

কত মন দিয়ে সুঁচে করে ফুল তুলে যাচ্ছে সে, আর মধ্যে মধ্যে চোখের পাতার আড়ে আড়ে সুব্রতর কীর্ত্তিকলাপটি দেখে

নিচ্ছে। খুব মৃদু কিন্তু মধুর একটা হাসির আভাষটুকু মাখা ছিল তার সেই ফোটা ফুলের মতন মুখখানায়! কোন্ গন্ধর্ব্বলোকের রূপদক্ষ এসে ব'সেছে আজ কোন্ অজানা নিপুণিকা অপ্সরার পাদপীঠ ঘেঁসে—আপনার শ্রেষ্ঠ শিল্পকলা পরীক্ষায় যাচাই ক'রে নেবার জন্তে!

অনেকক্ষণ কেটে গেছে এই ভাবে।

বিকেলের দিকে সুব্রত বাল্তি ভ'রে ভ'রে জল নিয়ে আস্ছে ঝরণা থেকে, আর ঢেলে দিচ্ছে সুচরিতার ঝাঁঝরিটিতে; আর সে সেই ঝাঁঝরির জল জুগিয়ে বেড়াচ্ছে ফল ফুলের গাছগুলোর মূলে মূলে! ভাল রে মালঞ্চের নতুন মালী মালিনী!

বেশীক্ষণ তা সে পার্বে কেন—সুচরিতা? হাঁপিয়ে প'ড়েছে! মুখখানাময় ঘামের বিন্দু বিন্দু কণা—সেকালের কবিরা হলে বল্তেন, ফোটা পদ্মের পাঁপড়িতে যত টল্‌টলে শিশিরবিন্দু! আবার সেই পাথর খানার ওপর সে ব'সেছে—ঘন ঘন পড়ছে শ্বাসটুকু। সুব্রত কোত্থেকে এক ফুল-ফোটা মধুমালতীর ডাল ভেঙ্গে নিয়ে এসে পেছন থেকে তাকে হাওয়া কর্তে লেগেছে যে। ভালরে ভাল!

"যাও—যান্"—ব'লে হাত থেকে তার ডালটা কেড়ে নিয়ে চলে গেল। "যাও" ব'লে ফেলেছে সুব্রতকে! এ্যাঁ—! লজ্জায় জিবটা একটুখানি কাটল বুঝি! ডালটা কিন্তু ফেলে দেয় নি! মধু মালতীর বাস নেবার ছল করে, মুখের কাছে—খুব কাছে নিয়েছিল সেটাকে। দিনমানে মধুমালতীর বাস থাকে বুঝি? তরুণী মালিনী আমাদের তা খুবই জান্‌ত। ছলটি তার কেউ ধর্তে পেরেছে কি না দেখতে আড়চোখে একবার পেছন ফিরে চেয়েছিল! তা আর পারতে হয় না কারুর!

সুব্রতর মনের গুপ্ত গোয়েন্দা-বিভাগ বলেছিল—"ও মাই সুইট্ পাব্‌জারার্!"

নাছোড়বান্দা আজ বুঝি সে! পেছন পেছন সুব্রত গেল। সংসারের যত সব খুঁটানাটী কাজ। সুব্রত সে সব তাতেও আজ ভাগ নেবে। মায় উনোন ধরানোর ধোঁয়ায় চোখ লাল করা পর্য্যন্ত।

মা তফাৎ থেকে মাঝে মাঝে সুব্রতকে দেখছিলেন, আর একটু হাঁস্‌ছিলেন। আজ তাঁর ভাঙ্গা বুকের হাড় ক'খানাও যেন কতকটা মেরামৎ হ'য়ে গেছে!

সেদিন সন্ধ্যেয় আর মেঘ টেঘ ছিল না। আকাশ নির্ম্মল। চাঁদ উঠবে'খন।• সন্ধ্যার একটু আগে মা বল্‌লেন—"চরিতা, সুব্রতবাবুকে নিয়ে বোটে একট খানি লেকের ওপর ঘুরিয়ে আস্‌লে পার্‌তিস্। বাছা যে হাঁপিয়ে পড়বে সারাক্ষণ এক যায়গায় ব'সে।"

সারাক্ষণ ব'সে বৈ কি! আর, বাছা যে বড্ড হাঁপিয়ে প'ড়েছিল—আহা!

এত সুখে দিন তার জীবনে কখনো কাটে নি—অনির্ব্বচনীয়, অতুলনীয়—এ সব বড় বড় বিশেষণগুলো ব্যবহার ক'রে কাজ নেই!

বেড়াতেই গেল। দুজনে একলা। সুপ্রিয় অনুপস্থিত। সন্ধ্যার পরও তার টাউনে একটু কাজ থাকে। ঘণ্টা খানেক ছেলে পড়ান' নাকি?

লেকের ওপর এসে সারাদিনকার মৌনব্রত ভঙ্গ ক'রেছে। আর এখন শুধু অবলায় অচাওয়ায় কথা কওয়া-কয়িই নয়!

সব কথা আস্তে আস্তে সুচরিতা সুব্রত শুনিয়ে গেল। ম্যুভমেণ্টে তার নাব্‌বার কথা—কেন নেবেছিল সে?—জাতীয় রাখীবন্ধনের দিনের কথা—অসুখের কথা—বাবার অবস্থা বৈগুণ্যের কথা। কেবল

যে যে পয়েণ্টে সুব্রতর সঙ্গে তার যোগ, সেই সেই পয়েণ্ট যেন ইচ্ছে ক'রেই ঢেকে যাচ্ছিল।

এমন কি, মার্ব্বেল রক্‌সে সেই সমরেন্দ্রর এডভেন্‌চারের কথাও। কিন্তু "কমিক্" ক'রে দেখাল না সেটা সে। যেন বল্‌তে তার ব্যথাই লাগে!

তখন লোকের ভেতরে অনেকদূর তারা চ'লে গেছে। হঠাৎ—সেই বালীগঞ্জ লেকে সুজাতা যেমন ক'রে প্রশ্নটা ক'রেছিল—সুব্রত জিজ্ঞেস কর্‌ল—

"সমরবাবু আপনাকে বে করার প্রস্তাব করেন নি?"

একেবারে বের প্রস্তাবের কথা? সুচরিতা ঘাড় নেড়ে উত্তরটা দিল। তখন চাঁদও উঠেছিল।

"আর আপনি?"

এবার—একটুক্ষণ ঘাড় নীচু ক'রে চুপ ক'রে থেকে—সুচরিতা তার সেই অতুলনীয় নয়ন দুটির পূর্ণ-উন্মেষ সুব্রতর নয়নের ওপর ফেলিল। পলক ফেলিল না—তেমনি ক'রেই চেয়ে রইল! কতক্ষণ? এক মুহূর্ত্ত? না, অনন্ত এক মুহূর্ত্ত?

সব প্রশ্নের যা কিছু জবাব, তা সবই তার পাওয়া হ'য়ে গেলত'?

কিন্তু—পলকহীন দৃষ্টি তার সজল হ'য়ে এল কেন? ঐ যে গালদুটি বেয়ে জল গড়িয়ে পড়্‌ছে!

সুব্রত কাছে স'রে এসে হাত দুটি তার নিজের হাতে নিল। এই প্রথম স্পর্শ! আর—আর, বুকের কাছে টেনে নিয়ে তার চোখের জল মুছিয়ে দিতে গেল।

একি তাসের ঘর যে ছুঁলেই প'ড়ে যাবে? রীতিমত দুর্গজয় কর্‌তে হবে গো, তা বোঝ না, অবুঝ গরজী?

সে নিজেকে সরিয়ে নিলে। খুব জোর ক'রেই নিজের চোখের জলে বাঁধটা বেঁধে ফেল্‌লে। কিন্তু হাত দুটি তার সুব্রতর হাতেই রৈল যে! দুর্গ পরিখায় সেতু পাতাই রইল তবে? ক্যাপিচুলেশনের গোপন সলাপরামর্শ চল্‌ছে? আর—আর চাঁদপানা মুখখানা তার নীচু ক'রেই একটা ভারি মিষ্টি আড়চাহনিতে সে সুব্রতর দিকে চেয়েছিল। বস্‌—ক্যাপিচুলেশন্ সন্ধিপত্রে সই হয়ে গেছে!

"ঘরে ফিরে চলুন"—আস্তে আস্তে বল্‌ল সে। হাত দুটো তার তখনও সুব্রতর হাতে। বন্দী তারা দুইজনেই দুজনের কাছে। নৌকো বাইবে কে?

যাক—বাড়ী ফিরে এল তারা। স্বর্গের হাওয়া নৌকো বেয়েছিল! আর, আকাশের ধ্রুবতারা হা'ল ধ'রেছিল!

তখনও সুপ্রিয় আসে নি। মৃত্যুঞ্জয়বাবু একলাটি কি একখানা বই দেখ্‌ছিলেন। মা বোধ হয় রান্নাঘরে।

"একটা কথার জবাব এখনোত' পাইনি"—সুব্রত অনুচ্চস্বরে চরিতাকে বল্‌ল বাড়ীতে ঢোকার আগে।

"কোনদিন জিজ্ঞেস করেন নিত!" চরিতাও অনুচ্চস্বরে ব'লেছিল।

"সেই রেলগাড়ীতে যেদিন প্রথম দেখি, সেদিন থেকেই জিজ্ঞেস ক'রেছি। জিজ্ঞেসের জপমালা ক'রেছি।"

"বটে? জপ সিদ্ধ হয়নি?"—চরিতার সুর বাইরে হাল্‌কা ছিল, কিন্তু ভাবটা তার নিশ্চয়ই হাল্‌কা ছিল না।

"কবে—কখন পাব উত্তর?"

"জানিনে। আজ আমার ঠাকুরের পায়ে সঙ্কল্প ক'রে ফুল দিয়ে দেখি—আপনার জপসিদ্ধির কি ফল ফলে।" সহাস গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বল্‌ল চরিতা।

"আমি তবে দেবতার দুয়োরে ধর্ণা দেবখ'ন, পূজারিণি!"

"দেখবেন, অনধিকার প্রবেশ কর্‌বেন না যেন মন্দিরে। তা হ'লে ঠাকুর রাগ ক'রে পায়ের ফুল ফেলে দেবেন।"

সত্যিই, চরিতা গিয়ে পূজোর কাপড়খানা প'রে শাঁকটা বাজাল। তারপর, ঘরটিতে তার গিয়ে পূজোয় বস্‌ল। দীপটি ধূপটি জেলে। দুয়োর ঈষৎ ভেজান'।

এবেলাও চুরি? সুব্রত খানিক পরে পা টিপে-টিপে ঘরটার দুয়োরে হাজির। ভেজান' দরজা আস্তে একটুখানি ফাঁক ক'রে চুরি ক'রে চেয়ে দেখছে সে। ভারি অন্যায়, নয়? বেয়াদব, নিশ্চয়ই। কিন্তু দেবতার পায়ে আজ যে তার জীবনমরণ-পণ নির্ম্মাল্যটি রাখা হ'য়েছে! ধর্ণা না দিয়ে সে পার্‌ছে না!

একটা ছোট যুঁইয়ের কুঁড়ির মালা গেঁথেছে সে আজ। তাই তার দেবতার গলায় সে পরিয়ে দিয়েছে। দেবতার পটটা আজ আর বেদীতে নেই যে! হাতে তুলে নিয়েছে—ঐ যে বুকে চেপে ধ'রেছে—মুখের কাছে এনে—চুম্বন?—হাঁ চুম্বনই কর্‌ছে যে সে! পূজারিণি! এই সৃষ্টিছাড়া শাস্তরছাড়া তোমার পূজো? সেদিন আর দেবতার পট ফুলে ঢাকা ছিল না। পিদীমের স্নিগ্ধ আলো এসে প'ড়েছিল তার ওপর!

একি!—সুব্রতর চোখের সাম্‌নে বিশ্বটা আজ কিসের ছন্দে নেচে উঠল যে! সেত স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পার্‌ল না মন্দিরদুয়ারে!

ওগো, অধীর ট্রেস্‌পাসার!

তারই ছবি—সেই বইএর ফটোখানা! সুচরিতার আরাধ্য প্রাণের দেবতা!

ভগবান্‌!

ধরা না দিয়ে ধর্‌ণা দেওয়া তার হ'ল না।

ঘরের ভেতরে তারা দুজনে দুজনের কাছে ধরা দিয়েছে। শুধু হাতে হাতে নয়, এবার দুর্গ দখল! সুষমা বৌদি কোথা? শাঁকটি তোমার বাজালে না?

"এতখানি ভালবাস তুমি?"—সুব্রত বল্‌ল।

"আর তুমি বুঝি একটু কম ক'রে বাস?"

তাদের মিলিত অধরপুট জানিয়ে দিল কেউ কাকেও কম ভালবাসে না। নিশ্চয়ই না। কিছুতেই না। আচ্ছা, আচ্ছা, তাই সই! হার জিত নেই, সমানে সমান! ভাল, তোমরাত' হারজিতের হিসেব নিচ্ছ!

দুজনে বেরিয়ে গিয়ে মৃত্যুঞ্জয়বাবুকে আর গৃহিণীকে যোড়ে প্রণাম কর্‌ল।

তাঁরা প্রাণ ঢেলে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন—

* * * * *

সুপ্রিয় খানিক পরে ফিরে এসে সব বুঝল। বোনের হাত দুটো এবারও সে কিছু না ব'লে টিপে দিয়েছিল। এবার—কি ভাবে?

আর সুব্রতদাকে সে রাত্তিরে সে ওপাশ ফিরে শুতে দেয় নি। সারা রাত্তির তার বুকের দপ্‌দপানিটে সে শুনেছিল! আর, ছোক্‌রাও ভারি আরাম পেয়েছিল তাতে!

আজ গরীব তারা, আহত, পলাতক তারা—কিন্তু স্বর্গ ব'লে যদি কিছু থাকেত' সেদিন তাদের সেই নিরালা, নিভৃত কুঁড়েটার ভেতরেই ছিল!

আর—সেদিন কি স্বপন দেখেছিল তারা—চরিতা আর সুব্রত—দুজনে?—সেই হনুমানধারার মাথায় অচ্ছোদ সরোবর—হরিণ হরিণী যার কাঁচপানা জলে এসে মুখ দেখে তাদের নিঝুম দুপুরবেলায়—

যেখানে কে একদিন মঞ্জু-মৃদু গুঞ্জরণে ব'লেছিল—"এখানে একখানা কুঁড়ে বেঁধে থেকে গেলে বেশ হয়, না?"

কুঁড়েই তারা বেঁধেছেত'—আর এক অচ্ছোদের তটে!

* * *

পরদিন সকালে বিনয় এসে উপস্থিত। তার সঙ্গে আর এক ভদ্রলোক—চোগা চাপকান-পরা। মৃত্যুঞ্জয়বাবু সেই ভদ্রলোকটিকে অভিবাদন করলেন, বসতে বল্লেন। সুব্রতও বিনয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসেছিল।

হাঁ—বটেইত', সেই দিনই যে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর সেই একমাস গ্রেসের অন্তিম দিন। দ্রলোকটি বুঝি তাঁর এটর্ণি। পাওনাদারেরা বুঝি তাঁর বুকের মাংস তোল ক'রে কেটে নেবার জন্যে শাণদেয়া চাকু হাতে দিয়ে এটর্ণিকে পাঠিয়েছে! তিনি ত' তাঁর শুকনো পাঁজরের হাড় ক'খানা খুলেই রেখেছেন!

"কাগজপত্তর তৈরি ক'রে এনেছেন সব?"—তিনি এটর্ণির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

"আজ্ঞে হাঁ।"—এই ব'লে একতাড়া কাগজ তিনি বের ক'রে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর হাতে দিলেন।

মৃত্যুঞ্জয়বাবু একখানি দলিল খুলে দেখলেন। একি?—তিনি যে খৎ দিয়ে টাকা নিয়ে ছিলেন, তারই একখানা যে! পিঠে সেটার লেখা—"পেড্ আপ ইন্ ফুল্!" ব্যাপারখানা কি?

সবগুলো দলিলই ঐ রকমের। অর্থাৎ, তাঁর লাখখানেক টাকার ওপর দেনা অনেক পরিশোধ হ'য়ে গেছে, আর বাকিটার একটা "সেট্লমেণ্ট" বা বন্দোবস্ত হ'য়েছে! তিনি সম্পূর্ণরূপে দায়মুক্ত!

ভগবান্! এম্নি ক'রেই রাখলে তুমি! কুলালে তুমি!

মৃত্যুঞ্জয়বাবু অনেকক্ষণ কোন কথা বল্‌তে পার্‌লেন না—চোখ দুটো তাঁর জলে ভ'রে গিয়েছিল! অকূলের কাণ্ডারী সত্যই বড় অকূলে কূল দিয়েছেন!

সেই কুঁড়েয় নির্জ্জনবাসে তাঁর কষ্ট ছিল না, কিন্তু অপরিশোধিত ঋণের বোঝা! ওঃ! দুঃসহ!

এটর্ণি তখন ব্যাপারটা ভেঙ্গে বুঝিয়ে দিলেন। বিনয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন—"কাটুনির এই বিনয়বাবুই সকল ভার নিয়েছেন, সব বন্দোবস্ত ক'রেছেন, মৃত্যুঞ্জয়বাবু। কোন ষ্টেট্ এন্‌কামবার্ড হ'য়ে পড়্‌লে কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ যেমন সেটাকে হাতে তুলে নেয়, বিনয়বাবুও তেম্‌নিধারা আপনার সমস্ত বিজনেস্‌টার ভার নিজের উপর নিচ্ছেন। দেনা পাওনা সব তাঁর নিজের ঘাড়ে। অবশ্য কতক কতক পাওনাদারের প্রাপ্য এখুনি চুকিয়ে দিতে হ'য়েছে—যেমন, আপনার বাল্যবন্ধু মিঃ চ্যাটার্জ্জির। বাকিটার জামিন ইনি হয়েছেন। আপনার বিজনেস্‌টা ইনি ম্যানেজ ক'রে, তাই থেকে দেনাটা শুধে দিবেন। আপাততঃ মাসিক দেড় হাজার ক'রে পাওনাদারদের দেবার একটা সেট্‌লমেণ্ট হ'য়েছে। আপনার বালী-গঞ্জের বাড়ী, এখানকার বাংলো সবই খালাস হ'য়েছে। আবার আপনারই হ'য়েছে। অতঃপর উনিই আপনার এ কারবারের ম্যানেজিং এজেণ্ট হ'লেন।"

মৃত্যুঞ্জয়বাবু অবাক্ হ'য়ে শুন্‌ছিলেন। এবার কিন্তু বল্‌লেন—

"বিনয়বাবু দেখছি এর মধ্যেই চাল্লিশ হাজার টাকা শুধে ফেলেছেন। সে টাকাটা নিশ্চয়ই তাঁকেই ফাইণ্ড কর্‌তে হ'য়েছে। সেটা শোধবার কোনও ব্যবস্থাত' করেন নি দেখছি। তা ছাড়া, আমার ডুবো বিজনেস্ উদ্ধার ক'রে সেটাকে লাভবান্ ক'রে উটোনো—এ ত' মস্ত বড় একটা রিস্ক। এক রকম অসম্ভব ব্যাপার ব'লেই ত' আমার

মনে হয়। ম্যানেজিং এজেন্টস্‌রা এতটা রিস্ক নিতে চায় না। তা ছাড়া, তারা একটা পারিশ্রমিক আশা করে।"

"সেজন্যে আপনি আপত্তি কর্‌বেন না মৃত্যুঞ্জয়বাবু। আমিও ত' ঐ বিজনেসই ক'রে আস্‌ছি, আর এই সব অঞ্চলেই। জিনিষটে কিছু বুঝিছি টুঝিছি বোধ হয়। বাজারেও আমার কিছু ক্রেডিট আছে। আপনার ঐ ডুবো জাহাজ উদ্ধার ক'রে, তাই থেকে সব দিক্ কুলিয়ে নিয়ে উঠতে পারব আমার বিশ্বাস আছে। আমার এই চাল্লিশ হাজারও উঠে আস্‌বে নিশ্চয়। আমি তেমন কোন রিস্ক নিচ্ছি না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে কোন অব্‌লিগেসনের মধ্যে পড়তে হবে না। প্রসন্নমুখে আপনি অনুমতি দিন।"—বিনয় এই ব'লে মৃত্যুঞ্জয়বাবুর পায়ের ধূলো নিল।

তাঁর চোখে জল। আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন। ভাঙ্গা ভাঙ্গা সুরে বল্‌লেন—"এই মহাদায়মুক্ত ক'রে বিনয় তুমি আমাকে যে ঋণী কর্‌লে, সে ঋণ কি দিয়ে আমি শুধব, তাত' ভেবে পাইনে।"

"আপনি তা শুধেছেন। উল্টে আমাকেই ঋণী ক'রেছেন—সুচরিতা-দেবীকে সুব্রতর হাতে দিয়ে।"

বাইরে এসে সুব্রত বিনয়কে বুকে চেপে ধর্‌ল।

"থ্যাঙ্কস্ ট্যাঙ্কস্ দিতে হয় ত' তোমার বৌদিকে দিও। সবই তার কীর্ত্তি। আমি হার্ ম্যাজেষ্টির দূত মাত্র। পাঁজি দেখতে বল্‌ব কবে বলত ?"—বিনয় বলিল।

ষোড়শ

এইবার আমার কথাটি ফুরুলো। ন'টে গাছটাও প্রায় মুড়োলো আর কি!

মৃত্যুঞ্জয়বাবু সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জব্বলপুরের বাংলোতে ফিরে গেলেন না। লেকের ধারে রিট্রিট্‌টে তাঁর ভাল লেগেছিল। আর সুচরিতা সুপ্রিয়ব্রত' কথাই নেই। সুচরিতা যে এইখানে তপস্যা ক'রে "বর" পেয়েছে! তা ছাড়া, গরীব গেরস্থর জীবনটা তার ভারি পছন্দ হ'য়েছিল। নিজের হাতে সব কিছু করা, শাগভাত খেয়ে, মাদুর পেতে মেঝেয় শুয়ে থাকা। সুব্রতর প্রাণের তীর্থ সেটা, আর তার সেটা, কি বল্‌ব?—প্রাণের প্রাণের তীর্থ! কিছুতেই হা'র মান্‌বে না বুঝি!

সুষমা পাঁজি দেখে দিন খ্যান ঠিক ক'রে দিলেন। কল্যাণপুরে রাণীমার এবং দেওয়ানজী জেঠামশায়ের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ এসে পৌঁছুল। রাণীমার যে আহ্লাদ! তাঁর দীনদুঃখী ছেলেমেয়েদের নতুন রাণীমাকে কবে যে তিনি কোলে কর্‌বেন, ঘরে তুলে নেবেন! সুব্রত দুচার দিন জব্বলপুরে সেই রিট্রিট্‌টেতে র'য়ে গেল। বিনয়ের চিঠি এল—হার্‌ ম্যাজেষ্টিস্‌ হুকুম কাটনির বাসাতেই বে হবে। মৃত্যুঞ্জয়বাবুরা আহ্লাদের সহিত মত কর্‌লেন।

এর মধ্যে সুব্রত, সুচরিতা সুপ্রিয় তিনজনে একদিন মার্ব্বেল রক্‌স দেখতে গেল। সুপ্রিয়র সঙ্গে ক্যামেরাটা ছিল। সেই নর্ম্মদার বুকে নৌকো। এবার সুচরিতা গিয়ে মার্ব্বেল স্লাব্‌টার ওপর বস্‌ল—অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে নয়। সুব্রত পাশে দাঁড়াল, তার কাঁধটায় হাত রেখে। পস্‌চারটা বড্ড "হ্যাক্‌নিড" হ'য়ে প'ড়েছে বোধ হয়,

কিন্তু তোমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পার, সুব্রত আর সুচরিতার কাছে তা হয় নি। সব্বাইকার খদ্দরের পোষাক। এবার পাহাড়ী ভীমরুল তাড়া ক'রে বাদ সাধে নি। "যুগলরূপের" ফটো নির্ব্বিঘ্নেই উঠেছিল।

সুচরিতা কাণে কাণে বল্ল—"আমার জিত। মানছ ত'? তোমার ফটো আগেই দখল ক'রেছি।"—এই ব'লে তার সেমিজের ভেতর থেকে সুব্রতর সেই বইএর ফটোখানা একটু বের ক'রে দেখাল। বুকে ক'রেই নিয়ে বেড়াত বুঝি!

"ঈস্—জিত না ত' কি!"—এই ব'লে সুব্রত তার পাঞ্জাবীর ভেতর পকেট্ থেকে একটুকরো কাগজ বের কর্‌ল। "তোমার সুচরিতা"—এই কথা দুটো লেখা আছে কাগজটার তলার দিকে। কোথেকে পেল? সেই যে কাটুনিতে সুষমাবৌদি, তাকে যে চিঠিখানা পড়তে দিয়েছিল—সুচরিতার লেখা চিঠি! সেটা সুব্রত আর ফেরৎ দেয় নি। সেও বুকে ক'রে নিয়ে বেড়াত বুঝি!

আর—আর—"সুচরিতা" এই নামটার গায়ে অনেক সিঁদ কাটার দাগ প'ড়েছে যে!

সুব্রতর ফটোটায় পড়ে নি? শেয়ানে শেয়ানে কোলাকুলি?

হা'র জিত মোদ্দা সাব্যস্ত হ'ল না।

* * * * *

কাটুনিতেই তাদের বে হ'ল। বিনয়কে বেশী ধূমধাম কর্‌তে দিল না কিছুতেই সুব্রত। সুষমা সুচরিতা আর সুব্রতকে নিয়ে যা সব কর্‌ত—তাতে দুষ্টুর শিরোমণি টাইটেল্‌টা তার সর্ব্ববাদিসম্মত হ'য়েছিল।

বিয়ের পর সুষমার পায়ের ধূলো নিল সুচরিতা। বল্ল—

"দিদি, তোমা থেকেই ত' সব। কি শুভক্ষণে সেই লেকের ধারে ঘরটিতে তুমি পায়ের ধূলো দিয়েছিলে!"

"তুই থাম্‌ত', চরি। পায়ের ধূলোর জন্যে তোর আর ভাবনা নেই—পায়ের ধূলোর ইম্পিরিয়াল্ ব্যাঙ্ক্ তোর জন্যে খুলে দিয়েছি। আন্‌লিমিটেড্ ফিক্‌স্‌ড ডিপোজিট্, তবু বেশী ভাব্‌সি নে।"

"সত্যিই দিদি, তোমা হ'তেই সব!"

"কিচ্ছু না। তোর নিজের তপিস্তিতেই বর পেয়েছিস্। শিবের মতন বর।"

"উনি যদি শিবই হন, তোমার বরটি তা হ'লে কি দিদি? সদাশিব, না নটরাজ শিব?"

"না,—বক্কেশ্বর শিব"!

সুষমা হেঁসে সুচরিতার মুখচুম্বন করিল।

সুচরিতার মনের কোণে একটা মেঘ ছিল কিন্তু। তার সেই বাল্যসখী, বন্ধু সুজাতা! তার যে কোনই পাত্তা পাওয়া গেল না। একেবারেই অজ্ঞাতবাস! তারাও ত' অজ্ঞাতবাস ক'রে ছিল দুচারদিন! সুজাতা অজ্ঞাতবাস থেকে বেরুবে না? সুচরিতা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ত। হায়—ঐ মেঘরত্তি যদি না থাকত!

আর সুব্রতর? তারও বোধ হয় সাধ আহ্লাদ ষোল কলায় পূর্ণ হয় নি। সেই দেশের হাঁসপাতালে শুশ্রূষাকারিণী তরুণী! তার বুকভরা দরদ, তার প্রাণঢালা সেবা সে কখনো ভুল্‌বে কি? কতরাত্রে স্বপ্নে তাকে দেখেছে সে! তার জন্যে ব্যাকুল হ'য়েছে—সেই স্নেহময়ী, রহস্যময়ী বোনটির জন্যে! চলার পথে তাকে পাশে পেলে কত বড় সৌভাগ্য তার মনে হ'ত! এ সুখের দিনে সেও একটা দীর্ঘশ্বাস ফেল্‌ল। একটিবার তার চলার পথে দেখা দিয়ে আবার কোথা সে

নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল ? বিয়ে করুল ব'লে, চলার পথ থেকে স'রে পড়্‌ল না নিশ্চয়ই সুব্রত। দ্বিগুণ আশা নিয়ে, বল নিয়ে, আনন্দ নিয়ে সে চল্‌বে সে পথে। কিন্তু বোন্‌টির তার দেখা না পেলে, তার অস্বস্তি যে ম'লেও যাবে না !

* * * *

বর ক'নে কল্যাণপুরের বাড়ী এল। সঙ্গে সুষমা বৌদি। রাণীমা প্রথম কটাক্ষেই বুঝ্‌লেন—মনের মতন বউ হ'য়েছে তাঁর। এমন চাঁদপানা ছিরি বৌমার ! আর, সে লাবণ্য, সে রূপ ধূলোমাটির কোন ময়লা ঠন্‌কো ছাঁচে ঢালাই হয় নি নিশ্চয়। দেশের নতুন রাণীমা সত্যিই বটে !

বৌভাত উপলক্ষে এমন এক বিরাট্ দরিদ্রনারায়ণের সেবার আয়োজন তিনি করুলেন—যেমনটা কেউ কখন শোনে নি। সুচরিতা, সুষমা নিজেদের গা গতর দিয়ে সে সেবায় যোগ দিয়েছিল। সুব্রতর মা এইবার বৌমাকে তাঁর সেই গচ্ছিত-রাখা যৌতুকটা দিলেন—তাঁর নিজের মহালটা। তা থেকেও কম ক'রে বছরে হাজার ত্রিশেক আয় আছে।

সেদিনকার "যজ্ঞি" শেষ একদিনে হয় নি ! ক'দিন ধ'রে চ'লেছিল। শেষের দিন সুব্রত সুচরিতাকে বলিল—"এইবার যে দক্ষিণান্ত করুতে হয়, চরিতা।"

"মায়ের দেওয়া ঐ যৌতুকটে আমি আজ এ যজ্ঞে দক্ষিণা দেব ভেবেছি।"

"তা না ভেবেছ ত' তুমি কি আমার শুধু নামেই সুচরিতা ?"

"আর নিজে বুঝি শুধুই নামে সু—?"

অত্র প্রকাশ থাকে যে, সুচরিতার মাতামহ সম্পত্তির উত্তরাধি-

কারিণী হবার সম্ভাবনা ইতঃপূর্ব্বেই নানাকারণে সবিশেষ কাহিল হইয়া পড়িয়াছিল। সুচরিতাকে পুত্রবধূরূপে না পাইয়া মিঃ জ্ঞানরঞ্জন চ্যাটার্জ্জিকে বিশেষ অনুতপ্ত হইতে হয় নি।

সুব্রত, সুচরিতা, সুপ্রিয়—সু এর ত্র্যহস্পর্শ! ত্র্যহস্পর্শের ফাঁড়া কাটাবার জন্যে আর একটা "সু"—সুষমা। আরও একটা হ'লে, পঞ্চীকরণ হ'য়ে সব সম্পূর্ণ হ'ত না কি ?—সুজাতা ?

যাক্—দিন কতক বাড়ী থেকে দেশের সেবাব্রত কাজটা তারা বেশ ক'রে গুছিয়ে দিল। আগেই ব'লেছি—পল্লীগুলো সব দিক্ দিয়ে আত্মনির্ভর হয়, স্বাধীন হয়, স্বতন্ত্র হয়—এইটেই ছিল সুব্রতর আদর্শ, সুব্রতর ধ্যান, সুব্রতর ব্রত !

এই পল্লীসংগঠন কাজে পশ্চিমের সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার স্বপ্নের যেটা প্রাণ, সেটা সে গ্রহণ ক'রেছিল। তার কায়াটা। তার মিথ্যে ছায়াটা—তার বিকট অপচ্ছায়াটা নয়।

এ দেশের সাধু মহাজনেরা আদর্শটাকে যে ভাবে ধ্যানে ফুটিয়ে তুলে, প্রতিষ্ঠান অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে সেটাকে রূপ দিতে চেয়ে ছিলেন, সুব্রতর সেই ভাবটাকেই ভাল লেগেছিল। "রাজনৈতিক চৈতন্য সম্পাদনের" দরকার সে স্বীকার করত। কিন্তু গোটা পল্লীচেতনার একটা অঙ্গ—মাত্র একটা অঙ্গ—ভাবেই সেটাকে সে নিতে প্রস্তুত ছিল। পল্লীর রাজনৈতিক পেটটা ফুলে ঢাক হবে, আর হাত পা সব সরু কাটির মতন হবে—এটার নিদান সে ক'রেছিল "কালাজ্বর" ব'লে নয়, "কালজ্বর" ব'লে। বাইরের ইন্‌জেক্‌সনে এ ব্যায়রাম সারবে না। পল্লীর প্রাণ হবে প্রাচীনরা যেটাকে বলতেন "ধর্ম্মনিষ্ঠা", তাই। সেই ধর্ম্মনিষ্ঠা থেকেই যত সব শুভ আবেগের ও প্রচেষ্টার "সাঙ্কসন্‌দ্"গুলো নিঃসৃত হবে। বাইর থেকে চাপ দিয়ে,

লেজিস্লেশন্ ক'রে, মূলের চিকিৎসা হবে না। আর, বলা বাহুল্য, ধর্ম্ম মানে "রিলিজন্" ছিল না তার কাছে। যাতে মানুষ মানুষের ওপর অত্যাচার করে, হিংসা বিদ্বেষ বাড়ে; যাতে মানুষ শৃঙ্খলিত হয়, সম্মোহিত হয়, প্রতারিত হয়—সেটা ধর্ম্ম নয়। যাতে মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন অভ্যুদয় হয়, সত্যিকার মুক্তি ও স্বারাজ্য হয়—তাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের জন্যই যত কিছু কর্ম্ম।

কাজ বেশ উৎসাহ আর শৃঙ্খলার সঙ্গেই চল্‌ছিল। সুব্রতরা সেখানে অট্টালিকায় বাস কর্‌ত না। খ'ড়ো ঘরে। পাড়া গাঁয়ের সেই খ'ড়ো বাড়ী সুচরিতার বেশ লেগেছিল। এখানেও গেরস্তালির কাজ কর্ম্ম সে অনেক নিজের হাতেই করে। নতুন রাণী মা ও, গরীব দুঃখীদেরই মা যে! মাটিতে আঁচল পেতেই বস্‌তে হবে, বসাতে হবে! আর, সুব্রতর রান্নাটা সে নিজে রাঁধ্‌বেই।

সুচরিতার যৌতুকটা—সেই মাহালটা—মা আপাততঃ "দক্ষিণান্ত" কর্‌তে দেন নি। বৌমা তাই দিয়ে তাঁর নাতিটির মুখ দেখ্‌বেন। দাবী কিছুতেই ছাড়্‌বেন না। বুড়ো দাওয়ানজী এবারেও হাস্‌লেন।

* * * *

বছর দুই কেটে গেছে। নাতি একটি আসিয়াছেন, ঠাম্মার কোল আর বুকটা একবারে দখল ক'রেছেন। নাম থোয়া হ'য়েছে—তপোনাথ। আর, আদরের তপু—তপন—তপ'নে—তপাই—ইত্যাদি শব্দরূপ ঠাম্মা মুখস্থ কর্‌তেন দেখা যেত। সুষমা বৌদির চিঠিপত্তর প্রায়ই পাওয়া যেত। বিনয়ের কর্ম্মকুশলতায় সত্যি সত্যি মৃত্যুঞ্জয়বাবুর বিজনেস্ আবার খাড়া হ'য়ে উঠেছে। বেশ লাভবান্ ব্যবসা হ'য়েছে। নির্দ্দায়িক হ'য়েছেন তিনি।

সুজাতার খোঁজ পাওয়া যায় নি। সমরেন্দ্র সে জেলা থেকে অনেক দিন আগেই বদ্‌লি হ'য়ে গেছে। কোথা আছে জানা নেই।

গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে জাতীয় দলের একটা আপোষ হ'য়েছে। আবার জাতীয় দল ব্যবস্থাপক সভায় যাচ্ছেন। তাঁদের হাতে সত্যিকার ক্ষমতাও এসেছে।

সুব্রতর দেশের লোক ধর্‌লে তাকে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার মেম্বর হ'তে হবে। এখন, কাজের সুযোগ এসেছে। সুব্রত বিশেষ আপত্তি কর্‌ল না। সে ইলেক্‌টেড্‌ হ'য়ে গেল। প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ দাঁড়ায় নি।

শিমলাতে তখন সেসন্‌ চল্‌ছে। জাতীয় গবর্ণমেণ্ট তখনও শিমলার মাঁয়া একেবারে কাটান নি। তখন, পিড়িয়ড্‌ অব ট্রান্‌জিসন্‌ কি না!

জব্বলপুর কাটনিতে দুচারদিন কাটিয়ে সুব্রত সুচরিতা সুপ্রিয়কে নিয়ে শিমলা পাহাড়ে এসেছে! পাছে তিন "সু" এ তেরস্পর্শ হয়, কাজেই, "অগত্যা," খোকা মহারাজ—তপোনাথ—সঙ্গে এসেছেন।

শিমলায় ব্যবস্থাপক সভায় সুব্রতর "কুমারী বক্তৃটাটা" সকলের বিস্ময় উৎপাদন ক'রে ছিল। সকলেই বুঝলে—শীগ্‌গিরই সে লিড্‌ কর্‌বে। সে নতুন ক'রে কাগজও বের ক'রেছিল একখানা। নতুন বইও দু'একখানা বেরিয়েছে।

তার আন্তরিকতা, তার ত্যাগ, তার সৎসাহস, তার জ্ঞান সকলেরই শ্রদ্ধা আকর্ষণ ক'রেছিল! পল্লীসংগঠন—ভিলেজ অটোনোমস্‌ কমিউন্‌ প্রতিষ্ঠা বা পুনঃপ্রতিষ্ঠা—এইটেই ছিল তার মূল প্রোগ্রাম। দেশের ধর্ম্ম ও কাল্‌চারের ধারাগুলোকেও সে স্বাতন্ত্র্য দিতেই মত ক'রেছিল। ধর্ম্মসংস্কার, সমাজসংস্কার—এগুলো সে ব্যবস্থাপক সভার জুজারের ল্যাজে একটা ল্যাও বোটের মতন বেঁধে দিতে মত করে নি। যা

কর্‌তে হয় জনশিক্ষা আর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে গণমতের প্রভাবে কর।—এইটে ছিল তার মত। সকলে মান্‌বেন না বোধ হয়।

* * * *

তখন বোধ হয় পূজোর আগে—সেপ্টেম্বর মাস হবে। শিমলার পাহাড়গুলেতে কোয়াসার "ভর" আর তাদৃশ হয় না। অনেকক্ষণ ধ'রে বেশ ফুট্‌ফুটে রোদ্দুর থাকে। একদিন তারা তিন জনে "জাকো" হিল্‌টা দেখে নেবে এসেছিল।

শরীরটে আলস্য। মলে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছিল। খদ্দরের পোষাক তাদের, তবে, তখন খদ্দরের ছড়াছড়ি।

"ঐ যে সাহেবী পোষাক লোকটি কে? মেম সঙ্গে বেড়াচ্ছেন? সমরদা না?"—সুপ্রিয়ই প্রথম দেখল।

তাঁরা সেদিকে এগিয়ে গেলেন। সমরেন্দ্রও দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল।

"হ্যালো ডক্‌টর্‌ ব্যানার্জ্জি, ভাল আছেন? আপনি আমাকে এই দেখছেন, আমি কিন্তু আপনাকে রোজই দেখছি। লেজিস্‌লেটিভ এসেম্ব্লিতে। আপনার বক্তৃতাগুলো খুবই এপ্রিসিয়েট করি আমরা।"

"মিসেস্‌ চ্যাটার্জ্জি—মিসেস্‌ ব্যানার্জ্জি"—এই ব'লে সমর তার মেমকে পরিচিত ক'রে দিল সুচরিতার সঙ্গে। সে মেম বে ক'রেছিল। সুচরিতার বের খবরও সে রেখেছিল দেখা যাচ্ছে।

আজ তার মুখে কোনই বিরক্তি বা আক্রোশের রেখাটুকু নেই। আর সেই অফিসিয়ালি ভাবভঙ্গীগুলোও সব বেমালুম ঝ'রে প'ড়ে গেছে। বেশ অমায়িক, খোসমেজাজী ভদ্রলোক সে আজ।

"ডকটর ব্যানার্জ্জি, আপনি শোনেন নি নিশ্চয় আমি চাকরিতে লও

ফারলো নিয়ে বিলেত গিয়েছিলুম। ইনার টেম্‌পলের একখানা সনন্দ নিয়ে এসেছি।" অর্থাৎ, ব্যারিষ্টার হ'য়ে।

"শুনে সুখী হলুম। এখানে? বেড়াতে?"

"ঠিক তা নয়—আমি লেজিস্‌লেটিভ ডিপার্টমেণ্টে একটা চাকরি নিয়েছি।"

সে সাড়ে বারশ' টাকা মাহিনায় ঐ ডিপার্টমেণ্টে কাজ কর্‌ত তখন।

বেশ সপ্রতিভ, আন্তরিক ভাবেই সুচরিতাকে বল্‌ল—"আমার ওখানে চা খেতে তোমরা একদিন যাবে না, চরিতা?"

"যাবো বৈ কি, সমরদা। কা'লকেই।"

"তাই ঠিক থাক্‌ল। চারটেয়। আচ্ছা, আফিসের দিকে যেতে হবে একটু এখন, চিফের সঙ্গে দেখা করতে। নমস্কার ডাঃ ব্যানার্জ্জি। সুপ্রিয় তুমিও আস্‌ছত'? এসো।"

লোকটার অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে।

* * * * *

তারপরদিন বিকেলে সমরের ড্রয়িংরুমে তারা। সমর আর তার মেম খুবই আদর ক'রে বসালেন তাদের। মেমটি বাংলা শেখেন নি। তবে শিখ্‌তে আগ্রহ আছে। আর, কথায় তাঁর বোঝা গেল—ভারতের এই নব উত্থান তাঁকে সত্যিই আনন্দ দিয়েছে। তিনি চান—ভারতকে নিজের স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত, আর সেই প্রতিষ্ঠার ভেতর থেকেই উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ, হ'তে দেখ্‌তে। মহাত্মাজীর লেখা পড়েন। বিবেকানন্দর বই টইও প'ড়েছেন। সমরকে এবার ঠিক "কাঁচপোকায়" ধ'রেছে। সমর সত্যিই ভেতরে ভেতরে অনেক বদ্‌লে গেছে। তবে, তার লেডির এ "স্বাদেশিকতাটা" কি স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংসিদ্ধ, স্বপ্রকাশ? তারই বা গুরু ছিল কে?

কথাবার্ত্তা চল্‌ছিল। পাশের ঘরের অটোম্যাটিক্ দুয়োরটা খোলার শব্দ হ'ল।

চায়ের ট্রে হাতে ক'রে ঘরে এল সে। খদ্দরের নীল সাড়ী পরণে।

কে ?

"জতি"—সুচরিতা উঠে গিয়ে সুজাতাকে বুকে চেপে ধরল।

আর—আর—এদিকে, কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্ ?—সুব্রত সেদিকে তাকিয়ে একেবারে ষ্ট্যাচু হ'য়ে গেছে !

"দেবি ! আপনি ?"—তার মুখ দিয়ে কোন গতিকে বেরুল।

সে এসে সুব্রতর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। কিন্তু তার মুখখানা—? চোখ তুলে চাইতে পারে নি।

কে বলত' ?

সেই সুব্রতদের দেশে জাতীয় হস্‌পিটালের শুশ্রূষাকারিণী তরুণী—স্নেহময়ী, রহস্যময়ী বোন্‌টি। কতদিন স্বপ্নে যাকে দেখেছে—কল্‌কাতার জেলে সেই ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জার জ্বরের ঘোরেও। এতদিন যার সঙ্গ কামনা ক'রে এসেছে ! চলার পথে যাকে সাথী পেতে চেয়েছে !

সুজাতাই সেই শুশ্রূষাকারিণী !

তার পরদিন রিটার্ণ ভিজিট দিতে এসেছিল সুজাতা সুব্রতদের শিমলের বাসায়। তখন দুপুরে সময় গিয়েছিল তার আফিসে। আর সুব্রতর ব্যবস্থাপক সভার একটা কমিটি মিটিং ছিল। সুপ্রিয়ও সেদিন তখন বাসায় ছিল না।

কাজেই তারা ছুটিতে একলা। তবে, অবশ্য, তপুবাবু, তপুসোণা স্বমহিমায় বিরাজ করছিলেন। সুজাতা এসেই তপুসোণাকে কোলে নিয়ে শত শত চুম্বনে অস্থির ক'রে তুলল। সে বেচারী মরিয়া হ'য়ে

সুজাতার নাসাটিকে রাহুগ্রাস কর্‌তে উদ্যত হ'ল। নাসাটি অক্ষতদেহে নিষ্ক্রান্ত হ'তে পেরেছিল বোধ হয়, কিন্তু বালামৃত সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া—বালমুখচন্দ্রিমার অমৃত—ডোম্বরের বালামৃত নয়।

"বড্ড ভাব জমিয়েছিস্ যে, এরি মধ্যে, জতি?"—সুচরিতা বল্‌ল।

"যার সঙ্গে যার মজে, তার সঙ্গে তার জমতে দেরি হয় না।"

"তাই বুঝি ওঁকে সেই জেলে বোধনের দিন একবার দেখেই ম'জে ছিলি!"—সুচরিতা হাঁস্‌তে হাঁস্‌তে বল্‌ল। সে এতদিনে বোধ হয় সুজাতার "অজ্ঞাতবাসটা" কতক বুঝি বুঝি কর্‌ছিল।

জতি মুখখানা নাবিয়ে একটু জোরে নিঃশ্বাস ফেল্‌ল। আজ কি সাধ ক'রে ধরা দিতে এসেছে না কি সে?

মুখে বল্‌ল—"দেখব আর মজব, এমন মজার মজা তুই যেমন দেখিয়েছিস্, তাতে তুই আর কথা ক'স্ নে।"

"জান্‌তে ত' পারিস্ নি!"

"আহা মরি! বালীগঞ্জে লেকের ওপর সেই কোস্‌চেন্‌টা তোর মনে আছেত' চরি?"

চরিতার খুবই মনে ছিল। তবু যেন নেকা সেজে বল্‌ল—

"কোনটা?"

"সুব্রতবাবুকে তোর খুব ভাল লেগেছে, না?"

"আমিত' হাঁ না কিছু বলিনি।"

"বলিস্ নি, কিন্তু আমার তোর উত্তরটা বিলক্ষণই জানা ছিল যে। জেলে বোধনের দিন সুব্রতবাবু আমার চোখে প'ড়েছিলেন হয়ত'। কিন্তু তোর যে কেমন চোখে প'ড়েছিলেন তিনি,—শুধু চোখে কেন মুখেও—তা আমার চোখে এড়ায় নি!"

"বেশ। কিন্তু আমার চোখেও তোর একটা জোচ্চুরি ধরা পড়েছে জতি। বলব ?"

"কি শুনি ?"

"এই কালকে সমরদার ওখানে তোকে দেখে ওঁর, আর ওঁকে দেখে তোর মুখচোখের ভাবটা। পুরাণো পীরিত নিশ্চয়ই, জতি। সেই জেলে বোধনের দিন একবার দেখায় এতটা হয় না। আর, জেলে তিনি বোধ হয় তোকে লক্ষ্যই করেন নি সে দিন !"

"লক্ষ্য করবেন কোথেকে, তাঁর সর্ব্বেন্দ্রিয় আর একটা ঠাঁই যে জুটিয়ে প'ড়েছিল !"

"তবে, তিনি তোর সঙ্গে পূর্ব্বপরিচিতার মতন ব্যবহার করলেন কি ক'রে ?"

"ভেতরে ভেতরে সন্দেহ হচ্ছে না কি ?"

"সত্যি বল্‌না, জতি, কবে তোদের দেখা হ'য়েছিল !"

"অজ্ঞাতবাসে।"

অজ্ঞাতবাসের ডাইরিখানা অতঃপর পড়া হইল। সে ম্যুভ্‌মেণ্টের গোড়ায় গিয়েছিল—সুব্রতবাবুদের দেশে ফ্লাডে আর আর মেয়েদের সঙ্গে ওয়ার্ক করতে। সুচরিতাকে তা সে জানায় নি। নমিতাও সঙ্গে ছিল—সেই চোখে প্যাঁশনে চশমাপরা মেয়েটি। সেখানে সুব্রতবাবুর এক সভায় তারা দুজনে গান গায়। সন্ধ্যার পর সুব্রতবাবু তাদের দুজনকে বিলের ওপর বাঁচ খেলিয়ে নিয়ে আসেন। নৌকোয় একটা রবিবাবুর গানও সে গেয়েছিল। তারপর, সে জেলাটাউনে ফিরে আসে। সেখানে দাদা তখন ডেপুটি। তাঁর বাসায় সে থেকে যায় দুদিন। তারপর, কল্‌কাতা এসে সে ম্যুভমেণ্টে ভাল ক'রে নেমে পড়ে। সুব্রতবাবুদের জেলাটাউনেই সে কাজ করতে বেরিয়ে যায়।

এবারও সুচরিতাকে কিছু সে জানায় নি। সেখানে সে ইচ্ছে ক'রে আতীয় হস্‌পিটালে নার্স হ'য়েছিল। সেখানেই সুব্রতবাবুকে দিন কয়েক নার্স করতে হ'য়েছিল। তারপর, তিনি জেলে চ'লে গেলে সেও কল্‌কাতা চ'লে আসে। পিকেটিং ক'রে সেও জেলে যায়—ক-সপ্তাহের জন্যে। মেয়ে ওয়ার্ডের ছাদ থেকে সে সুব্রতবাবুকে দেখতে পেত। জেলেও সে ইচ্ছে ক'রে পোলিটিকাল প্রিজনারদের অসুখ-বিসুখে নার্স করার ডিউটি নিয়েছিল। একদিন রাত্তিরে সুব্রতবাবুর খুব জর—সে হাঁসপাতালে গিয়ে সারা রাত্তির তাঁর মাথায় ওডিকলোনের পটি দিয়ে দিয়েছিল। সকালে আর সে ডিউটিতে আসে নি। সুব্রতবাবু ভালই ছিলেন।···সুব্রতবাবু আর তাকে দেখেন নি। কা'ল বিকেয়ল দাদার ওখানে আবার দেখলেন। মেমবৌদির অসুখে দাদা বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছেন শুনে সে এসেছিল শিমলায়। বৌদিকে সে বাংলা টাংলা শিখুচ্ছে। দাদারও মন অনেকটা ফিরেছে।···এই গেল মোটামুটি তার ডাইরি।

"ডুবে ডুবে ভারি খেলা খেলেছত' তুমি।"—চরিতা বলিল।

"আমি যে তোর বোন্ সুজাতা, তা উনি কোন দিনই জানেন নি। কা'ল তাই অবাক্ হ'য়ে গেলেন।"

"বুঝলুম। এ কুহেলিকাময় অজ্ঞাতবাস দুবচ্ছর ধ'রে চালালি কেন, বল দিকিন্। বে'র সময় কত খোঁজ ক'রেছিলুম তোর, সত্যি। এমন ক'রে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয়!" সুচরিতার স্বর এবার গাঢ়। সুজাতার উত্তর পেল না। মুখ তুলে চোখে দেখে—

সে মুখখানা নীচু ক'রে, কেঁচু মেচু ক'রে ব'সে আছে। চোখ দুটো জলে ভ'রে টল্ টল্ করছে।

তার তরুণ জীবনের গোপন ব্যথা—দিন দিন বেড়েই চলবে—

অসহনীয়ই হ'য়ে চল্‌বে। তার কোনও অষুধ নেই, প্রলেপ নেই! একদিন বড়বাঁধের বিলের ওপর নিঝুম সন্ধ্যায় যে দরদটা সে বুকে গোপনে ব'য়ে নিয়ে এসেছে—দিনের পর দিন—মাসের পর মাস—বছরের পর বছর গড়িয়ে যাবে—কিন্তু সে দরদ সারা বুকটা তার ছেয়ে ফেল্‌বে—ব্যথার ওপর নিজের হাতখানাও যে কোন দিন রেখে সে একটুখানি সোয়াস্তি পাবে, তার আশাও রইবে না!

তার মনের অজ্ঞাতবাসেরও শেষ আড়ালটুকু খ'সে প'ড়ে গেল!

চরিতা তাকে বুকে টেনে নিয়েছে। আর, সে, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নয়, ধীরভাবেই কাঁদছে!

তার যে এরই পালা!

অনেকক্ষণ পরে চরিতা বলল—

"তোকে এমন ক'রে ভাসিয়ে দিয়ে আমার ত' রাজরাণী হ'তে মন উঠত না, জতি। তুই একটিবার বলিস্‌ নি কেন? আমি তোকেই দিতুম!"

"নিজেকে লুটিয়ে দিতে, মুছে ফেলতে তুই পারিস ব'লেইত' চেপে গেছি, চরিতা। নৈলে, কি হাঙ্গামা তুই বাধাতিস! হয়ত' বেগতিক দেখলে পণ ক'রে বস্‌তিস বেই করব না।"

"বেশত!"

"না বোন, তা বেশ হত না। উনি সুখী হ'তেন না।"

"উনি যে আমাকে ভালবাসেন, তা তুই জানতিস্‌?"

"মন ডেকে ব'লেছিল আমার। তোর ঐ মুখখানা দেখেও ভাল-বাসেন নি, এমন হ'তেই পারে না, জানতুম।"

"আন্দাজ?"

"শুধু তাই নয়। জাতীয় হসপিটালে দু একদিন রাত্তিরে ঘুমের

ঘোরে তোর নাম করতে শুনেছিলুম, ওঁকে। বড্ড গরম। আমি হয়ত শেয়রে ব'সে বাতাস করছি।"

ও প্রসঙ্গ আর চলল না। সুজাতার বুকের বাণ্ডেজটা নিয়ে বড্ড টানাটানি করা হচ্ছে যে! তবু সে সব কথা ক'য়ে গেল। চরিতাকে ক'য়ে একটুখানি স্বস্তিও হ'ল বোধ হয় তার। খানিক তারা এবার তপুসোণাকে নিয়ে দুজনে খেলা করল। তার স্বচ্ছ উজ্জ্বল চোখ দুটোতে, আর দন্তহীন মিষ্টি হাসিতে কি যাদু আছে জানি নে, কতকটা সুস্থ হ'ল তারা দুজনেই।

"তারপর ?"

"তারপর কাশীতে অজ্ঞাতবাস করছি। তুই তপিস্তে ক'রে শিবকে বর পেয়েছিস্। আমি দেখিস কাশীতে ম'রে শিবই হব। আসছে জন্মে তুই আমাকেই ভজনা করবি।"

"তুই কাশীর ওপারে ম'রে গাধা হবি।"—চরিতা কৃত্রিম কোপের সহিত বলিল।

"কেন—গাধা একটা চাই বুঝি তোর? আমারত' গাধা হ'তে দেরি আছে, তদ্দিন না হয় আর কারুর কাণ টেনে টেনে লম্বকর্ণ ক'রে নে না।"

এবার জতির পিঠে একটা ছোট কিল পড়ল।

সুব্রত ফেরার আগেই সুজাতা বেরিয়ে গেল। সুব্রতর বাসাটা শিমলা পাহাড়ের গায়ে একটা কুটীর—সত্যিই কুটীর। ইংরেজি "কটেজ" নয়। কুটীর, কিন্তু ছবিটার মতন সুন্দর। বাইরে একটা ওকের কি এশের খুঁটির গায়ে "আইভি" তোলার প্রথম চেষ্টা হচ্ছিল। একটা ছোট্ট টবে আইভির চারা পোঁতা।

জতি তপুসোণার মুখে চুমো খেয়ে বলল—"তুমি আইভি হবে

হবে তপু? পুঁতুল খেলার আইভি? পুঁতুল খেলার টবেই চিরদিন থাকবে—পুঁতুলই জড়িয়ে থাকবে?" তপুসোণার আঙলগুলো তখন মাসিমার মাথার কবরীতে আইভি হ'য়ে কামড়ে ধর্‌ছিল।

"ওঁকে ত' একটা বড় পাতনা আন্‌তে বলি। উনি বলেন—একটা মাটির পাতনা নাকি অনেক দাম। এখানে গরমিলও বোধ হয়। দূর থেকে পার্শেলে আনাতে হবে "

"বটে? পার্শেলে আনাতে হবে পাতনা? আমিই না হয় দুটো বড় পাতনা পাঠিয়ে দেব'খন। একটা আইভির জন্যে, আর একটা তোদের দুজনার জন্যে।"

দুজনেই হাঁসল। তপুসোণাও একটা কি হরবোলা পাখীর শব্দ গলা থেকে বের ক'রে হাসিতে যোগ দিয়াছিল।

রাত্রি আটটায় সুব্রত বাসায় ফিরে এল মুখ হাত পা ধুয়ে, আহ্নিক সেরে (হাঁ—সুব্রত আহ্নিক করত) সে খেতে ব'সেছে। তপুসোণার গলায় হরবোলাটা সারাদিন কত সুরের কুহক সৃষ্টি ক'রে এইবার ঘুমিয়ে প'ড়েছে। সুব্রত ফিরে এসে একবার স্নেহাপ্লুত দৃষ্টি মেলে সে ঘুমন্ত চাদের কণাটুকুন দেখে নিয়েছিল।

আস্ত চাঁদখানা কিন্তু কাছে ব'সে বাতাস ক'রছে—শিমলের শীত, গরমের জন্য নয়, পোকা টোকার জন্যে। সুব্রত খেতে ব'সেছে। সুচরিতা মুখ টিপে টিপে হাঁসছিল।

"হাঁসছ যে"!

"তুমি কেমন হাবা গঙ্গারাম, তাই বচ্ছি।"

"কেন, কি পেলে?"

"জতি তোমার চোখে কেমন ধূলো দিয়ে গেছল, তাই ভেবে।"

"কখন?"

"একবার কলকাতার জেলে মেয়ে ওয়ার্ডের ছাদে তার বাঁশী শুনে আর তার নীল সাড়ী দেখে ম'জেছিলে। সে তোমাকে চিনেছিল, তুমি চিনতে পার নি। আর একবার, জেলের হসপিটালে তোমার জ্বরের সময় সেই রাত্তিরে। তুমি ভেবেছিলে, স্বপ্ন। আর, বোধনের দিন সে আমার সঙ্গে সঙ্গে বরণডালা নিয়ে এসেছিল, তুমিত' চোখ তুলে চাওইনি। তুল্‌লে এদ্দূর গড়াত' কি?"

"সত্যিই, তোমার সুজাতা রহস্যময়ী।"

"তোমার ঘটে একটু বুদ্ধি থাকত' যদি, ধরতে পার্‌তে।"

"তার কতখানি দরদ, কতখানি স্নেহ, তা কি বলব চরিতা! তুমি যদি সেই দেশের হসপিটালে দেখতে!"—সুব্রতর স্বর গম্ভীর, ব্যথিত।

"হাবা গঙ্গারাম কি সাধে বল্‌ছিলুম?"

"কেন, আবার কি দেখলে?"

"কিছু না, আর দু'খোন চপাটি খাও দিকিন। চপাটি বানাতে শিখিনি?"

"শেখোনি আবার! শেখোনি শুধু একটি।"

"কি?"

"ঝাড়ন মন্তরটা গো। যাদু ক'রেছ, কিন্তু ঝাড়ন মন্তরটা শেখোনি।"—সুব্রতর সেই চির-মুগ্ধ দৃষ্টি।

"কেন—ছাড়া পেলে কি হাঁফ ছেড়ে বাঁচো, সোণার পাখী?"—এই ব'লে সে বাহুলতা দিয়ে স্বামীকে জড়িয়ে ধরল।

"এ সোণার শিকলি কেটে? কদাপি নয়।"

* * * *

শিমলার সেসন শেষ হয়েছে। তারা দেশে ফিরে আস্‌ছে। সুজাতাকে সঙ্গে নিল। সে কাশীতে নামবে। তারা সবাই কাশীতে

নামল। সুজাতাদের আশ্রম বেশ এক নিরিবিলি জায়গায়। ব্রহ্মচারিণীর ব্রত নিয়েছে তারা। সুজাতাই আশ্রমের প্রাণ। উপনিষৎ গীতা, পুরাণ, ইতিহাস—এসব তারা পড়ছে। পুজো আর্চ্চা করে। ব্রত নিয়ম করে। কিন্তু সব চাইতে বেশী ক'রে করে আর্ত্তনারায়ণের সেবা। মুক্তি-আন্দোলনের দিকেও তারা পরাঙ্মুখ নয়। তবে, আত্মশুদ্ধির দিকেই নজর বেশী। আশ্রমে দেখা হ'ল সেই তপস্বিনীর —হনুমানধারায় সেই যাঁকে তারা দেখেছিল। যাঁর পায়ের ধুলা আর আশীর্ব্বাদ তারা পেয়েছিল। তিনিই এ আশ্রমের, আর এই পুণ্য সেবা-ব্রতের, অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। সুজাতারা তাঁকে "মাতাজী" বলে। মাতাজী এবারও প্রাণ খুলে আশীর্ব্বাদ করলেন সুব্রতদের।—রামজীর ইচ্ছায় সবই ভাল হবে। ভারতের স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতের সাধনার সম্পর্কটা তিনি বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। সাধনোন্মেষিত প্রতিভা তাঁর আছে—অস্বীকার করার যো নেই। সুব্রত বুঝল—এদেশে সত্যিকার কাজের ধারা এই। "নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে আয়নায়।" মানুষকে কাজে নামতে হবে, কিন্তু ভেতরের কাজটাও তাব সঙ্গে সঙ্গে চালাতে হবে। নৈলে ভেতরটা বুজে যাবে, বাইরটেও দেউলিয়া হ'য়ে পড়বে। সব দেশের পলিটিকস্ টলিটিকস্ তাই হ'য়ে পড়ছে বুঝি! আর, বোধ হয়, সুব্রত সস্ত্রীক মাতাজীর কাছে দীক্ষাও নিয়েছিল—একটা ভেতকার সাধন ভজনের উপদেশ। একটা জীবনব্রত পালনের। তবে যাক্, সেটা ভেতরেরই কথা।

একদিন গঙ্গার ওপর নৌকো ক'রে তারা বেড়াতে গেল। সুব্রত, সুচরিতা, সুজাতা, সুপ্রিয়। সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে। মন্দিরে মন্দিরে, ঘাটে ঘাটে, সান্ধ্য আরতির শব্দে একটা বিপুল পুলক স্পন্দন আকাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছিল।

অসি ছাড়িয়ে বেঁক ঘুরে উত্তরবাহিনী—হয়েছিল তাদের নৌকা তখন। কেদারঘাটের কাছে এসে সুচরিতা খোকাকে নিয়ে একবার আরতি দেখতে যাবে বল্‌ল। সুপ্রিয় গেল সঙ্গে।

নৌকায় রৈল সুব্রত আর সুজাতা।

"দেবি।"—সুব্রত অতিধীরে ডাকল।

কি বিপুলের মাঝে তখন সুজাতা ডুবেছিল, কে জানে! তার অন্তরের সকল দীপ জ্বেলে কোন বিশ্বনাথের আরতি সে করছিল, কে জানে! সে বিপুল অরূপ না সরূপ, কে জানে!

সুব্রত সাড়া পেল না।

"দেবি।"

সুজাতা আস্তে আস্তে নয়ন দুটী তার মেল্‌ল। আর, সুব্রতর মুখের ওপর সে দৃষ্টি ফেল্‌ল। কত ব্যথা, কত তৃপ্তি, কত আকুলতা, কত আশা, কত ক্ষুধা, কত শান্তি সে চাহনিতে!

সুজাতা গলায় আঁচল দিয়ে সুব্রতর পায়ে আবার প্রণাম করল। কিছু বল্‌ল না সে।

কোন্ অরূপ বিপুল বিশ্বনাথকে কোন্ মোহন নিবিড়রসঘনরূপে পেয়ে তার অন্তরমন্দিরে আরতি ক'রেছিল সে—নিত্য করে সে!

* * *

তার পরদিন সুব্রতরা ক্যান্‌টনমেণ্ট এক্‌স্‌প্রেসে চ'লে যাবে। সে-দিন সুজাতা মন খুলেই সুব্রতর সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিল। আশ্রম সম্বন্ধে—দেশের কাজ সম্বন্ধে—সুব্রতর লেখাটেখা সম্বন্ধে। কি গভীর, কি দরদী তার অনুভূতি—যেটা চিরন্তন সত্য, সুন্দর, কল্যাণ, সেটার সম্বন্ধে। সুব্রত বিস্মিত হ'য়েছিল। সংস্কৃত শিখেছিলও সুন্দর।

যাবার দিন তপোনাথের সেই গচ্ছিত মহালটা—মাতাজীর

আশ্রমের কাজের প্রসারকল্পে দিয়ে গেল— সুব্রত আর সুচরিতা।

সেই "যজ্ঞির" দক্ষিণান্ত বাকি ছিল—তপুসোণাই সেটা ক'রে গেল। সেত' হেঁসেই কুটুপাটু। সব যেন বোঝে সে! নাবালক ব'ল না তোমরা তাকে। তপুসোণা কাঁদবে! সুচরিতার প্রাপ্য মাতামহসম্পত্তিও এতদিনে রাহুমুক্ত হ'য়েছিল। সেও প্রচুর। সেটাও উৎসর্গ হ'য়ে গেল।

সুজাতার কাজ কত বেড়ে গেল। তার যে বড় রকমের একটা কাজের বাঁধন চাই!

যাবার দিন ষ্টেশনে এক্সপ্রেসে সুজাতা তাদের তুলে দিতে এসেছিল। শেষ পর্য্যন্ত আশ্রমের কথা, কাজের কথাই হ'ল। বুকের দরদটা যত ভুলে থাকতে পারা যায়!

গাড়ী যখন ছেড়ে গেল—তখন সুজাতা নয়ন দুটি তুলে আবার সুব্রতর মুখের পানে চেয়েছিল।

কি ভাষা তার, তা কি আজও অজানা?

সুব্রতর বুকটা চড়্ চড়্ করছিল তখন। ডাফ্রিণ ব্রিজের ওপর দিয়ে গাড়ী যাচ্ছিল। অর্দ্ধচন্দ্রাকারে সেই অতুলনীয় কাশীধাম বিরাজ করছেন।

"সত্যিই তুমি, হাবা গঙ্গারাম।"—সুচরিতা একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বেস ছেড়ে বলল।

"কেন?"

"সুজাতা তোমাকে ভালবাসে। প্রাণ লুটিয়ে ভালবাসে। বরাবর। সেই তোমার দেশে বিলের ওপর সাঁঝ বেলা বাচখেলে বেড়ানর দিন থেকে।"

সুব্রতর নিজেরও একটা সংশয় তাতে তখন ছিল কি?